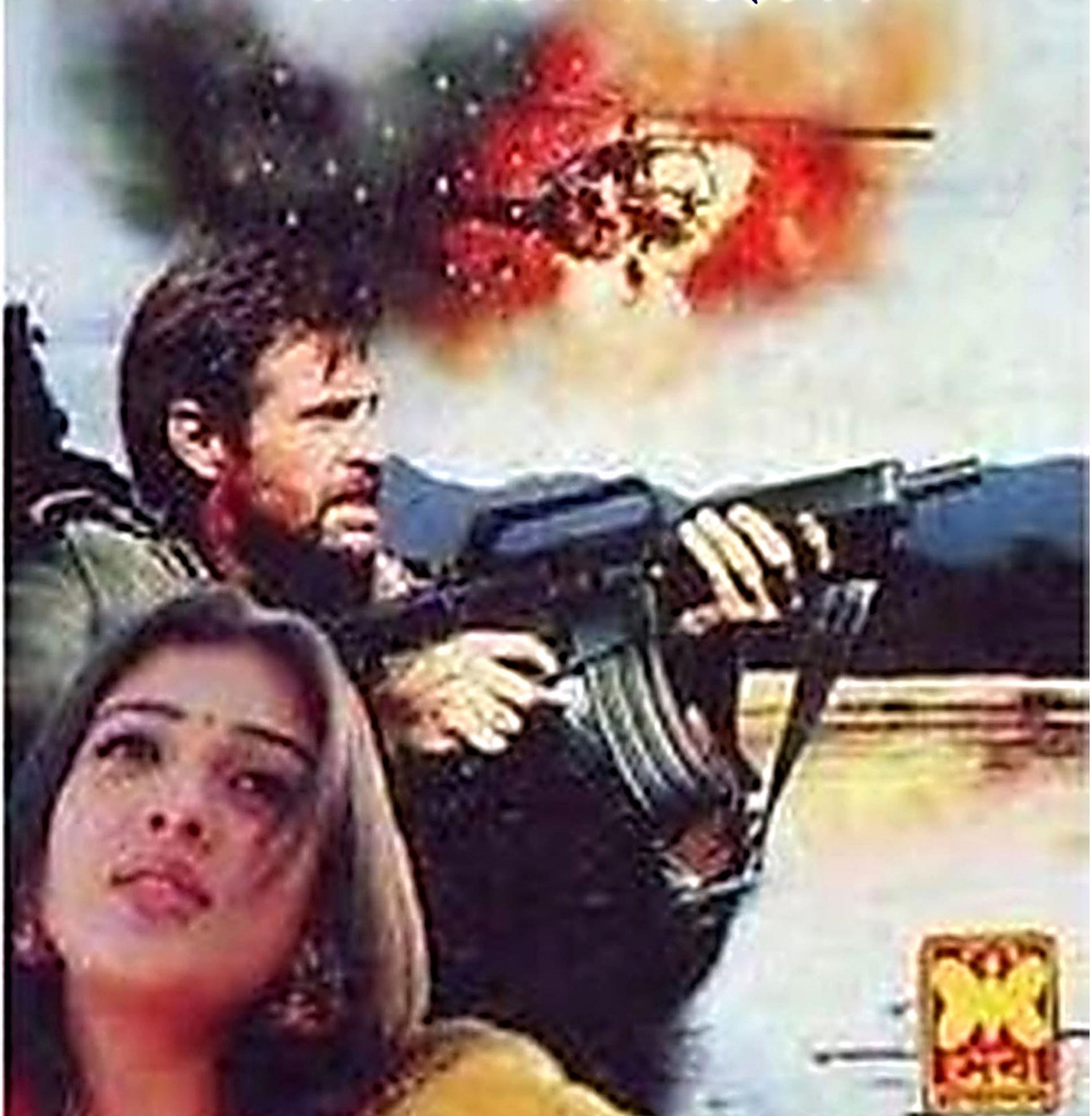
মাসুদ রানা

নিখোঁজ

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা-৩৮৮

নিখোঁজ

কাজী আনোয়ার হোসেন

নিখোঁজ এক বাংলাদেশি আর্কিওলজিস্টকে উদ্ধারের জন্য সুদূর আমাজনের রেইন ফরেস্টে যেতে হচ্ছে মাসুদ রানাকে। নিষ্ঠুর এক জলদস্যু এবং তার চেয়েও ভয়ঙ্কর একদল রহস্যময় লোক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ওখানে। অপেক্ষা করছে ওর–ই জন্যে, ফাঁদ পেতে। মন্টে অ্যালেগ্রায় পা দিতেই শুরু হয়ে গেল একের পর এক আক্রমণ। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত দলে রয়েছে একাধিক বিশ্বাসঘাতক। ইনকাদের হারানো শহর লস ডেল রিয়ো কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাবে রানা ও তার সঙ্গীরা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

নিখোঁজ

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৮

এক

ব্রাজিল, দক্ষিন আমেরিকা।

স্থানীয় আদিবাসীরা ডাকে আমাসনা, মানে নৌকা–খেকো বলে; তবে দেশের উত্তরভাগে, মাইলের পর মাইল দৈর্ঘ্য এবং অগুনতি শাখা-প্রশাখা নিয়ে দক্ষিন আমেরিকার বুকে জালের মত বিছিয়ে থাকা জলধারাটিকে বাকি পৃথিবী চেনে একটাই নামে- আমাজন। প্রাচীন কাল থেকেই এ অঞ্চল রহস্যে–ঘেরা, এ-নদী কৌতূহল-জাগানো কিংবদন্তির নদী, গল্পগাথার ভাষায় যেখানে বাস করে সুন্দরী নারী যোদ্ধা আর দৈত্যদানো থেকে শুরু করে নাম না জানা হাজারো বিপদ। পঞ্চদশ শতাব্দীর স্প্যানিশ কংকুইস্টেডের-বাহিনী থেকে শুরু করে গত অর্ধ-সহস্রাব্দে হাজার হাজার অভিযাত্রী হানা দিয়েছে আমাজন নদী ও তার আশেপাশের বনভূমিতে-রহস্যময় এই জগতের অপার ঐশ্বর্যের নেশায়, কেউই সফল হয়নি। হাতে গোনা কয়েকজন শুধু জীবন নিয়ে ফিরতে পেরেছে, এর ভয়াবহতার গল্প শোনাতে, বাকিদের গিলে খেয়েছে রাক্ষুসে নদীটা।

আজো পরিস্থিতির তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি।

পেরুভিয়ান আন্দেজ থেকে আটলান্টিকের দিকে বয়ে চলা প্রমত্তা আমাজনকে জয় করার চেষ্টা আজও শুধু দুঃসাহস নয়, স্রেফ বোকামি। এমনকি স্থানীয় ইন্ডিয়ানরাও নৌকা নিয়ে কখনও তাদের পরিচিত রুটের বাইরে একচুল এদিক অদিক যায় না, অথচ যুগ-যুগান্তর থেক নদীটির দু'পারে বাস করছে তারা, নদীটিকেই জীবিকা-নির্বাহ এবং চলাচলের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। বংশ পরম্পরায় জেনেছে তারা- আমাজনকে সম্মান দিতে না জানলে

হারিয়ে যেতে হয়ে চিরতরে, নদীর তিনশো ফুট গভীরে... খুনে আমাজন তার শিকারের লাশও ফেরত দেয় না। এভাবেই... অনাদিকাল থেকে... উত্তর ব্রাজিলকে নিঃশব্দে শাসন করে চলেছে আমাজন, প্রাচীন দেবদেবীর মত- একদিকে যেমন শস্য ফলানোর পানি আর বৃষ্টির আধার হয়ে, অন্যদিকে তেমনই ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা ও প্রতিশোধপরায়ণতা দেখিয়ে।

বেশ কিছু শাখা-প্রশাখা নিয়ে গঠিত আমাজন নদী- মহাকাশ থেকে তোলা ছবিতে ওগুলোকে জীবদেহে জালের মত বিছিয়ে থাকা রক্তবাহী শিরা-উপশিরার মত দেখায়। ব্রাজিলীয় গ্রাম টেফে থেকে পেরুভিয়ান শহর ইকুইটোস পর্যন্ত নদীটার স্রোত সবচেয়ে শক্তিশালী-ওখানে মূল ধারাটার নাম ম্যারানন, বেশ চওড়া ওটা। তবে মাঝে মাঝে এমন সব সরু শাখা আছে যে, একটা ক্যানু ঢোকাতেও খুব কষ্ট হয়। এই শাখাগুলোকে হঠাৎ দেখায় জলাভূমি বলে ভ্রম হয়। এখানে-সেখানে পানি ভেদ করে বেরিয়ে থাকা ম্যানগ্রোভ গাছ, গাছগুলোর মোটামোটা শিকড় আর কাদাগোলা পানিই তার কারণ। ইন্ডিয়ানরা অবশ্য ছোট ছোট ক্যানু নিয়ে এসব গাছপালার ফাঁকফোকর গলে ঘোরাফেরা করে- শিকারের খোঁজে।

এই মুহূর্তে নদীর উজানের দিকে যে-দুটো বড় আকারের ক্যানু ছুটে চলেছে, সেগুলো অবশ্য ওভাবে গাছপালার ভিতর দিয়ে লুকোচুরি খেলতে পারবে না। প্রাচীন দুটো ম্যানগ্রোভ গাছ কেটে তৈরি করা হয়েছে বাহনদুটোকে, আরোহীরা প্রায় সবাই স্থানীয় আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান- ওদের হাতে বৈঠাও রয়েছে, কিন্তু ব্যবহার করছে না কেউই। বৈঠাগুলো রয়েছে জরুরি অবস্থা সামলানোর জন্য, আসলে ক্যানু-দুটোকে চালাচ্ছে এখন আধুনিক প্রযুক্তি। দুটোরই পিছনে বসানো রয়েছে হাই-পাওয়ার আউটবোর্ড ইঞ্জিন। ওগুলো এতই শক্তিশালী যে, ইন্ডিয়ানদের গোটা গ্রামের সবাই যদি কোনও নৌকায় উঠে বৈঠা বাইতে শুরু করে, তারপরও ইঞ্জিনগুলোর সঙ্গে পেরে উঠবে না।

ছুটন্ত জলযানদুটোর পিছনে পানিতে আলোড়ন তুলছে প্রপেলার, ইঞ্জিনের আওয়াজে নদীর দু'পাশের গাছগাছালি থেকে ভয় পেয়ে উড়ে যাচ্ছে পাখিরা। ব্যাপারটা এখানকার পশুপাখিদের জন্য অস্বাভাবিক বৈকি! ইঞ্জিনচালিত ক্যানু'র কথা কে-ই বা শুনেছে! তবে পুরনো আমলের নৌকায় এ-ধরনের কারিগরি ফলানোটা একেবারে নতুন কোনও ঘটনা নয়, বাংলাদেশের স্থানীয় জেলেরা কাঠের মাছ ধরা নৌকায় অহরহ-ই শ্যালো পাম্পের ইঞ্জিন বসিয়ে থাকে। সামনের ক্যানু'তে বসে থাকা বাঙালী যুবকটি সেই সৃতিই কাজে লাগিয়েছে আমাজনে এসে।

মোট দশজন ইন্ডিয়ানকে ভাড়া করেছে যুবক, কাকডাকা ভোরে নদীর ধারে ফেলা ক্যাম্প গুটিয়ে শুরু করেছে যাত্রা। গন্তব্য-নদীর উজানের একটা সংযোগস্থল... একটা বাঁক, ওখান থেকে স্রোত দিক পাল্টাতে শুরু করেছে। যত দ্রুত সম্ভব জায়গাটায় পৌঁছুতে চায় সে, সকাল-সকাল রওনা হবার পিছনে সেটাই কারণ। তবে দূরত্বটা খুব একটা কম নয়, ক্যানুতে আউটবোর্ড ইঞ্জিন থাকার পরও আজ প্রায় সারাটা দিন কেটে যাবে বাঁকটায় পৌঁছুতে। যাত্রীরা অস্বাভাবিক রকমের নীরব হয়ে আছে- বাঙালী যুবক চুপ করে রয়েছে কথা বলার সঙ্গী না পেয়ে, আর ইন্ডিয়ানদের মুখ বন্ধ কী এক অজানা আতঙ্কে। কদাচিৎ ফিসফিস করে ওঠে ওরা, তখন শুধু দুটো শব্দই বোঝা যায় ওদের কথা থেকে -*এল পিরানহা!*

আমাজনের বুক থেকে রাতের ঠাণ্ডা আর কুয়াশাকে দূর করে দিয়েছে সকালের সূর্য, এখন চারপাশ ফকফকে পরিষ্কার। সামনের ক্যানু'তে বসে থাকা বাঙালি যুবক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বুনো প্রকৃতির দিকে -সময় যেন থমকে গেছে পৃথিবীর এই অংশটুকুতে। আনমনে মাথা নাড়ল সে, এমন একটা জায়গা স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। উজ্জ্বল রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে নদীর বুকে, স্রোতকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সোনালী তরল... দু'পাশের

সবুজ অরণ্যকে চিরে যেন ছুটে যাচ্ছে অজানার দিকে। আমাজনের পানিতে ইনকাদের গলানো সোনা বয়ে যেত বলে একটা গল্প রয়েছে -এই দৃশ্যটার কারণেই হয়তো!

অবশ্য শুধু গল্পগাথা নয়, ইনকা সভ্যতার ইতিহাস থেকে শুরু করে ওদের শিল্প–সাহিত্য-সমাজ-অর্থনীতি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা যা জানা গেছে, তার সবই রাজিব আবরারের নখদর্পণে। আর্কিয়োলজিস্ট ও, মনে-প্রানে একজন প্রতিভাবান প্রত্নতত্ত্ববিদ, বছরখানেক আগে পিএইচডি করেছে প্রাচীন ইনকা সভ্যতার উপরে। আর্কিয়োলজির প্রতি ওর টান সেই ছোটবেলা থেকে, বড় হয়েছে জুলভার্ন আর এইচ জি ওয়েলসের বই পড়ে। হারানো পৃথিবী, বিলীন হয়ে যাওয়া সভ্যতা, অনাবিষ্কৃত অঞ্চল... এসব পড়ে অন্য এক জগতে হারিয়ে যেত ও, নিজেও অভিযাত্রী হবার স্বপ্ন দেখত। মেধার কোনও ঘাটতি ছিল না ওর মধ্যে, চাইলে লোভনীয় বেতনের যে-কোনো পেশায় ঢুকে পড়তে পারত। কিন্তু সবকিছু ফেলে ও বেছে নিয়েছে আর্কিয়োলজিকে। স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছে, তারপর দেশে ফিরে যোগ দিয়েছে জাতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে।

বয়স সবে সাতাশ ছুঁয়েছে। চেহারায় এক ধরনের মার্জিত আভিজাত্য রয়েছে ওর, আমাজন নদীর বুকে কোনও নৌকা যাত্রীর জন্য ব্যাপারটা একটু বেমানানই বলতে হবে। চিবুকটা চৌকো আকৃতির, নাকটা তীক্ষ্ণ, কপালটাও বেশ বড়; তবে সবকিছু ছাড়িয়ে ওর চোখের কালচে মণিতে দৃষ্টি আটকে যায় সবার— সেখানে বাসা বেঁধে আছে রাজ্যের অনুসন্ধিৎসা আর অজানাকে জানার নেশা। ইনকা সভ্যতা নিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল ওর অনেক আগে থেকেই, পিএইচডি-র জন্যও এ-কারণেই বিষয়টাকে বেছে নিয়েছিল। থিসিস তৈরির সময় গবেষণা করতে গিয়ে অভাবনীয় এক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ওর সামনে, সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতেই আনাজনে ছুটে এসেছে ও।

স্প্যানিশ এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে অল্প দামে পুরনো কিছু কাগজপত্র কিনেছিল রাজিব, ওগুলো বার্সেলোনার এক আর্কাইভ পরিষ্কার করতে গিয়ে পেয়েছিলেন তিনি। কী অমূল্য ধন ওগুলো, তা কোনওদিন বুঝতেই পারেননি ভদ্রলোক। প্রায় ছেঁড়া-ফাটা, ধূসর হয়ে যাওয়া কাগজগুলো আসলে একটা প্রাচীন জার্নাল; ষোড়শ শতাব্দীর এক অসফল কংকুইস্টেডরের জীবন-কাহিনি। জার্নালটা স্প্যানিশে লেখা হলেও এখানে-ওখানে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটা আঞ্চলিক ভাষায় প্রচুর রেফারেন্স রয়েছে। সেগুলোর পাঠোদ্ধার করে রাজিব, অবাক হয়ে লক্ষ করে— লস ডেল্ রিয়ো নামে প্রাচীন এক ইনকা-শহর আবিষ্কার করেছিলেন সেই অভিযাত্রী, জার্নালটায় ওখানে পৌঁছুনোর নিখুঁত পথনির্দেশ আছে।

হারানো সেই শহর খুঁজে বের করবার জন্য তখুনি অভিযানে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল, রাজিবের। আমেরিকায় ছিল ও তখন, একটা এক্সপিডিশনের জন্য স্পন্সর পেতে মোটেই কষ্ট হত না। কিন্তু অন্য ধাতে গড়া মানুষ রাজিব, আবেগটাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখল ব্যাপারটা। ও বুঝতে পারল, বিদেশিদের সাহায্য নিয়ে অভিযানে গেলে লস ডেল্ রিয়ো থেকে পাওয়া সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট আবিষ্কারের কৃতিত্ব বিদেশীদের হাতেই তুলে দিতে হবে। এতে ব্যক্তিগতভাবে নাম-যশ আর টাকা-পয়সার মালিক হয়তো হওয়া যাবে, কিন্তু নিজের দেশের তো কোনও লাভ হবে না! তারচেয়ে বাংলাদেশের পরিচয়ে কাজটা করলে দেশেরও সুনাম হবে, ব্রাজিল সরকারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে অভিযানটায় গেলে নিজের দেশের জাদুঘরগুলোও কিছু কিছু আর্টিফ্যাক্ট পেয়ে সমৃদ্ধ হবে। তাই তখনকার মত ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল ও।

লেখাপড়া শেষে দেশে ফিরে আবার বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে রাজিব, এক্সপিডিশনে যাবার জন্য বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করতে থাকে।

বেশ কিছুদিন লেগেছে, তবে আস্তে আস্তে অনেকেই অভিযানটার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে সমর্থ হয়েছে ও। শেষ পর্যন্ত জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ অভিজানের একটা অংশের অনুদান দিতে রাজি হয়েছে, বাকিটা জোগাড় করা হয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে। টাকা জোগাড় হতেই আর দেরি করেনি রাজিব, ছুটে এসেছে আমাজনে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় গাইড ভাড়া করে একাই কাজ শুরু করেছে ও, হারানো শহরটার সাইট খুঁজে পেলে সমস্ত গিয়ার আর ইকুইপমেন্টসহ মূল এক্সপিডিশন দল আসবে।

নদীর স্রোত ঠেলে এখন উজানের দিকে ছুটে চলেছে রাজিবের ভাড়া-করা ক্যানদুটো। বেলা একটু বাড়তেই কুয়াশা কেটে গেছে পুরোপুরি, রোদে ঝলমল করছে প্রকৃতি, গরমও হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই বলতে হবে- রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল, স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে রীতিমত ঠক ঠক করে কাঁপতে হয়েছে ওকে; অথচ এখন পুরো গ্রীষ্মের উত্তাপ অনুভব করছে! পরনের জ্যাকেটটা খুলে উরুর উপর ভাঁজ করে রাখল ও, বুক ভরে টেনে নিল আমাজনের নির্মল বাতাস। শহুরে জীবনে এমনভাবে শ্বাস টানা অসম্ভব। বাতাসটা চুলে বিলি কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, বুক-খোলা শার্টটাকেও ফুলিয়ে তুলছে বেলুনের মত- সব মিলিয়ে আশ্চর্য এক প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে দেহ-মনে। চোখ বন্ধ করে পরিবেশটা উপভোগ করতে শুরু করল রাজিব, গুনগুন করে একটা বাংলা গানের সুর ভাঁজছে একই সঙ্গে। ওর সহযাত্রীরা সবাই নেংটিপরা স্থানীয় মানুষ, অবাক চোখে দেখছে তাদের নিয়োগকর্তার ভাবভঙ্গি। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করল কেউ কেউ- বিদেশি লোকটার মাথায় নিশ্চয়ই ছিট আছে, নইলে নদীভ্রমণের মত সামান্য ব্যাপারে এত আনন্দ পাবার আছেটা কি!

অবশ্য বেলা বাড়তেই পরিস্থিতিটা আর আগের মত রইল না, গান-টান সব থামিয়ে ফেলতে হোল রাজিবকে-ইন্ডিয়ানরা কেন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

ওদের মধ্যে দুজন হচ্ছে মূল গাইড, বাকিরা কুলি হিসেবে এসেছে। গাইডদের নাম জিকো আর মাসাপা, অবশ্য মনে মনে ওদেরকে গাঁটকু আর লম্বু বলে ডাকছে রাজিব- নামের চেয়ে দৈহিক গড়নের বর্ণনা দিয়ে মানুষদুজনকে চেনা সহজ বলে। লোকদুটো ইংরেজি বলতে পারে না ভালো করে, তবে কাজকর্মে দারুন চালু; রওনা হবার আগে রীতিমত গ্যারান্টি দিয়ে বলেছে- নদীর উজানের এলাকা হাতের তালুর মত চেনে তারা, চোখ বন্ধ করে নিয়ে যেতে পারবে। বিপদ-টিপদের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিয়েছিল ওরা- নদীর পারে দু-একটা ছোট গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নাকি নেই, ওখানকার অধিবাসীরাও শান্তিকামী বলে জানিয়েছিল। তা হলে এখন হঠাৎ এমন ভয় পেতে শুরু করল কেন?

মাথা ঘুরিয়ে গাটকু, মানে জিকোর দিকে তাকাল রাজিব। 'ব্যাপার কী, ওরা এমন করছে কেন?' আঙুল তুলে জড়সড় হয়ে থাকা কুলিদের দেখাল ও।

খুব একটা লম্বা নয় জিকো, টেনে-টুনে সাড়ে পাঁচ ফুট হবে হয়তো, কিন্তু বিধাতা লম্বার ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছেন শরীরে বাড়তি পেশী দিয়ে। গাঁট্টাগোট্টা এক পালোয়ান সে, ওজন আড়াইশো পাউন্ডের কম হবে না; মাথাটা পুরো কামানো, তাতে সারাক্ষণ একটা লাল ব্যানডানা বেঁধে রাখে সে, চেহারাটাও নিষ্ঠুর ধরনের -এই অবয়ব যে-কারও বুকে কাঁপন ধরাতে যথেষ্ট। অথচ এখন এই লোকটার চেহারাতেও সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। রাজিবের প্রশ্নের জবাবে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে শে ইতস্তত করে বলল, 'আমার শ্যালক ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে, সেনিয়র। নদীর বাঁকের ওপারে গেলে বিপদে পড়ব আমরা!' পিছনে বসা দ্বিতীয় গাইড লম্বুকে দেখাল জিকো।'এতটা সামনে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। চলুন, নৌকা ঘুরিয়ে ফেলি।'

ভুরু কুঁচকে মাসাপার দিকে তাকাল রাজিব-ছ'ফুট লম্বা লোকটা অপ্রকৃতিস্থ রোগীর মত দুলছে, চোখে কেমন যেন ঘোর লাগা দৃষ্টি। নেশা করেছে বলে সন্দেহ হলো ওর, তাই জিজ্ঞেস করল, 'কিছু খেয়েছে ও?'

'হ্যাঁ, সেনিয়র। কোকো গাছের পাতা চিবিয়েছে। ওই পাতা মুখে দিলেই দিব্যদৃষ্টি খুলে যায় ওর।'

এবার বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল রাজিব। দিব্যদৃষ্টি না ছাই! ওটা আসলে হ্যালিউসিনেসন। নেশার ঘোরে আবোল-তাবোল দেখা। কোকো পাতা হচ্ছে কোকেন তৈরির মূল উপাদান, ওটাই কাঁচা খায় এখানকার আদিবাসীরা। এদের এসব উল্টাপাল্টা ভবিষ্যদ্বাণীতে কান দেবার মুড নেই ওর। তাই বলল, 'ফেরা-টেরার কথা মুখেও এনো না জিকো। যতদূর যেতে চাই, ততদূরই আমাকে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য আগেই টাকা দিয়েছি তোমাদের।'

চোখে-মুখে বিষণ্ন একটা ভাব ফোটাল গাঁটকু, চোখাচোখি করল শ্যালকের সঙ্গে। তারপর বলল, কাজটা ঠিক করছেন না, সেনিয়র। আমার কথা বিশ্বাস করছেন না তো? নদীর বাঁকে পৌঁছুলেই টের পাবেন মাসাপার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি, নাকি মিথ্যা!'

চোয়াল শক্ত করে ফেলল রাজিব-দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে, লোকটা কি ভয় দেখাতে চাইছে ওকে? বোটের বাকি আরোহীদের ওপরও নজর বোলাল ও, তারা আবার ফিসফিস করতে শুরু করেছে। এল্ পিরানহা নামটা আবার কানে এল।

'ওদেরকে ফালতু প্যাঁচাল বন্ধ করতে বলো, জিকো!' রাগী গলায় বলল রাজিব। 'পিরানহা-পিরানহা করে কান পচিয়ে ফেলল একেবারে! আরে বাবা সামান্য একটা ডাকাতকে এত ভয় পাবার আছেটা কি?'

'এল পিরানহা সত্যিই মানুষ নয়, সেনিয়র,' জিকো বলল। 'ও আসলে...'

'জানি জানি,' বাঁধা দিয়ে বলল রাজিব। ' ও একটা মন্ত্রসিদ্ধ পিশাচ, তা-ই না? রওনা হবার আগে ওই গল্প কয়েক হাজারবার শুনেছি আমি। যত্তোসব! এসব ছাইপাঁশ আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?'

‘আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে-যায় না, সেনিয়র,’ নিজের বক্তব্যে অটল জিকো। ‘সত্যিই জাদুকরি ক্ষমতা আছে এল্ পিরানহার-যে-সে জাদু নয়, কালো জাদু! তার কোনও ছায়া পড়ে না, মাটিতেও মাত্র একটা পা স্পর্শ করে। মৃত্যু তার সঙ্গে অদৃশ্য সঙ্গীর মত ঘুরে বেড়ায়, হিংস্র পশু আর রাক্ষুসে মাছেরা তার হাত থেকে চুপচাপ খাবার খায়। গলায় বিষধর সাপ জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় সে, অথচ সাপগুলো ভুলেও তাকে কামড়ায় না। কারণ, কামড় দিলে সাপ নিজেই মরে যাবে। এসব কীভাবে সম্ভব, সেটা আমার জানা নেই সেনিয়র। তবে এটুকু জানি, যেটাকে আপনি গল্প ভাবছেন, তার ভিতর মিথ্যে নেই এক রত্তিও।’

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল রাজিব, আদিবাসীদের এই অন্ধবিশ্বাসকে দূর করার কোনও উপায় নেই ওর কাছে। পরমুহূর্তেই সচকিত হয়ে উঠল ও-বোটের পিছনে বসা পাইলটকে সংকেত দিচ্ছে লম্বু। সঙ্গে সঙ্গে টিলারটা ঘুরিয়ে দিল লোকটা, ক্যানুটা ছুটতে শুরু করল তীরের দিকে, ডাঙায় ভিড়তে যাচ্ছে। ওদের দেখাদেখি দ্বিতীয় ক্যানুটাও মুখ ঘুরিয়ে ফেলল।

‘হচ্ছেটা কি?’ বিস্মিত গলায় বলল রাজিব। ‘যাচ্ছ কোথায়?’

‘কোথাও যাচ্ছি না, সেনিয়র,’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল জিকো। ‘আমরা এখানেই থামছি। সামনে গিয়ে মরার খায়েশ নেই আমাদের।’

‘কী বলছ যা-তা! ফন্টে বোয়া সেটেলমেন্ট পেরিয়ে জুরুয়া শাখা-নদী পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাবার কথা তোমাদের। ওভাবেই চুক্তি হয়েছে, টাকাটাও অগ্রিম নিয়েছ।’

‘সেসব পুরানো ইতিহাস, জনাব। তখন মাসাপা ভবিষ্যৎ দেখতে পায়নি।’

রাগ চাপা দিতে রীতিমত কসরত করতে হলো রাজিবকে। চিবিয়ে চিবিয়ে ও বলল, ‘তোমার ওই শালা নেশাখোর। চোখের অবস্থা দেখেছ? নেশার ঘোরে ভুল-ভাল দেখছে ও।’

‘নেশা করতে পারে, কিন্তু সত্যিই ভবিষ্যৎ দেখতে পায় মাসাপা,’ বলল জিকো।

‘গ্রামের সবাই ওকে মান্য করে।’

হতাশায় ঠোঁট কামড়াল রাজিব-কী করা যায়, ভেবে পাচ্ছে না। আমাজনে আসার পিছনে ওর সত্যিকার উদ্দেশ্যটা জানে না এরা, অশিক্ষিত লোকগুলো লোভী হয়ে উঠতে পারে বলে জানানো হয়নি কিছু। এখন বলে দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেটা কতখানি উচিত হবে, বুঝতে পারছে না। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করল ও, আর সেই সুযোগে অগভীর পানিতে পৌঁছে গেল ক্যানুটা। কয়েকজন ইন্ডিয়ান লাফ দিয়ে নেমে পড়ল, তারপর জলযানটার সামনেটা ধরে টেনে তুলল ডাঙায়। পিছু পিছু দ্বিতীয় ক্যানুটাও এসে গেছে, রাজিবকে নৌকাতেই বসিয়ে রেখে নেমে পড়ল সবাই, ওকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করছে না আর।

পরিস্থিতিটা যে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না রাজিবের। ইন্ডিয়ানরা শুধু অবাধ্যতা নয়, রীতিমত উদ্ধত আচরণ করছে। প্রমাদ গুনল ও -অবস্থা যে-রকম দেখা যাচ্ছে, তাতে জঙ্গলের মধ্যে ওকে ফেলে রেখেও চলে যেতে পারে লোকগুলো। ভেবে দেখল, এ-মুহূর্তে একটাই পথ আছে অভিযানটা চালু রাখার -সেটা হলো, এদেরকে লস ডেল রিয়োর ব্যাপারে লোভ দেখানো।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও, নেমে পড়ল ক্যানু থেকে। একটা বড় গাছের নিচে জটলা করে রয়েছে ইন্ডিয়ানরা, হেঁটে ওদের কাছে গেল রাজিব। ডাকল, ‘জিকো, শুনে যাও।’

‘যা বলার এখানেই বলুন,’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল গাঁটকু। ‘কোথাও যেতে-টেতে পারব না।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজিব। 'ঠিক আছে এখানেই বলছি। লস ডেল রিয়োর নাম শুনেছ?'

'কে না শুনেছে?' কাঁধ ঝাঁকাল বিশালদেহী গাইড। 'হারানো শহর ওটা... ধন-রত্ন ভরা।'

'আর হারানো বলা যাবে না ওটাকে। আমি ওটার হদিস পেয়েছি।'

'কী' চমকে গেল জিকো।

'হ্যাঁ,' বলল রাজিব। 'ওখানে যাবার জন্যই বেরিয়েছি আমি -সবাইকে বলো কথাটা। সেই সঙ্গে এটাও জানাও, তোমরা চাইলে এখুনি ফিরে যেতে পারো, আমি বাঁধা দেব না। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাকি জীবন এমন ফকিরি হালেই রয়ে যাবে সবাই, লস্ ডেল রিয়ো আবিষ্কারের ফলে যে নামডাক আর টাকা-পয়সা পাওয়া যাবে, তার কিছুই তোমাদের কপালে জুটবে না।'

ভুরু কুঁচকে গেছে জিকোর। গম্ভীর গলায় বলল, 'অপেক্ষা করুন একটু, সেনিয়র।' ঘুরে নিজের লম্বু শ্যালকের সঙ্গে শলাপরামর্শে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করল রাজিব, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। ওর হিসাব অনুসারে ম্যারানন শাখা-নদীর সলিমোস উপশাখায় আছে ওরা, আর বিশ মাইল দূরে *জুরুয়া* নামের দ্বিতীয় উপশাখাটা এসে মিলেছে এর সঙ্গে, নদীর এক বিশাল বাঁকে। ওখানে জঙ্গল অনেক বেশি ঘন বলে জানতে পেরেছে ও, সঙ্গে কুলি আর গাইড না থাকলে ঝোপঝাড় কেটে এগোনো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। মাথা তুলে শ্যালক-বোনজামাইয়ের দিকে তাকাল রাজিব- উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে তারা, নিজেদের ভাষায়। একটা শব্দও বোঝা গেল না।

একটু পরেই আলোচনা শেষ হলো দুই গাইডের। সিদ্ধান্ত নেবার ভঙ্গিতে নিয়োগকর্তার দিকে এগিয়ে এল জিকো। বলল, 'নিয়ে যাব আমরা আপনাকে। তবে তার আগে দুইটা জিনিস চাই।'

'কী?' জানতে চাইল রাজিব।

'কথা দিন -এল পিরানহা যদি হামলা করে, আপনি আপনার একটা হাত কেটে ওকে দিয়ে দেবেন। তা হলে আর আমাদের ক্ষতি করবে না সে।'

মনে মনে হাসল রাজিব- কী অদ্ভুত বিশ্বাস এদের। কাটা হাত উপহার দিয়ে পিশাচকে খুশি করতে চায়! মুখে অবশ্য সিরিয়াস ভাবটা ফুটিয়ে রাখল ও।

বলল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

'আর...,' আঙুল তুলে নিয়োগকর্তার বাম হাতের অনামিকাটা দেখাল জিকো। 'আপনার ওই আংটিটা দিতে হবে মাসাপাকে।'

ওটা রাজিবের এনগেজমেন্ট রিং -নাদিয়া দিয়েছে। জিনিসটা হাতছাড়া করবার খুব একটা ইচ্ছে নেই ওর, তাই বলল, 'এটা না দিলে হয় না? অন্য কিছু নাও!'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল জিকো। 'জিনিসটা কীভাবে আগলে রাখেন আপনি, সেটা খেয়াল করেছি আমরা। নিশ্চয়ই আংটিটা সৌভাগ্যের প্রতীক। ওটা ছাড়া এক পা-ও এগোতে রাজি নয় মাসাপা।'

শ্রাগ করল রাজিব। অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোকে কিছুতেই বুঝ দেয়া যাবে না। কী আর করা, ভাবাবেগ টিপে মেরে আঙুল থেকে সোনার আংটিটা খুলে ফেলল ও, বাড়িয়ে ধরল জিকোর দিকে। ওটা নিয়ে শ্যালককে দিল গাঁটকু। জিনিসটা হাতে পেয়েই চওড়া একটা হাসি উপহার দিল নেশাখোর মাসাপা -যেন আংটি নয়, লস ডেল রিয়োর চাবিই তুলে দেয়া হয়েছে তার হাতে।

'কী, খুশি তো?' গোমড়া মুখে জিজ্ঞেস করল রাজিব।

জবাব দিল না লম্বু, তার বদলে অদ্ভুত একটা কাজ করল। আংটিটা সোজা মুখে পুরল সে, কোঁৎ করে গিলে ফেলল। দৃশ্যটা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রাজিবের।

'এটা কী করলে!'

আবার দাঁত বের করে হাসল মাসাপা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'আপনার সৌভাগ্য এখন আমার সৌভাগ্য, সেনিয়র। আর কেউ ওটাকে কেড়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে।'

'আর কোনও চিন্তা নেই,' জিকোও হাসছে। 'চলুন সেনিয়র, হারানো শহরের ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি।'

দুই

উজানের পথে যাত্রাটা নিরুপদ্রবেই কাটছে। এদিককার স্রোত অনেক বেশি শক্তিশালী, ইঞ্জিনগুলোকে যে আগের চেয়ে বেশি খাটতে হচ্ছে, সেটা শব্দ শুনেই বুঝতে পারছে রাজিব। মাঝে মাঝে হয়তো জলজ লতাপাতা জড়িয়ে যাচ্ছে প্রপেলারে, তবে উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু ঘটেনি এখনও। মনে মনে উৎফুল্ল বোধ করছে ও, ইন্ডিয়ানদের স্বঘোষিত ভবিষ্যদ্বক্তার সতর্কবাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কোনও রকম বিপদ ছাড়াই জুরুয়া আর সলিমোসের সংযোগস্থলের খুব কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। লম্বু মাসাপাও আংটিটা গেলার পর থেকে অনেক শান্ত হয়ে গেছে।

সূর্য আরও উপরে উঠে এসেছে, বেড়ে গেছে গরমটাও, চামড়া পুড়িয়ে দেবে যেন। কড়া রোদে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না ইন্ডিয়ানদের, তবে রাজিব ঘন ঘন পানি খাচ্ছে। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে ও। নদীর ধারে বেশ

কয়েকটা ছোট ছোট বসতি চোখে পড়ছে, ওখানকার অধিবাসীরা নিরীহ জেলে আর শিকারী, জানাল জিকো। মাঝে মাঝে কাঠের তৈরি ছোট ডকও দেখা যাচ্ছে, আশেপাশে চারদিক-খোলা কিছু সংখ্যক দোচালা রয়েছে। বিশালদেহী গাইড বলল, ওগুলো বাজার, স্থানীয়রা নিজেদের মধ্যে জিনিসপত্র কেনাবেচা করে ওখানে। তবে বহিরাগত পর্যটকদের জন্যও বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায় বাজারগুলোয়; বন্দুক আর ওষুধপত্রের বিনিময়ে ওখান থেকে কোকো, দুর্লভ পাখি আর বিভিন্ন পশুর চামড়া সংগ্রহ করতে পারে যে-কেউ। চোখে বিনকিউলার তুলে দোকানগুলো দেখল রাজিব, পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল- জিনিসপত্রের বাহার দেখে। বড় বড় টিকটিকি, কচ্ছপ আর মুণ্ডুহীন বানরের ধড় ঝুলছে কয়েকটা দোকানে; এসব কিনতে পর্যটকরা কতখানি আগ্রহী হবে, কে জানে!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুই শাখা-নদীর সংযোগস্থলে পৌঁছে গেল ক্যানুদুটো। এখানে নদী বেশ চওড়া- এক পাড় থেকে আরেক পাড়ের দূরত্ব কমবেশি আধ মাইল। স্রোতও বইছে খুব তীব্রভাবে, যেন একটা বাঁধের স্লুইসগেট খুলে দেয়া হয়েছে। পানির সঙ্গে ভেসে আসছে আমাজনের হাজারো মরা উদ্ভিদ আর ডালপালা। আঙুল তুলে একদিকের পাড়ে মাথা উঁচু করে থাকা একটা বড় পাথর দেখাল জিকো- ওটা একটা মার্কার, তারমানে নদীর বাঁকে পৌঁছে গেছে ওরা।

ক্যানুদুটোর চালকেরা বেশ দক্ষ, ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি আর ডালপালাকে ফাঁকি দিল তারা এঁকে-বেঁকে, নৌকাদুটোকে কিছুক্ষণের মধ্যেই জুরুয়া শাখায় ঢুকিয়ে ফেলল। এরপর আবার বাঁকটাকে পিছনে ফেলে সোজা পথে শুরু হোল যাত্রা। অভিযানের এই অগ্রগতি দেখে খুশি হয়ে উঠল রাজিব, নিজেকে পুরনো আমলের কংকুইস্টেডর বলে মনে হচ্ছে ওর। জিকোর দিকে

তাকিয়ে বলল, 'তোমার পিরানহার তো চিহ্নও দেখছি না হে! মনে হচ্ছে নদীর অন্য কোথাও মাছ মারতে গেছে সে।'

নিয়োগকর্তার আনন্দের ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা গেল না মোটকা গাইডের মধ্যে। মুখ গোমড়া করে বসে আছে সে, যেন জলদস্যু লোকটা হামলা না চালানোয় নাখোশ হয়েছে। রাজিবের কথা শুনে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল চারপাশে- একটা সরু খালের মুখ দেখা যাচ্ছে সামনে। দুজনের কেউই তখনও জানে না, বিপদটা কোথায় লুকিয়ে আছে।

খালের মাইলখানেক ভিতরে, একটা বাঁকে লুকিয়ে রয়েছে জলদস্যুরা, নিজেদের বোট নিয়ে। অনেকক্ষণ আগেই ক্যানুদুটোর ইঞ্জিনের শব্দ পেয়েছে তারা, তখনই এসে ঢুকেছে এখানে। খালের মুখের কাছে নৌকাদুটো পৌঁছুলেই সামনে থেকে পথরোধ করে হামলা চালাবার ইচ্ছে। কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে ওদের মধ্যে, নিজেদের উপস্থিতি যেন বোঝা না যায়, সে বিষয়ে সচেতন। চাপা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে দস্যুরা- নতুন শিকারের আশায়। তবে তাদের দলনেতা... এল পিরানহা নির্বিকার, চেহারা ভাবলেশহীন, তবে কান পেতে রয়েছে সে–ও। কিছুক্ষণের মধ্যে আগন্তুকদের ক্যানুর ইঞ্জিনের আওয়াজ জোরালো হয়ে উঠতেই নড়ল সে। মুখ খুলল না, শুধু ইশারায় নিজের বোটের ইঞ্জিন বয়লার চালু করবার নির্দেশ দিল।

পিরানহার মত কুখ্যাত জলদস্যুর জাহাজ হিসেবে যে-ধরনের একটা ছবি মানুষের কল্পনায় ভেসে উঠবে, বাস্তবে বাহিয়া ব্লাঙ্কা-র সঙ্গে তার কোনই মিল নেই। ওটাকে দেখে কেউ যদি হতাশ হয়, তা হলে বিশেষ দোষ দেয়া যাবে না। রং-ওঠা, মরচে পড়া একটা পুরানো স্টিমার এই বাহিয়া ব্লাঙ্কা-চল্লিশ ফুট লম্বা, আপার ডেকে টিনের চাল বসানো একটা পাইলট হাউস ছাড়া আর কিছু নেই। ইঞ্জিনটাও পুরনো, বয়লার-স্টিমে চলে, ফানেল দিয়ে বিশ্রী কালো ধোঁয়া

বেরোয়। প্রথম দর্শনে বোটটাকে ভয়ঙ্কর কিছু বলে মনে হয় না একেবারেই, বরং করুণার উদ্রেক হয় দর্শকদের মনে। তবে এই ভগ্নদশাটা ইচ্ছে করেই বজায় রাখে চতুর জলদস্যু পিরানহা-শিকারের মনে সন্দেহ না জাগাবার জন্য। দেখতে যতই বাজে হোক, ব্লাঙ্কা আসলে পুরোপুরি কার্যক্ষম একটা বোট, মুহূর্তের মধ্যে যে-কারও উপর চড়াও হতে পারে। ভাঙাচোরা এই জলযানটা যে একদল ভয়ঙ্কর ডাকাতের বাহন, সেটা কল্পনাই করতে পারে না কেউ, বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই ঘায়েল হয়ে যায়।

মাথায় এ-জাতীয় কুবুদ্ধির কোনও অভাব নেই পিরানহার, তবে বোটের মত তার চেহারা দেখেও ক্ষুরধার মগজটার ক্ষমতা আঁচ করা যায় না। খাদ্যরসিক মানুষ সে, দিনে অন্তত ছ'সাতবার খাওয়াদাওয়া করে, সেইসঙ্গে সাবাড় করে কমপক্ষে তিন বোতল দেশি মদ- অতিরিক্ত আহার ও মদ্যপানের ফলে দেহে চর্বি জমেছে। সময়-অসময়ে তামাকও চিবোয় সে, দাঁতগুলো সে-কারণে বহু আগেই স্বাভাবিক রং হারিয়ে খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছে, মুখ দিয়ে ভক ভক করে দুর্গন্ধ বেরোয়। তার ওপর একটা পা নেই এই কুখ্যাত লোকটার- কোনকালে যেন গ্যাংগ্রিন হয়েছিল, কেটে বাদ দিতে হয়েছে। তাই হটাৎ দেখায় মোটাসোটা, পঙ্গু পিরানহাকে স্রেফ একজন নোংরা স্থানীয় মানুষ বলে ভ্রম হয়। বোঝা কঠিন যে, স্বাস্থ্য-সচেতনতার যতই অভাব থাকুক, বুদ্ধির কোনও অভাব নেই এর; নিত্যনতুন কূটকৌশল আবিষ্কারে এল্ পিরানহার জুড়ি মেলা ভার। বুঝেশুনেই আমাজনে ঘাঁটি গেড়েছে সে, একটা পা নেই বলে ডাঙায় খুব অসুবিধে তার, কিন্তু নদীতে যেহেতু দৌড়-ঝাঁপ করতে হয় না, এখানেই শুধু বুদ্ধি খরচ করেই বিশাল কিছু বনে যেতে পারবে বলে জানত, ঘটেছেও তা-ই।

পিরানহা এখন পরিণত হয়েছে আমাজনের ত্রাসে... এখানকার কিংবদন্তিতে। পঙ্গু মানুস্তাকে স্থানীয় অশিক্ষিত লোকজন অতিপ্রাকৃত এক শক্তি বলে ভাবে- মাটিতে যার একটা মাত্র পা পড়ে।

পিরানহার দলের লোকগুলোও কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। দেখে যেমন মনে হয় আমাজনের স্রোতের সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালার মত ভেসে এসেছে এরা, বাস্তবেও তা-ই। মেক্সিকো, স্পেন, ভেনিজুয়েলা, পেরু... বিভিন্ন দেশের নাগরিক এই জলদস্যুরা, আইনের হাত থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, আর তাদের সাদরে দলে টেনে নিয়েছে পিরানহা। কে কোনখান থেকে এসেছে, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই দস্যুসর্দারের, তার চাহিদা শুধু এটুকুই-দলের প্রতিটি সদস্যর নিঃশর্ত আনুগত্য থাকতে হবে... বিনা প্রশ্নে পিরানহা যা বলে তা-ই করতে হবে। যারা আদেশ অমান্য করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। পিরানহার রাজ্যে অবাধ্যদের স্থান নেই।

আজও দস্যুসর্দারের ইশারাতেই কাজ হোল। দৌড়ে গিয়ে ইঞ্জিন চালু করল দলের এক সদস্য, আর তার কয়েক মিনিট পরই ধীরে ধীরে খাল থেকে জুরুয়া শাখানদীতে বেরিয়ে এল বাহিয়া ব্লাঙ্কা। টার্গেট তখন মাত্র পাঁচশ' গজ দূরে, পূর্ণ বেগে ছুটে আসছে এদিকে। আচমকা ভূতের মত ক্যানুদুটোর সামনে উদয় হলো জলদস্যুর বোট। নৌকা ঘোরানর সময় নেই শিকারদের হাতে, সোজা প্রতিপক্ষের হাতের মুঠোয় চলে আসছে। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে তৈরি হবার নির্দেশ দিল পিরানহা, তবে সেটার প্রয়োজন ছিল না। এমনিতেই রেডি হয়ে আছে দস্যুরা- তাদের হাতে লোডেড অটোমেটিক রাইফেল, কোমরে শোভা পাচ্ছে প্রচুর পরিমাণ স্পেয়ার অ্যামিউনিশন। তা ছাড়া প্রত্যেকের কাছে ধারালো ছুরি আর মাচেটি তো রয়েছেই।

ক্যানু থেকে জিকোই প্রথম খেয়াল করল বিপদটা। আউটবোর্ড ইঞ্জিনের প্রবল গর্জন ছাপিয়ে তার কানে ভেসে এল স্টিম-ইঞ্জিনের ঝিকিঝিকি শব্দ,

পরমুহূর্তেই কালো ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে খালের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল মূর্তিমান আতঙ্ককে।

‘এল পিরানহা!’ চেঁচিয়ে উঠল সে।

এবার রাজীবও খেয়াল করল ব্যাপারটা। কলিশন কোর্সে ওদের দিকে ছুটে আসছে একটা আদ্দিকালের রিভারবোট, বো’র কাছে সশস্ত্র মানুষের জটলা। পিছনে ক্যানু’র যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কিত চেঁচামেচি শুনে মাথা ঘোরাল ও, ধমকের সুরে বলল, ‘শান্ত হও! হইচই করছ কেন?’

‘এল পিরানহা এসে গেছে সেনিয়র!’ ভয়ার্ত গলায় বলল জিকো। ‘আজ আমাদের কপালে মরন আছে!’

দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোনা কামড়াল রাজিব, জলদস্যুদের বোটটা খুব দ্রুত ছুটে আসছে ওদের দিকে, স্রোতের সাহায্য পাচ্ছে ওটা। ক্যানুর চালকের দিকে ফিরল ও। বলল, ‘ডানদিকে চেপে গিয়ে কোর্স ধরে রাখো, ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যাব আমরা।’

‘কী বলছেন এসব?’ প্রতিবাদ করে উঠল জিকো। ‘পিরানহাকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে? আমাদের থামতে হবে, আপনি আপনার হাত উৎসর্গ করে আমাদের জীবন বাঁচাবেন!’

কথাটায় কান দিল না রাজিব। ক্যানু-চালকের দিকে তাকিয়ে বলল, হাঁ করে দেখছ কী? ডানদিকে সরে যেতে বললাম না তোমাকে?’

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না চালকের মধ্যে, যেন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে সে, চলৎ-শক্তি হারিয়েছে। এই সুযোগে প্রায় ঘাড়ের উপর চড়ে বসল স্টিমারটা, গানেলের ওপর রাইফেল রেখে ফায়ার করল জলদস্যুরা। প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল চারপাশ।

‘মাথা নামাও! মাথা নামাও সবাই!!’ চেঁচিয়ে উঠল রাজিব।

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেল ক্যানু'র চালকরা, জান বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারা। ইঞ্জিনের আর.পি.এম. বাড়িয়ে ঘোরাতে শুরু করল বোটের নাক, স্টিমারটাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। নিচু হয়ে লাগেজ থেকে একটা রাইফেল তুলে নিল রাজিব, দ্রুত হাতে তাতে অ্যামিউনিশন লোড করল, তারপর মাথা উঁচু করে রিটার্ন ফায়ার শুরু করল ও। গুলি থেকে বাঁচবার জন্য আড়াল নিতে বাধ্য হলো জলদস্যুরা, এই সুযোগে স্টিমারের দু'পাশে পৌঁছে গেল ক্যানুদুটো, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওটাকে অতিক্রম করে চলে যাবে। মুখে হাসি ফুটল রাজিবের- একবার শুধু পিরানহার বাচ্চাকে পিছনে ফেলতে পারলে হয়, আদ্দিকালের স্টিম-বয়লার ইঞ্জিন নিয়ে ব্যাটা কীভাবে এই আউটবোর্ড মোটরকে ধাওয়া করে, দেখবে ও।

ব্যাপারটা পোড়-খাওয়া দস্যুসর্দারও জানে, তবে এত সহজে শিকারকে হাতছাড়া করতে রাজি নয় সে। চেঁচিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে কয়েকটা আদেশ দিল পিরানহা, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মায়া ত্যাগ করে গানেলের উপরে মাথা তুলল জলদস্যুরা- অঝোর ধারায় গুলি করতে শুরু করল। ঠিক এই সময় রাজিবের অ্যামিউনিশনও ফুরিয়ে গেল। ঝাঁপ দিয়ে ক্যানুর মেঝেতে শুয়ে পড়ল ও।

একের পর এক গুলির আঘাত ক্যানুদুটোকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে দস্যুরা, মাথা নিচু করে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না অভিযাত্রী দলের। চোখের সামনে নৌকার গায়ে এক্তার পর একটা ফুটো সৃষ্টি হতে দেখল রাজিব, প্রবল বেগে পানি ঢুকতে শুরু করল বুলেটের গর্তগুলো দিয়ে। ক্যানুদুটো স্টিমারকে অতিক্রম করতে পারল ঠিকই, তবে ততক্ষণে পানিতে প্রায় ভরে গেছে খোল, বাড়তি এই ওজনের কারণে গতি অনেক কমে গেল- ইঞ্জিনগুলো আর আগের মত স্রোত ঠেলে এগিয়ে নিতে পারছে না নৌকাদুটোকে।

স্টিমারের ইঞ্জিনের জোর আওয়াজ ছাপিয়ে একটা হাসি ভেসে এল ওপর থেকে। মাথা তুলে তাকাল রাজিব- ডেকের উপর মোটাসোটা, বিশ্রী চেহারার এক লোককে দেখা যাচ্ছে; এ-ই বোধহয় পিরানহা, বাকিদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। শিকারকে অচল করে দিতে পেরে তার খুশি বাধ মানছে না। ক্যানুর চেয়ে স্টিমারের ডেক কয়েক ফুট উঁচুতে; ফলে উপর দিক থেকে নিচের টার্গেটে গুলি করবার সুবিধে পাচ্ছে জলদস্যুরা, তার ওপর একটু পরেই বুলেটের আঘাতে কাশতে কাশতে থেমে গেল ইঞ্জিনদুটো।

বাঁচার আর কোনও উপায় নেই। চারপাশে ঝপাঝপ শব্দ হলো, ইন্ডিয়ানরা লাফিয়ে পড়ছে পানিতে। সেদিকে তাকিয়ে রাজিব বুঝল, ওকেও একই কাজ করতে হবে। তবে তাতে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। পালানোর তো প্রশ্নই ওঠে না, পিরানহার হাতে ধরা পড়তে হবে সবাইকে। কিন্তু লস ডেল রিয়োর ম্যাপটা খুনে ডাকাতটার হাতে পড়তে দেয়া যাবে না কিছুতেই। তাই পকেট থেকে ওটা বের করে লাইটারের আগুনে পুড়িয়ে ফেলল ও। ততক্ষণে ক্যানুর খোল প্রায় পুরোটাই ভরে গেছে পানিতে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তলিয়ে যাবে ওটা। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজিব।

তাড়াতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ে সারফেসে ভেসে উঠল ও। গুলি থামিয়েছে জলদস্যুরা, এই সুযোগে ইন্ডিয়ানদের অনেকেই সাঁতার কেটে তীরের দিকে চলে যেতে শুরু করেছে। দেখাদেখি রাজীবও তা-ই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কয়েক গজ যেতে না যেতেই স্টিমারটা ওর গায়ের কাছে চলে এল, ডেক থেকে বন্দুক বাগিয়ে কয়েকজন ভয়ঙ্করদর্শন লোক ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। উপর থেকে থামার আদেশ এল। বাধ্য হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল ও, হাত-পা নেড়ে ভেসে থাকছে শুধু।

মোটাসোটা পিরানহাকে দেখা গেল গানেলের পাশে। পালাতে থাকা ইন্ডিয়ানদের দিকে খুব একটা মনোযোগ দিল না সে, বরং হাসিমুখে তাকাল

রাজিবের দিকে। ওকে অবাক করে দিয়ে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল, 'গুড আফটারনুন, সেনিয়র! পানিতে এভাবে হাবুডুবু খেতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই? হাত বাড়ান, আপনাকে তুলে আনছি আমরা।'

'তুলে আনবেন?' জিজ্ঞেস করল রাজিব। 'নাকি হাতটাই কেটে নেবেন?'

উঁচু গলায় হেসে উঠল পিরানহা কথাটা শুনে। 'উজবুক ইন্ডিয়ানগুলোর গপ্পো শুনেছেন বুঝি? হাত কেটে পিশাচকে উপহার দেয়ার রীতি রয়েছে ওদের মধ্যে। তাতে নাকি অমঙ্গল কেটে যায়। কী অদ্ভুত বিশ্বাস তাই না?' সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। 'মিগুয়েল, রবার্তো, এই ভদ্রলোককে পানি থেকে তোল। জংলীগুলোকে ধরে আনার ব্যবস্থা করো।'

দড়ি ছুঁড়ে দেয়া হলো বাহিয়া ব্লাঙ্কা থেকে, অস্ত্রের মুখে সেগুলো বেয়ে স্টিমারে উঠে এল রাজিব, ওর পিছু নিয়ে ইন্ডিয়ানরাও। কেউ কেউ অবশ্য সাঁতার কেটে পালিয়ে গেছে, তবে তা নিয়ে পিরানহাকে তেমন একটা চিন্তিত হতে দেখা গেল না। বন্দিদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে বলল সে, ডুবন্ত ক্যানুদুটোকেও স্টিমারের সঙ্গে আটকে টো করার আদেশ দিল।

দ্রুত কাজগুলো সেরে ফেলল ব্লাঙ্কার ক্রু-রা। তারপর বন্দিদের একত্র করে দেহতল্লাশি শুরু করল। ইন্ডিয়ানদের কাছে মাদুলি আর কাঠের ব্রেসলেট ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। বিরক্ত গলায় পিরানহা বলল, 'যত্তোসব ফকিরের দল এসে জুটেছে আমার কপালে!' রাজিবের দিকে তাকাল সে। 'ইকুইটোস্ থেকে লোক ভাড়া করতে পারলেন না, সেনিয়র? ওদের কাছে ভাল অলংকার থাকে, মাঝে মাঝে সোনা-বাঁধানো দাঁতও পাওয়া যায়।'

'দুঃখিত,' তিক্ত সুরে বলল রাজিব। 'ব্যাপারটা কেউ জানায়নি আমাকে। আগামীতে এ-ভুল হবে না।'

হো হো করে হেসে উঠল দস্যুসর্দার। যেন খুব মজার কথা বলেছে বন্দি। আলগোছে মোটাসোটা মানিব্যাগটা তুলে নিল রাজিবের প্যান্টের ব্যাকপকেট

থেকে। খুশি হয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু একজন সঙ্গী মুখ খোলায় বাঁধা পেল।

'ব্যাটারা পালিয়ে যাচ্ছে, বস্।'

মাথা ঘুরিয়ে নদীর দিকে তাকাল পিরানহা, সেখানে তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে পালাতে থাকা ইন্ডিয়ানেরা। 'হুম, এত সহজে ওদের যেতে দেয়াটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না,' আনমনে বলল সে। তারপর তাকাল নিজের লোকজনের দিকে। 'গুলি করো।'

হুকুম জারি হতেই যা দেরি, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জে উঠল জলদস্যুদের রাইফেলগুলো। পলায়নপর ইন্ডিয়ানদের চারপাশে পানি ছিটকাতে শুরু করল, পিঠে গুলি খেয়ে তলিয়ে গেল দুজন। ওটুকুই যথেষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে বাকিরা থেমে গেল, আত্মসমর্পণ করছে হাত তুলে। কিন্তু দুঃসাহসী একজনকে অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম দেখা গেল- গুলি-টুলির পরোয়া করল না সে, সাঁতার কেটে তীরে উঠল, তারপর এঁকেবেঁকে ছুট লাগিয়ে হারিয়ে গেল গাছগাছালির আড়ালে।

লোকটা জিকো— দূর থেকে দেখেও চিনতে পারল রাজিব।

গাঁট্টাগোট্টা গাঁটকুকে পালিয়ে যেতে দেখে তেমন ভাবান্তর হলো না পিরানহার মধ্যে। বরং সন্তুষ্ট গলায় সে বলল, 'ভালই হলো ব্যাটা পালিয়ে যাওয়ায়। গাঁয়ে ফিরে এক পা-অলা পিশাচের কাহিনি আরও ভালমত ছড়াবে ও।' রাজিবের দিকে তাকাল দস্যুসর্দার, পরমুহূর্তে তার চোখ আটকে গেল।

রাজিব আবরারের ভেজা কাপড়ের আড়াল থেকে ফুটে উঠেছে বুকপকেটে রাখা একটা চারকোণা আকৃতি -এখনও ওকে তল্লাশি করা হয়নি বলে জিনিসটা রয়ে গেছে। কৌতূহলী হয়ে ওটা বের করতে বলল পিরানহা, জ্যাকেটের ভিতর থেকে চামড়ায় মোড়া একটা পাউচ বের করে দেখাল রাজিব।

‘কী এটা?’ বলে পাউচটা খুলে ফেলল দস্যুসর্দার- একটা খাতার মত পাওয়া গেল ওটার মধ্যে।

‘ওটা আমার ডায়েরি,’ সংক্ষেপে জানাল রাজিব।

‘হুঁ, কী আছে এটার ভিতরে?’

‘কী আবার... ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার, কথাবার্তা!’

‘তা-ই?’ খুশি খুশি গলায় বলল পিরানহা। ‘তা হলে তো অনেক গোপন খবর জানা যাবে। পড়ে দেখতে হবে।’ ডায়েরিটা কোমরে গুঁজে ফেলল সে।

একটু পরেই নদী থেকে আত্মসমর্পণ করা ইন্ডিয়ানদের তুলে ফেলা হলো। আর তারপর দস্যুসর্দারের নির্দেশে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল বাহিয়া ব্লাঙ্কা, গগনবিদারী ভেঁপু বাজিয়ে রওনা হয়ে গেল জুরুয়ার উজানের দিকে।

তিন

বিকেল নাগাদ আমাজনের গভীরে ভাঙাচোরা একটা ডকের পাশে এসে ভিড়ল বাহিয়া ব্লাঙ্কা। পিয়ারটার বেশিরভাগ তক্তাই গায়েব হয়ে গেছে; যে-ক’টা আছে, সেগুলোও এবড়োথেবড়ো, ঘুণে ধরা। ডকের ওপাশে মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা হাঁটাপথ চলে গেছে একটা খোলা জায়গার দিকে- বেশ কয়েকটা অপরিচ্ছন্ন কুঁড়েঘর রয়েছে ওখানে, জায়গাটা পিরানহা আর তার দলবলের বাসস্থান... একটা গ্রাম।

গ্রামটা... যদি ভাঙাচোরা কাঠের টুকরো আর জং-ধরা টিনের চালের তৈরি একগুচ্ছ কুঁড়েঘরকে গ্রাম বলা যায় আর কি... জঙ্গলের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে গড়ে তোলা হয়েছে। চারপাশটা গাছপালার স্বাভাবিক আচ্ছাদনে ঘেরা, ন্যাচারাল ক্যামোফ্লাজ তৈরি হয়েছে এর ফলে। ঢোকা বা

বেরুনোর পথ ওই একটাই- যেটা সাপের মত এঁকেবেঁকে ডক থেকে এছেছে। প্রাঙ্গনের এখানে-সেখানে মাটি পুড়ে কালো হয়ে আছে- নিয়মিত ক্যাম্পফায়ার জ্বালানোর কারণে। এ ছাড়াও একেকটা কুঁড়ের আশেপাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে রাজ্যের জঞ্জাল, ওগুলো আসলে লুটের মাল। তবে জিনিসগুলোর অবস্থা আর মান দেখে জলদস্যুতা কতটা লাভজনক পেশা, সে ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ হয়।

পিরানহার "প্রাসাদ"-টা অবশ্য দেখলেই চেনা যায়, অন্যান্য কুঁড়ের চেয়ে সেটা একটু ব্যতিক্রম। না, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অথবা ঝকঝকে টাইপের ব্যতিক্রম নয়, স্রেফ আকারে বড়। বিলাসিতার চিহ্ন হিসেবে সেটার উপরে একটা বেঁকে যাওয়া টিভি অ্যান্টেনা শোভা পাচ্ছে। হাতে বানানো একটা পিকনিক টেবিল আর বেঞ্চ বসিয়ে ওটার সামনে আউটডোর ডাইনিঙের ব্যবস্থা করা রাখা হয়েছে। তালামারা একটা টিনের দোচালা হচ্ছে জলদস্যুদের অস্ত্রভাণ্ডার, সেটাও এই কুঁড়েটার পাশে। দুটো গাছের ডালে বেঁধে পুরনো একটা পেরুভিয়ান হ্যামক ঝুলিয়েছে পিরানহা, অবসর সময়ে ওটায় শুয়ে থাকে সে- ওটা তার লাউঞ্জ এরিয়া। পুরো গ্রামের শেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোটা কয়েক লোহার খাঁচা- কয়েদিদের আটকে রাখার জন্য। লিভিং এরিয়া থেকে দূরে, জঙ্গলের গাছগাছালির আড়ালে রাখা হয়েছে ওগুলো— ঠাট্টা করে পিরানহা খাঁচাগুলোকে তার গেস্ট কোয়ার্টার বলে।

রিভারবোট থেকে নামিয়ে রাজিব আর অন্যান্য বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হলো খাঁচার দিকে, মোটাসোটা দস্যুসর্দার গেল তার নিজের কুঁড়েতে, কিন্তু ভিতরে পা দিয়েই থমকে গেল সে।

মাঝবয়েসী এক শ্বেতাঙ্গ এদিক ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কুঁড়ের সামনের কামরায়- সোনালী চুল, মুখে চাপদাড়ি। একে চেনে পিরানহা -লোকটার নাম ম্যাকলিন বোর্ডার, দক্ষিণ আফ্রিকান। পেশায় অস্ত্র-ব্যবসায়ী সে, সেই সঙ্গে

দু'নম্বরী সব ধরনের জিনিসপত্রও চোরাচালান করে। জলদস্যুদের সব অস্ত্র আর গোলাবারুদ সে-ই সরবরাহ করে। বছরখানেক হলো, তৃতীয় একটা পক্ষের হয়ে পিরানহার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বোর্ডার, বিভিন্ন রকম ফরমায়েশ আনছে আর সরবরাহের বিনিময়ে টাকা-পয়সা লেনদেন করছে। গ্রামে তার উপস্থিতি অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে তার আচরণ ঠিক স্বাভাবিক নয়। থমথমে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পিরানহারই অপেক্ষায়।

হাসল পিরানহা। অমায়িক সুরে বললল, 'গুড আফটারনুন, সেনিয়র। কী সৌভাগ্য আমার, গরীবের ঘরে হাতির পা!'

কুশল বিনিময়ে মোটেই আগ্রহ দেখাল না বোর্ডার, তার বদলে ঝট্ করে একটা পিস্তল বের করল। তার পিছনে সেফের ডালাটা খোলা অবস্থায় দেখতে পেল পিরানহা- তালাটা কারিগরি খাটিয়ে খুলে ফেলা হয়েছে।

মুখের ভাবভঙ্গির একটুও পরিবর্তন হলো না ধুরন্ধর জলদস্যুর, চেহারায় হাসি ধরে রেখে অনুযোগের সুরে বলল, 'এ কেমন ব্যবহার, সেনিয়র! বন্ধুর দিকে এভাবে পিস্তল তাক করে কেউ?'

'তুমি আমার বন্ধু নও, মোটকু!' খেপাটে গলায় বলল বোর্ডার। 'যা জানতে চাই, সেটা বলো। সেফ খালি কেন? টাকা-পয়সা সব কোথায়?'

'টাকা!' বিস্মিত হবার ভান করল পিরানহা। 'টাকা তো আপনিই আমাকে দেবেন। আপনার বস... মিস্টার হোয়াইটের কথামত কাজ করছি না আমি? নদী থেকে সবাইকে দূরে সরিয়ে রাখছি, কাউকে উজানে যেতে দিচ্ছি না, লোক ধরে এনে দিচ্ছি, আরও একটা চালান রেডি... টাকা পাচ্ছি না কেন? আপনি আমার কাছে টাকা-পয়সা চাইছেন, কয়েক কিস্তির টাকা তো আমারই পাওনা হয়ে আছে আপনাদের কাছে।'

‘হোয়াইটের সঙ্গে আর নেই আমি,’ মুখ কালো করে বলল বোর্ডার। ‘ঘিলুতে বুদ্ধি থাকলে তুমিও এখুনি সরে পড়ো। কী করতে যাচ্ছে ও, কিছু জানো তুমি? মারা পড়বে... স্রেফ মারা পড়বে!’

‘অ!’ মাথা দোলাল পিরানহা। ‘হিতৈষী হয়ে আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন?’

‘উপদেশ-টুপদেশ কিচ্ছু না, আমি এসেছি টাকার জন্যে,’ গোঁয়ারের ভঙ্গিতে বলল বোর্ডার। ‘খালি হাতে এখান থেকে ফিরে যেতে পারব না আমি। টাকা-পয়সা কোথায় রেখেছ, বলো এখুনি। নইলে খারাবি আছে তোমার কপালে।’

‘বলব, বলব, এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আগে একটু বসতে তো দেবেন! পা-টা বড্ড ব্যথা করছে, একটা পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে কত যে কষ্ট, সে তো জানেনই!’

জবাবের অপেক্ষা করল না, ফ্ল্যাপ ঠেলে কুঁড়ের ভিতরের কামরায় ঢুকে পড়ল পিরানহা, তাকে অনুসরণ করল বোর্ডার। এই ঘরটা দস্যুসর্দারের ঘুমানোর জায়গা- এক কোনায় মাঝারি আকারের একটা খাট রয়েছে, পাশেই একটা ওয়ার্ডরোব, আর সেটার উপরে একটা সাদা-কালো টিভি। একটা ছোটখাট ডেস্কও রয়েছে কামরাটায়, ঘুরে সেটার পিছনে রাখা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল পিরানহা, কাঠের পা-টা তুলে দিল ডেস্কের উপর।

‘আহ, কী আরাম!’

‘জলদি বলো টাকা কোথায় রেখেছ,’ অধৈর্যের সুরে বলল বোর্ডার। খেয়াল করল না, পিরানহার কাঠের পা এখন ওর দিকে তাক হয়ে রয়েছে। নইলে অন্য পা-টাও খোঁড়া করে দেব, যাতে বাকি জীবন এভাবেই ডেস্কের উপর দু’পা তুলে আরাম করতে হয় তোমাকে।’

কাঁধ ঝাঁকাল পিরানহা। 'এতদিন একসঙ্গে কাজ করেও আমাকে চিনতে পারেননি দেখছি! বাঘের গুহায় ঢুকে বাঘকেই হুমকি দেয়া কি ঠিক হচ্ছে, সেনিয়র?'

'বাঘ!' হেসে উঠল বোর্ডার। 'তুই তো ব্যাটা একটা চামচিকা! নদীতে দু'চারটে ডাকাতি করে নিজেকে বাঘ ভাবছিস বুঝি?'

'আমি ভাবতে যাব কেন... লোকে বলে। সত্যি কি না তার প্রমাণ চান?' শীতল গলায় বলল পিরানহা।

থমকে গেল বোর্ডার। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, পিস্তলের ট্রিগারে ধরা আঙুলটা রক্ত সরে সাদা হয়ে যাচ্ছে- গুলি করবে এখুনি। আর দেরি করল না পিরানহা, বিদ্যুৎবেগে হাত নাড়াল সে- প্যান্টের উপর দিয়ে স্পর্শ করল কী যেন। দপ করে সাদা একটা আলো জ্বলে উঠল সামনে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল পুরো কুঁড়েটা।

বুকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে উড়ে গেল বোর্ডার, আছড়ে পড়ল কুঁড়ের দেয়ালে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য স্থির রইল দেহটা, তারপরই হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে- বুকে বিশাল এক গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, কলকল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। হতভাগ্য অস্ত্র বিক্রেতার জানা ছিল না, পিরানহার নকল পা-টার ভিতরে একটা শটগান লুকানো থাকে... এ-ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য। ওটা দিয়েই গুলি করা হয়েছে তাকে।

প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার আগের কয়েকটা মুহূর্ত বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বোর্ডার- ঠোঁটদুটো কাঁপল তিরতির করে, কিন্তু কথা বেরুল না... তার বদলে কাশির সঙ্গে দমকে দমকে তাজা রক্ত বেরিয়ে এল মুখ থেকে। শেষ পর্যন্ত যখন নিস্তেজ হয়ে দেহটা ঢলে পড়ল, তখনও চোখদুটো খোলাই থাকলো।

নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটল পিরানহার ঠোঁটে। বলল, 'এক পায়ে হাঁটি বলে আমাকে ছোট করে দেখাটা তোমার একদমই উচিত হয়নি, সেনিয়র।'

বাইরে ধুপধাপ আওয়াজ শোনা গেল, গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসছে জলদস্যুরা। ফ্ল্যাপ ঠেলে ভিতরে ঢুকল কয়েকজন, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল নিজেদের সর্দার আর পড়ে থাকা মৃতদেহটার দিকে।

‘লাশটার পায়ে পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দাও,’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল দস্যুসর্দার। ‘নদীর পিরানহাদের জন্য ডাঙার এই পিরানহার উপহার ওটা।’

মাথা ঝাঁকিয়ে বোর্ডারের মৃতদেহ তুলে নিল জলদস্যুরা, ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাইরে। শটগানের গুলিতে নষ্ট হওয়া ভাঙা পা-টা খুলে ফেলল এবার পিরানহা, ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওয়াল কেবিনেটটা খুলল- ওখানে একই রকম আরও ছ'টা পা দেখা যাচ্ছে, সবগুলোর মধ্যেই একটা করে শটগান বসানো আছে। হাঁটুর নিচে নতুন একটা পা লাগাতে লাগাতে হাসল মোটাসোটা দস্যুসর্দার— একটা পা না থাকার কিছু সুবিধে তো রয়েছেই।

দু'দিন পর।

লাকড়ির আগুনে রান্না হচ্ছে, গন্ধে ম ম করছে চারদিক। কিন্তু পিরানহা সেই গন্ধ শুকে মুখ বাঁকিয়ে ফেলল। এই গন্ধ খুবই পরিচিত তার, আজ আবার আর্মাডিলো রান্না হচ্ছে। পর পর তিন দিন বিশ্রী প্রাণীটার মাংস খেতে হচ্ছে জলদস্যুদের, আর কোনও শিকার পাওয়া যায়নি। বিড় বিড় করে একটা খেদোক্তি করল খাদ্যরসিক দস্যুসর্দার, একটা মুরগী পাওয়া গেলে কতই না ভালো হত। শেষ বিকেল, নিজের হ্যামকে শুয়ে আছে সে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে আশপাশের গাছপালার মাথা, যেন টোপর পরেছে— সন্ধে হতে খুব একটা দেরি নেই। দূর থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে, অন্ধকার নামার অপেক্ষা করছে না উভচর প্রাণীগুলো, এখুনি ডাকতে শুরু করেছে।

অন্য চিন্তায় ডুবে যেতে বসেছিল পিরানহা, হটাৎ সচকিত হয়ে উঠল। নদীর দিক ভেসে আসছে ইঞ্জিনের আওয়াজ, ভট ভট করতে করতে একটা মোটর লঞ্চ আসছে। তারমানে মিস্টার হোয়াইট!

আনমনে মাথা দোলাল দস্যুসর্দার, এ-মুহূর্তে ঝামেলা পোহানোর মুডে নেই সে। কিন্তু ব্যাপারটা এড়াবারও উপায় নেই, বোর্ডারের খোঁজে হোয়াইট যে এখানে আসবে, সেটা আগেই আন্দাজ করেছিল। তাই বলে এখন? কাল সকালে এলে কী এমন ক্ষতি হত? নিজের নতুন পা–টাতে হাত বোলাল পিরানহা, এটা এখনই না আবার ব্যবহার করতে হয়।

ডকে এসে ভিড়ল মোটর লঞ্চটা, ইঞ্জিনের আওয়াজ কমতে কমতে থেমে গেল। একটু পরেই হাঁটাপথটা ধরে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সদর্পে গ্রামে হাজির হোল মিস্টার হোয়াইট, ভাবখানা এমন যেন, সে-ই এখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। মনে মনে অবশ্য তেমনটাই ভাবে লোকটা।

হ্যামক ছেড়ে নেমে পড়ল পিরানহা, এগিয়ে গেল অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে।

পুরো ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা মিস্টার হোয়াইট, বেঁটেখাটো দস্যুসর্দারের পাশে তাকে রীতিমত তালগাছের মত দেখায়। বয়স খুব বেশি হবে না তার, টেনে-টুনে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হতে পারে। সবসময় ছাইরঙা সাফারি ড্রেস পরে সে, ওপরে থাকে বুশ-জ্যাকেট, পায়ে চকচকে কালো বুট- হঠাৎ দেখায় পেশাদার শিকারী বলে মনে হয়।তবে শিকারী নয় লোকটা, তার সত্যিকার পেশা কী, জানা নেই পিরানহার। শুধু এটুকু জানে, টাকা-পয়সার অভাব নেই এর, যাকে খুশি কিনে নিতে পারে। জলদস্যুদের সঙ্গে কয়েক মাস হলো ব্যবসা করছে সে, টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র আর অস্ত্র-শস্ত্র আনাচ্ছে, সেই সঙ্গে ক্রীতদাসও কিনছে। চেহারায় এক ধরনের নিষ্ঠুরতা ফুটে থাকে

হোয়াইটের, চোখের তারায় শয়তানি। কথা ঘোরানো-প্যাঁচানো তার স্বভাবের মধ্যে নেই, যা চায় তা সরাসরি বলে। আজও এর ব্যতিক্রম হলো না।

'বোর্ডারকে খুঁজছি আমি,' রুক্ষ গলায় বলল হোয়াইট। 'দু'দিন আগে তোমার টাকা নিয়ে এসেছে সে, এখনও ফেরেনি। কোথায় ও?'

'টাকা নিয়ে এসেছে? কই, আমার কাছে তোঁ আসেনি!' অবাক হবার ভান করল পিরানহা। 'আমিই তো বরং লোক পাঠাব ভাবছিলাম। টাকা-পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে কি না! জনাব আবার আমার উপরে কোনও কারণে নাখোশ হয়েছেন কি না, সেটাও জানা দরকার ছিল। যা-ই বলুন, সেনিয়র, আমি কিন্তু ঠিকমত কাজ করে যাচ্ছি— বাঁকের এপারে কাউকে আসতে দিচ্ছি না, আপনার জন্য লোকও জোগাড় করে দিচ্ছি, আবার এক চালান রেডি করেছি। কিন্তু টাকার দেখা মিলছে না। অনেক টাকা বাকী পড়ে আছে আপনার কাছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দস্যুসর্দারকে দেখল হোয়াইট- কথাটার সত্যি-মিথ্যা যাচাইয়ের চেষ্টা করছে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'হুম, ব্যাটা ভেগেছে তাহলে। গত কয়েকদিন থেকে ওর হাবভাব ভাল ঠেকছিল না আমার কাছে।'

'তা-ই নাকি, জনাব?' যেন চমকে গেছে পিরানহা। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'হতে পারে। লোকটা অসম্ভব লোভী ছিল। আমার পাওনা টাকা নিয়েই পালাল নাকি!'

'কিন্তু পালালে তো চলবে না!' চিন্তিত কণ্ঠে বলল হোয়াইট। 'লোকটা যদি ইকুইটোসে পৌঁছে যায়, আর নেশার ঘোরে সব ফাঁস করে দেয়, আমাদের তো বিপদ হবে!'

দাঁত বের করে হাসল পিরানহা। 'নিশ্চিন্ত থাকুন, জনাব। অমন কিছু ঘটাবার কোনই সম্ভাবনা নেই।'

ঝট করে তার দিকে তাকাল হোয়াইট, দস্যুসর্দারের হাসিমুখ দেখে যা বোঝার বুঝে ফেলল সে। কাটা কাটা স্বরে বলল, ‘তুমি ওকে খুন করেছ।’

‘ছি, ছি, জনাব, এসব কী বলছেন?’ কপট সুরে বলল পিরানহা। ‘আমি একজন সামান্য রিভারবোট ক্যাপ্টেন, আমি খুনোখুনি করতে যাব কেন? বলছিলাম যে, আমাজনের জঙ্গল বড় ভয়ানক -মানুষকে গিলে খেতে জানে। তা ছাড়া এখান থেকে ইকুইটোস-ও কম দূর নয়। পথে কত কিছুই ঘটতে পারে!’

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, কথাটা একবিন্দুও বিশ্বাস করেনি হোয়াইট। তবে এ নিয়ে সম্ভবত আর বাড়াবাড়ি করবার ইচ্ছে নেই তার, তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, ‘যাক গে, খবর কী, শোনাও? আমার জন্যে কী বলে তৈরি রেখেছ?’

‘জী, জনাব। লোক জোগাড় করেছি।’

‘কত জন?’

‘ছাব্বিশ। সবগুলোই জোয়ান, শক্ত-সমর্থ।’

‘হুম,’ মাথা ঝাঁকাল হোয়াইট। ‘ওদেরকে লঞ্চে তোলার ব্যবস্থা করো।’

‘নিশ্চয়ই,’ বলে হাতে তালি বাজাল পিরানহা, দলের লোকজনকে ইশারায় কাজ শুরু করতে বলল। তারপর তাকাল হোয়াইটের দিকে। ‘আসুন, জনাব। লোডিং হতে হতে আমার গরীবখানায় একটু বিশ্রাম নিন।’

অতিথিকে নিয়ে নিজের কুঁড়েতে ঢুকল পিরানহা, ভিতরের কামরায় গিয়ে একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিল। কিন্তু বসবার আগ্রহ দেখা গেল না হোয়াইটের মধ্যে, ঘুরে ঘুরে কামরার জিনিসপত্র দেখছে সে। পিরানহার ডেস্কের উপর পড়ে থাকা ডায়েরিটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কৌতূহলী হয়ে সেটা তুলে নিল হাতে।

‘এ জিনিস তোমার টেবিলে কেন?’ জিজ্ঞেস করল হোয়াইট, ইংরেজিতে লেখা ডায়েরি দেখে তার ভুরু কুঁচকে গেছে। ‘আমি তো শুনেছি, তুমি ইংরেজি পড়তে জানো না।’

‘যা শুনবেন, তার সবটাই বিশ্বাস করবেন না,’ মুচকি হেসে বলল পিরানহা। ‘আমাজনের মত আমারও অনেক অজানা অধ্যায় আছে।’

‘তাই নাকি?’ মুখ বাঁকাল হোয়াইট। ‘তা বাছা, বলো দেখি— ইংরেজি বর্ণমালায় ক’টা অক্ষর আছে?’

জবাব দিতে পারল না পিরানহা, বেকুবের মত দাঁত বের করে হাসল শুধু।

‘হুঁ, তোমার অজানা অধ্যায়ের দৌড় জানা হয়ে গেল আমার,’ বিদ্রুপ করল হোয়াইট, ডায়েরিটা উল্টেপাল্টে দেখল। ‘এটা রাজিব আবরারের ডায়েরি,’ সামনের পাতায় লেখা নামটা পড়ে মন্তব্য করল সে। ‘কোথায় পেয়েছ এটা?’

‘লোকটা খুব বিখ্যাত নাকি?’ জানতে চাইল পিরানহা।

‘তা নয়, তবে এই এলাকায় অভিযানে আসছিল সে,’ বলল হোয়াইট। ‘তোমাকে একজন বাংলাদেশি আর্কিওলজিস্টের কথা বলা হয়েছিল না? এ-ই সে লোক।’

‘আপনি তো বলেছিলেন পুরো একটা দল আসবে, এ-ব্যাটা তো একা ছিল।’

‘ধরেছ ওকে?’

‘হ্যাঁ। আজকের ছাব্বিশ জনের মধ্যে আছে।’

‘গুড,’ সন্তুষ্ট দেখাল হোয়াইটকে। ‘ওকে নিয়ে অন্যরকম প্ল্যান আছে আমার।’ পকেট থেকে টাকার একটা বান্ডিল বের করে পিরানহার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। ‘এই নাও তোমার বকেয়া টাকা। টাকা-পয়সা নিয়ে ভেবো না,

মাঝেমধ্যে একটু দেরি হতে পারে... কিন্তু মার যাবে না কখনও। কাজেই আমার ডেরায় লোক পাঠাবার দরকার নেই কখনও, বুঝেছ?'

ময়লা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল ধুরন্ধর জলদস্যু। আঙুলে থুতু লাগিয়ে গুনল টাকাটা। তারপর বলল, 'এক মিনিট জনাব। হিসেবে বোধহয় একটু গরমিল হয়েছে, ওই আর্কিয়ো-লজিস্টের জন্য আরও কিছু বেশি পাওয়া উচিত আমার।'

'কীসের বেশি!' বিরক্ত গলায় বলল হোয়াইট। 'একজন মাত্র লোক, ধরতে নিশ্চয় বাড়তি কোনও ঝামেলা হয়নি?'

'এখন হয়নি, কিন্তু পড়ে যে হবে না, সেটা কে বলতে পারে? হাজার হোক, এ-লোক অশিক্ষিত জংলি আদিবাসী নয়, সরকারি অনুমতি নিয়ে অভিযানে এসেছে। ওর খোঁজে কেউ যে আসবে না, সেটার কি গ্যারান্টি দিতে পারেন আপনি?'

'ফালতু কথা বোলো না! এ-এলাকায় কখনও কেউ আসে না, এলেও তাদের ফাঁকি দেয়া তোমার জন্যে কোনও ব্যাপার না। তা ছাড়া সামান্য একজন বাংলাদেশি আর্কিওলজিস্টের খোঁজে কেউ উতলা হবে বলেও মনে হয় না আমার। যদি হয়, তখন না হয় তোমাকে আরও কিছু টাকা ধরে দেয়া হবে।'

'সেক্ষেত্রে অন্তত ডায়েরিটার দাম দিয়ে যান,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল পিরানহা।

পালা করে হাতের ডায়েরি আর দস্যুসর্দারের দিকে তাকাল হোয়াইট, পরমুহূর্তেই তার চেহারায় হিংস্রতা ফুটল। কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আনল সে, তাক করল প্রতিপক্ষের দিকে।

'বুঝে-শুনে কথা বলো, মোটকু!' খেপাটে গলায় বলল হোয়াইট। ' আমার সঙ্গে চালবাজি করার চেষ্টা কোরো না। ডায়েরিটা নিয়ে যাচ্ছি আমি, বাড়াবাড়ি করলে খুলি উড়িয়ে দেব।'

কাঁধ ঝাঁকাল পিরানহা, বোর্ডারের মত একে ফাঁদে ফেলার সুযোগ নেই। চেয়ারে বসে ডেস্কে পা তুলতে দেখলেই ব্যাটা সন্দেহ করে বসবে। তাই মুখের হাসিটা ধরে রেখে সে বলল, 'রাগ করছেন কেন? আপনি আমার পুরনো কাস্টোমার... নাহয় একটা ডিসকাউন্টই দিলাম, অসুবিধে কীসের? নিন, ডায়েরিটা আপনিই নিন। ঠাণ্ডা কিছু আনাই?'

মুখ খারাপ করে একটা গাল দিল হোয়াইট, তারপর বেরিয়ে গেল কুঁড়ে থেকে। পিরানহাও পিছু নিল।

বন্দিদেরকে ইতিমধ্যে তুলে ফেলা হয়েছে মোটর লঞ্চে, হোয়াইটের সঙ্গীরা পাহারা দিচ্ছে তাদের। সেখান থেকে রাজিবকে আলাদা করে নিয়ে আশা হলো।

'ওকে সামনের কেবিনে নিয়ে যাও,' বলল হোয়াইট। 'ওর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে।'

'কে আপনি?' বিস্মিত গলায় বলল রাজিব। 'কী চান আমার কাছে?'

'সেটা খুব শীঘ্রিই জানতে পারবেন, ডক্টর আবরার,' মুচকি হেসে বলল হোয়াইট।

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না রাজিব, ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল লোকগুলো।

লঞ্চের ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে, আস্তে আস্তে ডক ছেড়ে সরে গেল জলযানটা। তীরে দাঁড়ানো পিরানহা আর তার দলবলের দিকে হাত তুলে বিদায় জানাল হোয়াইট। 'আবার দেখা হবে,' গলা চড়িয়ে বলল সে।

'নিশ্চয়ই,' বিড়বিড় করে বলল পিরানহা। 'দেখা তো হতেই হবে। আমাকে ঠকিয়ে কেউ পার পায় না, সেনিয়র। তোমার কাছ থেকে সমস্ত পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ছাড়ব আমি। প্রমিজ!'

চার

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার। সকাল দশটা। নিজের চেম্বারে বসে আয়েশ করে কফির কাপে একটা চুমুক দিল মাসুদ রানা। হাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম তেমন কিছু নেই, ফাইলপত্র ঘেঁটে আর চা-কফি খেয়ে গত একটা সপ্তাহ অফিসের সময়টুকু কাটাতে হচ্ছে ওকে। সহকর্মী জাহেদ, সলীল, সোহানা, রূপা -কেউ নেই ঢাকায়; বিরক্তি ছেঁকে ধরেছে রানাকে; ছোট হোক, তাও একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাবার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করছে। এখন পর্যন্ত তেমন কোনও আভাস দেখা যাচ্ছে না।

টেবিলের অপর পাশে ফাইলে মুখ গুঁজে বসে বিসিআই -এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। রানার কাছে ট্রেনিং পাওয়া কয়েকজন নবীন এজেন্টের পারফর্মেন্সে মূল্যায়ন করছে ওরা আলোচনার মাধ্যমে, ফাঁকে ফাঁকে ঘনিষ্ঠ দু'বন্ধুর মধ্যে চলছে জম্পেস আড্ডা। রানার সেক্রেটারি কাকলি সোহেলকেও এক কাপ কফি দিয়ে গেছে, ওটায় চুমুক দিয়েই মুখ বাঁকিয়ে ফেলল চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বলল, 'এটা কী? ম্যালেরিয়ার ওষুধ?'

'আস্তে বল্,' চাপা স্বরে ধমক দিল রানা। 'কাকলি খুব যত্ন করে বানিয়েছে তোর জন্যে, শুনতে পেলে মনে কষ্ট পাবে। তোকে হয়তো আর অতটা ভাল লাগবে না ওর।'

'অ্যাঁ? কী বললি?' গলা চড়াল সোহেল, 'তোকে ভালবাসে বলছিস? কাকলি তোকে ভালবাসে?'

'চুপ, ব্যাটা! মার খাবি বলছি!'

'আয় না, দেখি কে কাকে কয়টা দেয়! আমাকে চুপ করাতে হলে জলদি এক প্যাকেট বেনসন দে- মুখ বন্ধ রাখার ঘুষ।'

‘পরের টাকায় সিগারেট খাওয়ার অভ্যেসটা ছাড়, বুঝলি?’ বলল রানা। ‘নিজে কিনে যত খুশি খা।’

‘যতদিন তুই আছিস, সেটি হবার নয়, দোস্ত। জলদি এখন অন্তত একটা সিগারেট বের কর, সকাল থেকে এক টানও দিতে পারিনি। এক্ষুনি পেট ফেটে মরে যাব। আর মরার আগে কাকলিকে বলে যাব: রানা বলছে, তুমি নাকি ওকে ভালবাস, কিন্তু জান তুমি, ও যে তোমার কফি খেয়ে বলেছে বমি আসছে?’

‘যা বলগে যা। তবে জেনে রাখিস, শালা, তোর কানটা থেকে যাবে আমার হাতে...’

ইন্টারকমটা বেজে ওঠায় বাধা পেল রানা, তাড়াতাড়ি রিসিভার কানে ঠেকাল। ‘ইয়েস, রানা।’

‘আমার চেম্বারে,’ থমথমে ভারী কণ্ঠস্বর, বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান টেলিগ্রাফির ভাষা ব্যবহার করছেন। ‘ইমিডিয়েটলি।’ তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কে ফোন করেছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না সোহেলের। রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বলল, ‘কুইনিন খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলি, তাই না?’

কথাটা রানা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না, সম্পূর্ণ অন্য জগতে যেন চলে গেছে ও। সোহেলকে বসতে বলে সম্মোহিতের মত বেরিয়ে গেল অফিস কামরা থেকে। সবগুলো ইন্দ্রিয় অতিমাত্রায় সজাগ, নতুন অ্যাসাইনমেন্টের আশায় অজানা উত্তেজনায় লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল ও ছয়তলায়। করিডর ধরে হেঁটে এসে শেষ প্রান্তের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা।

ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল বসের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরা। সচরাচরের মত ঠাট্টা-মশকরার মুডে নেই ও, চেম্বারে ঢোকার দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, ‘ঢুকে পড়ো। এখানে সময় নষ্ট কোরো না।’

‘ব্যাপারটা কী, এত জরুরি তলব?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘কোথাও বড় ধরনের কোনও সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে তো শুনিনি।’

‘আমিও জানি না কিছু,’ ইলোরা বলল। ‘ভিতরে জাতীয় জাদুঘরের পরিচালক আর তার মেয়ে আছেন, এটুকুই বলতে পারি। পরশুও এসেছিলেন ওঁরা।’

‘জাদুঘর!’ রানা অবাক হলো। ‘ওদের আবার কি হলো?’

‘গেলেই তো জানতে পারবে। দেরি কোরো না তো, পরে আমি বকা খাব।’

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল রানা, দুরু দুরু বুকে নক করল দরজায়।

‘কাম ইন।’

নব ঘুরিয়ে চিফের চেম্বারে ঢুকে পড়ল রানা, পিছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল কবাটটা।

কামরার চেহারা পরিচিত, কোথাও এতটুকু বদলায়নি। গাঢ় সবুজ কার্পেট ঠিক যেন তাজা ঘাস অথচ তুলোর মত নরম, সেই দূরপ্রান্তের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেয়ালটার সবটুকু ফিরোজা রঙের পর্দায় ঢাকা। একপাশে ঝুলে আছে বহুরঙা পৃথিবী, মেহগনি কাঠের ডেস্কটা ওই মানচিত্রের পাশে। পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন এসপিয়োনাজ জগতের প্রবাদপুরুষ, অতিথি আছে বলেই বোধহয় ধূমপান করছেন না, দৃশ্যটা বরাবরের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে হয়তো সেজন্যেই।

রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছেন দুই অতিথি, পাশে আরেকটা আরেকটা ফাঁকা চেয়ার। সেটা দেখিয়ে চিফ বললেন, ‘বোসো।’

‘এ-ই মাসুদ রানা?’ জানতে চাইলেন বয়স্ক ভদ্রলোক।

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। রানা বসতেই পরিচয় করিয়ে দিলেন, ‘রানা, এ হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু-ডক্টর আমজাদ আহমেদ, বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের পরিচালক।’

‘আসসালামু আলাইকুম,’ বলে হাসল রানা। ‘আপনাকে আমি চিনি। পত্রিকায় ছবি দেখেছি বহুবার।’

‘আমি দেখিনি, কিন্তু তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি,’ হেসে বললেন ড. আমজাদ। ‘বিশেষ করে রাহাত তো তোমার প্রশংসায়...’

জোরে গলা খাঁকারি দিলেন রাহাত খান, যেন প্রশংসার কথাটা প্রকাশ না করলে ভাল হয়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কোনমতে হাসি চাপল রানা। হুঁ, আড়ালে আবডালে তা হলে ওকে নিয়ে প্রশংসাও করে বুড়ো!

জাদুঘরের পরিচালকের পাশে বসে আছে এক তরুণী, বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের মত, চেহারাটা খুব সুন্দর। তাকে দেখিয়ে ড. আমজাদ বললেন, ‘আমার মেয়ে... নাদিয়া আহমেদ।’

রানাকে সালাম দিল নাদিয়া।

প্রত্যুত্তর দিয়ে বসের দিকে ফিরল রানা। ‘ওঁরা কি কোনও সমস্যায় পড়েছেন, স্যার?’

‘ঠিকই ধরেছ,’ চিফ বললেন। ‘সমস্যাই বটে।’

‘কী হয়েছে?’

‘সেটা আমজাদের মুখেই শোনো।’

বৃদ্ধ ডক্টরের দিকে তাকাল রানা।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন ড. আমজাদ। ‘সমস্যাটা আমাদের... মানে জাতীয় জাদুঘরের একটা এক্সপিডিশন নিয়ে। ব্রাজিলের আমাজন রেইন ফরেস্টে জাতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন ইয়াং আর্কিওলজিস্ট... ড. রাজিব আবরার হারানো একটা ইনকা-শহর খুঁজে বের করতে গেছে, আমরা অভিযানটার আংশিক অনুদান দিয়েছি। আজ পাঁচ দিন হলো ওর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।’

‘আমাজনের মত জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়,’ রানা মন্তব্য করল।

‘পুরোটা শোনো আগে,’ থমথমে গলায় বললেন রাহাত খান। তার কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেল রানা। ড. আমজাদকে বলল, ‘প্লিজ, কণ্টিনিউ।’

‘যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি, রানা,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ড. আমজাদ। ‘ওকে কিডন্যাপ করেছে স্থানীয় এক জলদস্যু। তার নাম এল্ পিরানহা। রাজিবের সঙ্গে কিছু আদিবাসী ইন্ডিয়ান গাইড আর কুলি ছিল। ওদের একজন পালিয়ে এসেছে... তার কাছ থেকে পাওয়া গেছে খবরটা।’

একটু খটকা লাগল রানার— আদিবাসী একজন কুলি বা গাইড বাংলাদেশ পর্যন্ত খবরটা পাঠাল কী করে? তবে প্রশ্নটা ও মুখ ফুটে করবার আগেই রাহাত খান বললেন, ‘আমজাদ আমাদের সাহায্য চেয়েছিল, তাই ব্রাজিলে আমাদের এজেন্ট জুলফিকারকে খোঁজ নিতে বলি আমি। স্থানীয় কিছু ইনফর্মারকে কাজে লাগিয়ে জিকো নামে একজন গাইডের পালিয়ে আসার খবর পায় ও, লোকটার কাছ থেকে রাজিবের কী হয়েছে সেটাও জানতে পেরেছে। তারপর রিপোর্ট পাঠিয়েছে ঢাকায়।’

এবার একটা প্রশ্ন না করলেই নয়। আড়চোখে বসকে এক পলক দেখল রানা, তারপর ভয়ে ভয়ে ড. আমজাদের কাছে জানতে চাইল, ‘দলে আর কে কে ছিল?’

‘আর কেউ না, শুধু রাজিব আর ওই ইন্ডিয়ানরা,’ জানালেন ড. আমজাদ। ‘অ্যাডভান্স পার্টি হিসেবে সার্ভে করতে গিয়েছিল ও। শহরের লোকেশনটা খুঁজে বের করার পর মূল টিমটা যাবার কথা। আসলে...এক্সপিডিশনের খরচ কমাতে এ-ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।’

‘কিডন্যাপিঙের পর থেকে কোনও খোঁজ নেই?’

‘না। আর কোনও খবর নেই, রানা। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, রাজিবের জন্য এখন পর্যন্ত মুক্তিপণও চায়নি কিডন্যাপাররা।’

‘কারণটা কী বলে মনে হয় তোমার?’ জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

‘ধারণার কথা বলব, স্যার?’ রানা বলল।

‘বলো।’

‘ইনকাদের হারানো শহর মানেই সোনায় মোড়া গুপ্তধনের কিংবদন্তি। হতে পারে, ওই গুপ্তধনের খোঁজ পাবার জন্য ড. রাজিবকে আটক করা হয়েছে। এখানে মুক্তিপণ চাওয়ার কিছু নেই।’

‘ও গুপ্তধন খুঁজতে যায়নি, মি. রানা,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করল নাদিয়া। ‘গেছে ইনকা আমলের একটা শহর খুঁজে বের করতে, কারণ ওটা পাওয়া গেলে প্রাচীন পেরুভিয়ান সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।ও একজন রিসার্চ-স্কলার, অর্থলোভী গুপ্তধন-শিকারী নয়।’

থতমত খেয়ে গেল রানা, এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া আশা করেনি। মেয়েটা এমন খেপে উঠল কেন, বুঝতে পারছে না। পরমুহূর্তেই অবশ্য ধরতে পারল কারণটা, নিশ্চয়ই নিখোঁজ আর্কিওলজিস্ট আর এই তরুণীর মধ্যে হৃদয়ঘটিত কোনও ব্যাপার-স্যাপার আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা জানা ফেল নিশ্চিতভাবে।

‘কী আশ্চর্য! তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?’ বিব্রত কণ্ঠে বললেন ড. আমজাদ। রানার দিকে ফিরলেন তিনি। ‘কিছু মনে কোরো না, বাবা। রাজিবের কিডন্যাপিঙের খবর শোনার পর থেকেও ঠিক স্বাভাবিক নেই; দুজনের বাগদান হয়ে গেছে কি না, এক্সপিডিশনটা শেষ হলেই ওদের বিয়ে হবার কথা।’

এবার বোঝা যাচ্ছে, আংশিক অনুদানে পরিচালিত একটা এক্সপিডিশন নিয়ে কেন এত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন জাতীয় জাদুঘরের পরিচালক। কেনই বা ছুটে এসেছেন বিসিআই চিফের কাছে।

'আমি কিছু মনে করিনি,' রানা বলল। 'আমার কথাটা বোধহয় বুঝতে পারেননি নাদিয়া। বলতে চাইছি যে, ড. রাজিব যে গুপ্তধনের খোঁজে যাননি, সেটা আমরা জানি; কিন্তু ওই জলদস্যু কি জানে?'

'তোমার সন্দেহ অমূলক নয়,' রাহাত খান বললেন। 'তবে উদ্বিগ্ন হবার মত আরও কিছু বিষয় আছে, সেটা শোনো। ব্রাজিল থেকে জুলফিকার জানিয়েছে, এল্ পিরানহা ওখানকার ভয়ঙ্কর এক জলদস্যু- খুন, ডাকাতি, কিডন্যাপিঙের মাধ্যমে আমাজনে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। টাকা-পয়সাই যদি লোকটার মূল মোটিভ হত, তা হলে কথা ছিল না, কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম, সেই সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া স্বাস্থ্যবান যুবকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে সে, তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এসব যুবকদের জন্য আজ পর্যন্ত কখনও মুক্তিপণ চায়নি লোকটা, চাইবার কথাও নয় -গরীব গ্রামবাসীরা যে মুক্তিপণ দিতে পারবে না, সেটা জানা কথা। কী কারণে যে ওদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে -সেটা একটা রহস্য।'

'স্লেভ-ট্রেডিং, স্যার?' আন্দাজ করল রানা।

'অসম্ভব কিছু নয়,' রাহাত খান মত জানালেন। 'বন্দিদেরকে হয়তো টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যবান যুবক ছাড়া আর কাউকে যেহেতু অপহরণ করা হচ্ছে না, তখন অমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।'

'কী বলছেন আপনারা, আঙ্কেল! বিস্ময় প্রকাশ করল নাদিয়া। ' আমরা কি সেই মধ্যযুগে বাস করছি নাকি? ক্রীতদাস বেচাকেনার দিনকাল তো কবেই শেষ হয়ে গেছে!'

‘দুনিয়ায় এখনও কত ধরনের বর্বরতা যে চালু আছে, সেটা কল্পনাও করতে পারবে না তুমি, মা,’ নরম গলায় জবাব দিলেন রাহাত খান।

‘কিন্তু এর সঙ্গে রাজিবের সম্পর্ক কী, রাহাত?’ অধৈর্য গলায় প্রশ্ন করলেন ড. আমজাদ। ‘ও একজন আধুনিক, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষ; জংলি আদিবাসী নয়। একথা বোলো না যে, শরীর-স্বাস্থ্য দেখে ওকেও ক্রীতদাস বানাতে চাইছে জলদস্যুটা।’

কী চাইছে সেটা সে-ই বলতে পারবে,’ বিসিআই চিফ মাথা নাড়লেন। ‘তবে রানার সন্দেহটার পাশাপাশি আরেকটা সম্ভাবনা যোগ হয়েছে। আমার এজেন্টরা জানিয়েছে- আমাজনের ওই বিশেষ এলাকাটায়... মানে জুরুয়া শাখা-নদীর উজানে গেলেই সব ধরনের বোট আক্রান্ত হচ্ছে। কাউকে ওদিকে যেতেই দিচ্ছে না পিরানহা। তা ছাড়া, আমি আরও খবর পেয়েছি যে, রাজিব এক্সপিডিশনে যাবার আগে থেকেই নাকি অচেনা একটা পক্ষ খুব ধরপাকড় করছিল সরকারি মহলে, ওকে বা অন্য কাউকে যেন জুরুয়ার উজানে কোনও অভিযানে যাবার অনুমতি দেয়া না হয়...’

‘ঠিক,’ ড. আমজাদ বললেন। ‘সত্যিই খুব বাধা দেয়া হচ্ছিল এক্সপিডিশনটার ব্যাপারে, তবে আমরা সরকারিভাবে অনুরোধ করায় শেষ পর্যন্ত ব্রাজিল সরকার অনুমতি দিতে রাজি হয়। কিন্তু এসব তো বেশ কয়েক মাস আগের কথা, আমিও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। রাজিবের উধাও হবার সঙ্গে ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে তোমার?’

‘হ্যাঁ, আমার সেইরকমই মনে হচ্ছে। সরকারিভাবে বাধা দিতে না পেরেই হয়তো কিডন্যাপ করা হয়েছে ওকে।’

‘কিন্তু কেন?’ হতভম্ব গলায় বলল নাদিয়া। ‘রাজিবের এক্সপিডিশনটা তো জঙ্গলের ভিতরে... সভ্যতা-বিবর্জিত একটা এলাকায়। ওখানে কী এমন থাকতে পারে যে, কাউকে যেতে দেয়া হবে না?’

'ব্রাজিল সরকার কী বলছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিডন্যাপিঙের খবরটা পাবার পরই যোগাযোগ করেছিলাম আমরা,' বললেন ড. আমজাদ। 'ওরা আশ্বাস দিয়ে বলেছে যে, ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবে। তবে বলার ভঙ্গিটা তেমন সুবিধের বলে মনে হয়নি আমাদের, নিখোঁজ একজন বাংলাদেশি নাগরিক ওদের চোখে খুব বড় কোনও প্রায়োরিটি নয়, আমেরিকান বা ব্রিটিশ হলে না হয় কথা ছিল- একথা হাবভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। সেজন্যই রহাতের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'ব্রাজিল সরকার কদ্দুর কী করতে পারবে, সে-ব্যাপারেও সন্দেহ আছে,' গম্ভীর গলায় যোগ করলেন রাহাত খান। 'ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলছে— আমাজনের ওই এলাকাটা একেবারেই দুর্গম, আইনের শাসন বলতে কিছুই নেই ওখানে, রীতিমত মগের মুল্লুক বলা চলে। পিরানহার ব্যাপারে বহু আগে থেকেই অসংখ্য অভিযোগ জমা হয়ে আছে কর্তৃপক্ষের কাছে, কিন্তু চাইলেও ব্যবস্থা নিতে পারছে না ওরা। জলদস্যুটার রাজত্ব ওটা, ওখান থেকে তাকে ধরে আনা এক কথায় অসম্ভব।'

'আমরা ওদেরকে সাহায্যের অফার দিতে পারি না, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'পিরানহাকে ধরে দিলাম, সঙ্গে ড. রাজিবকেও উদ্ধার করে আনলাম?'

'বিদেশি একজন জলদস্যুকে ধরা বিসিআইয়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না,' রাহাত খান দ্বিমত প্রকাশ করলেন। 'তা ছাড়া এ-ধরনের প্রস্তাব দিলে ব্রাজিলিয়ানরাও অপমানিত বোধ করবে -ওরা কখনোই বিদেশি একটা ইন্টেলিজেন্স সংস্থাকে তাদের দেশে গিয়ে স্থানীয় একজন ক্রিমিনালকে পাকড়াও করতে দেবে না- হোক কুখ্যাত একজন জলদস্যু।'

'নদীর উজানের ব্যাপারটা উল্লেখ করে আমরা ওদের কনভিন্স করার চেষ্টা...'

হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিলেন বিসিআই চিফ। ‘ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। ব্রাজিলে কী ঘটছে না ঘটছে, সেসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের একমাত্র প্রায়োরিটি হচ্ছে ড. রাজিব আবরার। আমাদের দেশের প্রতিভাবান আর্কিওলজিস্ট ও, আমাজনে গেছে দেশের সম্মান বাড়াতে। আমি মনে করি, ওকে উদ্ধার করে, আনাটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কাজটা কীভাবে করা যায়, সে-ব্যাপারে তোমার কোনও আইডিয়া থাকলে বলতে পারো, রানা।’

একটু ভাবল রানা। তারপর বলল, ‘দু’ভাবে হতে পারে, স্যার। প্রথমত, ড. রাজিবের জন্য মুক্তিপণ দিতে পারি আমরা, টাকার বিনিময়ে ওকে ছাড়িয়ে আনতে পারি। তবে এতে সফল হবার সম্ভাবনা কম। পিরানহা যদি গুপ্তধনের লোভে ড. রাজিবকে আটক করে থাকে, টা হলে আমাদের মুক্তিপণের ব্যাপারে কোনও আগ্রহই দেখাবে না সে।’

‘আমি একমত,’ বললেন ড. আমজাদ। ‘তা ছাড়া একটা ক্রিমিনালকে টাকা দেয়ারও পক্ষপাতী নই আমি।’

‘সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পথটাই বাকি থাকে— লড়াই করে পিরানহার হাত থেকে ড. রাজিবকে ছিনিয়ে আনতে হবে।’

‘আমিও সেটাই ভাবছিলাম,’ বিসিআই চিফ স্বীকার করলেন। ‘পিরানহার মত জলদস্যুরা অস্ত্রের ভাষা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। ওদের শায়েস্তা করেই ছেলেটাকে উদ্ধার করতে হবে।’

‘কিন্তু আঙ্কেল,’ নাদিয়া বলল, ‘আপনিই তো বললেন, ব্রাজিল সরকার এ-ধরনের কাজের অনুমতি দেবে না।’

‘সব কাজ অনুমতি নিয়ে হয় না, মা,’ একটু হাসলেন রাহাত খান, তাকালেন রানার দিকে। ‘ব্যাপারটায় সরকারি কোনও গন্ধ থাকা চলবে না। তাই কাজটা বিসিআই নয়, রানা এজেন্সি করবে। তোমাদেরকে ভাড়া করবে

জাতীয় জাদুঘর -পিরানহাকে ধরা বা রাজিবকে উদ্ধারের জন্য নয়, দ্বিতীয় একটা এক্সপিডিশন-টিমের প্রোটেকশনের জন্যে। দলটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে যদি পিরানহার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, একটা লড়াই বাধে -তা হলে কারও কিছু বলার থাকবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো রানা।

এবার বন্ধুর দিকে তাকালেন বিসিআই চিফ। 'তুমি কী বলো, আমজাদ? রানা এজেন্সিকে ভাড়া করতে অসুবিধে নেই তো?'

'নেই,' ড. আমজাদ বললেন। 'এক্সপিডিশনের বাজেট থেকেই ওদের ফি দেয়া যাবে।'

'আমাজনে দ্বিতীয় একটা টিম পাঠাবার পারমিশন জোগাড় করতে পারবে?'

'পারমিশন নেয়াই আছে। ইন ফ্যাক্ট, রাজিবকে সাহায্য করবার জন্যে দু'দিন আগেই নাদিয়ার যাবার কথা। সব প্রিপারেশন নেয়াই ছিল, কিন্তু এর মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায়...'

'নাদিয়ার যাবার কথা মানে!' রানা একটু অবাক হলো।

'ওহহো, তোমাকে তো বলাই হয়নি- আমার মেয়েও আর্কিয়োলজিস্ট,' ড. আমজাদ বললেন। ' রাজিবের তদারকিতেই পিএইচডি করছে ও।'

'গুড, তা হলে দ্বিতীয় টিমের কাভারটাই ব্যবহার করবে রানা— এক্সট্র্যাকশন টিম নিয়ে আমাজনে যাবার জন্যে,' রাহাত খান সিদ্ধান্ত জানালেন।

'নাদিয়ার জায়গায় কাকে নিয়ে যাব, সার?' জানতে চাইল রানা, 'রূপা বা সোহানা?'

'অন্য কেউ যাবে কেন?' বিস্মিত গলায় বলল নাদিয়া। 'আমিই যাব।'

'তা কী করে হয়?' রানা প্রতিবাদ করল। 'সোজা কথায়, যুদ্ধ করতে যাচ্ছি আমরা, এটা প্রফেশনালদের কাজ। সেখানে আপনি গেলে পদে পদে বাধা-

বিপত্তি ও ঝামেলা হবে। বলা যায় না, আপনি হয়তো আমাদের সবার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবেন নিজের অজান্তে।'

'রানা ঠিকই বলছে মা,' বললেন রাহাত খান। 'তুমি গেলে পদে পদে অসুবিধেয় পড়বে ওর গ্রুপ।'

'আমি কাউকে অসুবিধেয় ফেলব না আঙ্কেল,' বলল নাদিয়া। বরং যতভাবে পারি, সাহায্য করব ওঁদের।'

'কীসের সাহায্য? আপনি যেতে চাইছেন ভাবাবেগের বশে। সারাক্ষণ আপনার দিকে একটা চোখ রাখতে হবে আমাদের...'

'আই ক্যান টেক কেয়ার অভ মাইসেলফ,' থমথমে গলায় বলল নাদিয়া।

'দুইএকটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে সেটা!' হাসিমুখে বলল রানা।

'গুলশান শুটিং ক্লাবের মেম্বার আমি— কয়েক ধরনের স্মল আর্মস্ চালাতে জানি, হাতের টিপও মন্দ নয়।'

'সত্যিকারের কমব্যাটে ওই অভিজ্ঞতা কোনও কাজে আসবে না,' কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে বলল রানা। 'দুঃখিত নাদিয়া, আপনাকে সঙ্গে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'প্লিজ, অমত করবেন না, মি. রানা,' এবার যুক্তি ছেড়ে অনুনয় করল নাদিয়া। 'এখানে বসে থেকে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। কথা দিচ্ছি, আপনাদের কাজে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করব না আমি। প্লিজ... আমার দিকটা একটু ভাবুন।'

কথায় না পেরে অসহায়ভাবে বসের দিকে তাকাল রানা। কিন্তু রাহাত খান ওর পক্ষ নিলেন না, শুধু মৃদু গলায় বললেন, 'ও থাকলে কাভারটা অবশ্য নিখুঁত হয়।'

ড. আমজাদ বললেন, 'নিয়ে নাও ওকে, রানা।' মেয়ের আবেগ স্পর্শ করেছে তাঁকে। সেটা চাপা দিয়ে যুক্তি দেখালেন, 'ও থাকলে সুবিধেও হতে

পারে তোমার। রাজিবের এক্সপিডিশনের খুঁটিনাটি ওর চাইতে ভালো আর কেউ জানে না। কোথায় যেতে হবে, কার সঙ্গে কথা বলতে হবে... সব ওর নখদর্পণে।'

এরপর আর প্রতিবাদ চলে না, উপায়ান্তর না দেখে নিমরাজি হলো রানা।

'ঠিক আছে, নাদিয়া। নিতে পারি আপনাকে, কিন্তু টিম লিডার হিসেবে আমি যখন যে নির্দেশ দেব, বিনা তর্কে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে সেটা। রাজি আছেন?'

হাসি ফুটল নাদিয়ার ঠোঁটে। 'নিশ্চয়ই। আর প্লিজ... আমাকে তুমি করে বলবেন, আমি আপনার ছোট বোনের মত।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'টিম রেডি করে ফেলো যত দ্রুত সম্ভব,' নির্দেশ দিলেন রাহাত খান।

'জুলফিকার অনেকদিন থেকে ব্রাজিলে আছে আমাদের রেসিডেন্ট এজেন্ট হিসেবে-ওকে দলে রেখো। ঢাকা থেকে তোমার পছন্দসই আরও দুজন নিয়ে নাও। চার জনে পারবে, নাকি আরও লোক চাও?'

'আর দরকার নেই, সার,' রানা মাথা নাড়ল। 'লোক বেশি দেখলে বরং ব্রাজিলিয়ান অথরিটি সন্দেহ করে বসতে পারে।'

'ঠিক আছে, আগামীকালের ভিতরেই রওনা হয়ে যাও তা হলে,' রাহাত খান বললেন। 'বেস্ট অভ লাক, এমআরনাইন। নাদিয়া... তোমার জন্যেও।'

পাঁচ

প্রেসিডেন্ট জুসেলিনো কুবিটশেক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ব্রাসিলিয়া, ব্রাজিল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দুই নম্বর রানওয়েতে ল্যান্ড করল পর্তুগাল এয়ারলাইন্সের একটা এয়ারবাস— কানেক্টিং ফ্লাইট এটা, এসেছে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ফ্রান্সের মার্সেই হয়ে। ট্যাক্সিইং করে ধীরে ধীরে টার্মিনাল ভবনের পাশে এসে দাঁড়াল ওটা, এবার বিল্ডিঙের শরীর থেকে একটা ক্রোকোডাইল ডিসএম্বারকেশন টিউব প্রসারিত হয়ে এসে ঠেকল বিমানের ফ্রন্ট একজিটের গায়ে।

একটু পরেই খুলে দেয়া হলো দরজা, পিল পিল করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল যাত্রীরা- লম্বা জার্নির ক্লান্তি সবার চোখেমুখে, চলাফেরায় তাড়াহুড়ো দেখে বোঝা যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি যার যার গন্তব্যে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চায়। যাত্রীর ভিড়ে রয়েছে চারজন বাংলাদেশি নাগরিক— সবার সামনে মাসুদ রানা, ওকে অনুসরণ করছে নাদিয়া আহমেদ আর রানা এজেন্সির দুই অপারেটর, তৌহিদ হোসেন আর অপূর্ব চৌধুরী। বাংলাদেশ থেকে ব্রাজিল সরাসরি কোনও ফ্লাইট নেই বলে থাই এয়ারওয়েজের একটা ফ্লাইটে ঢাকা থেকে মার্সেই পৌঁছায় ওরা, সেখান থেকে উঠেছে পর্তুগালের এই বিমানে।

কাস্টমস্ এবং ইমিগ্রেশনের ফর্মালিটি শেষ হতে বেশি সময় লাগল না, নিজেদের লাগেজ নিয়ে মিনিট পনেরো পরেই লাউঞ্জে বেরিয়ে এল ওরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উদয় হলো রানা এজেন্সির রেসিডেন্ট অপারেটর জুলফিকার আলম, ওদের নিয়ে যেতে এসেছে। প্রথমে কুশল বিনিময় হলো, তৌহিদ আর অপূর্বকে পেয়ে খুশিতে ডগমগ জুলফিকার- ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওরা, এই তিনজনকে নিয়ে দল গড়ার পিছনে সেটাই মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে রানার ভিতরে, পারস্পরিক বোঝাপড়া খুব ভালো ওদের মধ্যে। দলটায় জুলফিকার থাকছে ডেপুটি হিসেবে, অপূর্ব হচ্ছে আর্মস্- অ্যামিউনিশন এক্সপার্ট আর তৌহিদ ওদের পাইলট এবং স্পেয়ার হ্যান্ড।

সুটপরা স্থানীয় এক ভদ্রলোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, তাঁর সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিল জুলফিকার। ভদ্রলোকের নাম আর্মান্দো গার্সিয়া, ব্রাজিল সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন কর্মকর্তা তিনি।

'ওয়েলকাম টু ব্রাজিল,' চমৎকার ইংরেজিতে সবার উদ্দেশে কথাটা বলে নাদিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি- জানেন দলে একমাত্র আর্কিওলজিস্ট সে-ই, 'জার্নিটা কেমন হয়েছে?'

'ভাল,' সংক্ষেপে জবাব দিল নাদিয়া। 'কষ্ট করে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন বলে ধন্যবাদ।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করলেন গার্সিয়া। 'ঠিক অভ্যর্থনা জানাতে নয়, আমি এসেছি আপনাদের সতর্ক করে দিতে।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল নাদিয়া।

'আপনাদের অভিযানের এলাকাটা অত্যন্ত রিস্কি। কয়েকদিন আগেই তো অ্যাডভান্স টিমের ওই আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোক কিডন্যাপ হয়ে গেলেন। এরপরও ওখানে আপনাদের যাওয়া বোধহয় উচিত হচ্ছে না।'

'বারণ করছেন?'

'ঠিক তা নয়। মানা করবার অধিকার তো আমার নেই, বিশেষ করে যেহেতু আগেই সরকারিভাবে অভিযানটার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে বলা হয়েছে আপনাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু সতর্ক করে দিতে; এমনিতেই একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ উধাও হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছি আমরা, তার উপর যদি এখন আপনারাও...'

'দেখতেই পাচ্ছেন, নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েই এসেছি আমরা,' বাধা দিয়ে বলে উঠল নাদিয়া।

'হ্যাঁ, রানা এজেন্সি,' মাথা ঝাঁকালেন গার্সিয়া। 'ওঁদের দক্ষতা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। বিশেষ করে মি. রানা নিজেই যখন এসেছেন,

বুঝতে পারছি -বিপদ মোকাবেলার যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে আপনাদের। তারপরেও... জুরুয়া এবং সলিমোস শাখানদীর আশপাশটা বিপজ্জনক এলাকা। আমরা চেয়েছিলাম এক্সপিডিশনের অনুমতিটা বাতিল করে দিতে, কিন্তু কূটনৈতিক কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আপনারা যদি অভিযানটা নিজ থেকেই আপাতত মুলতবি করেন, তা হলে খুব খুশি হবে আমাদের...'

'সামান্য একজন জলদস্যুর কারণে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান বন্ধ করার অনুরোধ করাটা উচিত হচ্ছে না আপনাদের,' মুখ খুলল রানা। 'লস ডেল রিয়ো খুঁজে পাওয়া গেলে আপনাদের দেশেরই তো সবচেয়ে বেশি লাভ।'

'তা জানি,' বললেন গার্সিয়া। 'কিন্তু আপনাদের কিছু একটা হয়ে গেলে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে আমাদের?'

'খামোখা ভয় পাচ্ছেন, একজন জলদস্যুকে কীভাবে ট্যাকেল করতে হয়, তা আমরা খুব ভালভাবে জানি।'

'আমরা... আসলে... আমাজন এলাকায় কোনও ধরনের ইনসিডেন্ট চাইছি না।'

'ডোন্ট ওয়ারি,' রানা বলল। 'এল পিরানহা আমাদের ঘাঁটাতে না এলে আমরাও তাঁকে ঘাঁটাব না।'

কথায় পেরে না উঠে কাঁধ ঝাঁকালেন গার্সিয়া। 'আপনাদের যা মর্জি। আমার দায়িত্ব আমি পালন করলাম, এরপর কিছু ঘটলে কাউকে আর দুষতে যাবেন না।'

'কেন, দোষ দেবার মত কিছু ঘটতে যাচ্ছে নাকি?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল রানা।

থমকে গেলেন গার্সিয়া। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বি কেয়ারফুল, মি. রানা। আমাজনের জঙ্গলকে হালকা চোখে দেখবেন না, আফ্রিকার চেয়েও ভয়ঙ্কর ওটা, মানুষকে গিলে খেতে জানে।'

ওদেরকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলেন না ভদ্রলোক, উল্টো ঘুরে হন হন করে হেঁটে চলে গেলেন।

'ব্যাটার হাবভাব কিন্তু ভালো ঠেকল না আমার কাছে,' বলল অপূর্ব। 'মনে হলো যেন হুমকি দিয়ে গেল, মাসুদ ভাই!'

'হুঁ, কথাবার্তা অন্যরকম তো বটেই,' রানা স্বীকার করল।

নাদিয়া বলল, এক্সপিডিশন শুরু হবার আগেই যারা রাজিবকে আমাজনে যেতে বাধা দিচ্ছিল, তাদের কেউ নয় তো?'

'হলে অবাক হব না,' রানা বলল, তারপর তাকাল জুলফিকারের দিকে। 'কী জানো এই গার্সিয়া সম্পর্কে? সত্যিই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের লোক?'

'হ্যাঁ, তাতে সন্দেহ নেই,' জুলফিকার বলল। 'তবে এখানকার বেশিরভাগ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীই দুর্নীতিপরায়ণ। কারও কাছ থেকে টাকা খেয়ে থাকতে পারে গার্সিয়া, ওই লোকের হয়েই হয়তো মেসেজ দিতে এসেছে।'

'হুম, তারমানে সাবধান থাকতে হবে আমাদের,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

প্রসঙ্গ পাল্টে তৌহিদ জানতে চাইল, 'মন্টে অ্যালেগ্রায় কখন যাচ্ছি আমরা?'

সলিমোসের পাশে ছোট্ট একটা শহর মন্টে অ্যালেগ্রা— রাজিব আবরারের স্টেজিং এরিয়া। ওখান থেকেই ওরাও অভিযান শুরু করবে বলে ঠিক করা হয়েছে। জুলফিকার বলল, 'কাল ভোরে রওনা হব। একটা ছোট প্লেন চার্টার করে রেখেছি। আজ রাতটা হোটেলে কাটাতে হবে আপনাদের, মাসুদ ভাই।'

'তাতে অসুবিধে নেই,' রানা বলল। 'অস্ত্র-শস্ত্র সব জোগাড় হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' জুলফিকার মাথা ঝাঁকাল। 'ফ্যাক্সে পাঠানো আপনার লিস্টটা হাতে পেয়েই কাজে নেমে পড়েছিলাম। রিঅ্যাকশন টাইম খুব একটা পাইনি বলে একটু ঝামেলা পোহাতে হয়েছে, তবে মোটামুটি সবই জোগাড় করেছি। মিস রহমানের কাভার মেইনটেনের জন্য আর্কিওলজিক্যাল ইকুইপমেন্টও নিয়েছি।'

‘প্লিজ, আমাকে শুধু নাদিয়া বলে ডাকলে খুশি হব,’ বলে উঠল তরুণী আর্কিওলজিস্ট।

‘ঠিক আছে।’

‘অ্যামিউনিশন কী পরিমাণ নিয়েছ?’ রানা জিজ্ঞেস করল।

হাসল জুলফিকার। ‘যত খুশি খরচ করা যাবে, সহজে টান পড়বে না। ছোটখাটো একটা আর্মির স্টক থাকছে আমাদের সঙ্গে।’

‘দ্যাটস্ গুড,’ রানাও হাসল। ‘চল তাহলে যাওয়া যাক।’

লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

পরদিন।

প্লেনের জানালা দিয়ে নীচের অবারিত প্রকৃতির দিকে তাকাচ্ছে অভিযাত্রীরা। দশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে বনভূমিকে মনে হচ্ছে দিগন্তবিস্তৃত এক বিশাল সবুজ গালিচার মত। একেবারে নিখুঁত নয় গালিচাটা— এখানে-সেখানে মুখ ব্যাদান করে রয়েছে জলাশয়; কোথাও কোথাও গাছপালা অদৃশ্য— ওখানে বন সাফ করে স্থানীয় লোকজন চাষাবাদের জমি তৈরি করেছে। একটু পরেই চোখে পড়ল বিখ্যাত আমাজন নদী, সবুজের বুক চিরে বিশাল এক অ্যানাকোন্ডা সাপের মত যেন চলে গেসে ওটা; শরীরের এখান-সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য শাখা নদীও দেখা গেল— সরু, চওড়া সব রকমই আছে। দু’চোখ ভরে দৃশ্যটা দেখছে বিমানের পাঁচ আরোহী।

মাঝারি আকারের একটা ডি-হ্যাভিল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট বিমান নিয়ে ভোর ছ’টায় ব্রাসিলিয়া থেকে রওনা হয়েছে ওরা। পাইলটের সিটে রয়েছে তৌহিদ, পাশে রানা। পিছনে প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টে রয়েছে বাকিরা। কার্গো হোল্ডে মাত্র দুটো কাঠের ক্রেট রাখা হয়েছে -ওগুলোতে রয়েছে সমস্ত ইকুইপমেন্ট এবং অস্ত্রশস্ত্র।

সাড়ে তিন ঘণ্টার ফ্লাইট শেষ ঠিক সকাল ন'টা ত্রিশে উত্তারঞ্চলের নির্দিষ্ট একটা এয়ারপোর্টে পৌঁছুল ওরা। অফিশিয়াল ফর্মালিটি শেষ করে ওখান থেকে বেরিয়ে এল দলটা। এয়ারপোর্টের পাশেই একটা ছোট রেন্টাল এজেন্সি আছে, ওখান থেকে একটা পিকআপ ভাড়া করল ওরা। গাড়ির চাবি বুঝে নিয়ে কাঠের ক্রেটদুটো পিকআপের পিছনে লোড করে ফেলল ওরা, তারপর রওনা হয়ে গেল গন্তব্যের উদ্দেশে।

এয়ারপোর্ট থেকে মন্টে অ্যালেগ্রার দূরত্ব চল্লিশ কিলোমিটার, নদীর ধারের একটা কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে হয় ওখানে। পিকআপটার ড্রাইভিঙের দায়িত্ব নিয়েছে জুলফিকার, সাবধানে চালাতে থাকল— রাস্তাটার অবস্থা বেশি ভাল নয়। ড্রাইভিং ক্যাবে যাত্রী হিসেবে শুধু নাদিয়া বসেছে; রানা, তৌহিদ আর অপূর্ব উঠেছে পিছনে। সতর্কতার সঙ্গে ড্রাইভ করলেও ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে পিকআপটা, পিছনের আরোহীদের অবস্থা করুণ হয়ে উঠল। এই রাস্তায় যেসব গাড়ি চলাচল করে, সেগুলোর শক অ্যাবযর্বার বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে কি না, সেটা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল রানার মনে।

অবশ্য ঝাঁকুনির যন্ত্রণাটা বেশিক্ষণ সইতে হলো না ওদের। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেল পিকআপটা।

নামেই শহর, মন্টে অ্যালেগ্রা আসলে স্রেফ একটা গ্রাম -আমাজনের তীরে এ-ধরনের কমপক্ষে কয়েকশ' সেটেলমেন্টের দেখা মিলবে। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং টেলিফোনে কথা বলার সুবিধা রয়েছে, এ-অঞ্চলে এটাই সম্ভবত বিশাল কোনও অগ্রগতির প্রতীক, তাই গ্রামের বদলে মন্টে অ্যালেগ্রাকে শহর বলে স্থানীয় লোকজন। ব্যাপারটা জানা ছিল না অভিযাত্রীদের, হতাশ হলো ওরা। প্রত্যন্ত এলাকার জনপদ হিসেবে অবস্থা একটু খারাপ হবে ভেবেছিল, কিন্তু টিন এবং কাঠ দিয়ে তৈরি অল্প কিছু ঘর

আর দোকানপাট, সেইসঙ্গে ভাঙাচোরা একটা ডকের সমন্বয়ে গড়া একটা জায়গাকে শহর বলা হবে— এতটা আশা করেনি।

টাউন স্কোয়্যারের একপাশে পিকআপটাকে পার্ক করল জুলফিকার। চত্বরটা দেখলে সবই দেখা হয়ে যায়। শহর থেকে সামান্য দূরে ডক, ওখানে কয়েকটা বার্জে বিভিন্ন রকম মালামাল লোড করার কাজ চলছে; জায়গাটার কোলাহল বাদ দিলে পুরো মন্টে অ্যালেগ্রাই যেন জনবিহীন এক মরুভূমি— লোকজন আছে কি নেই, বোঝাই যাচ্ছে না। দোকানপাটের সংখ্যা অল্প, সেগুলোর ঝাঁপ খোলা, ভিতরে বিক্রেতাও আছে, কিন্তু একটার সামনেও খদ্দের নেই। রাস্তায়ও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

পিকআপ থেকে নেমে পড়েছে সবাই। চারিদিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে অপূর্ব বলে উঠল, 'কোথায় এসে পড়লাম ড়ে, বাবা!'

'জায়গা বটে একটা!' তৌহিদ বলল।

চারপাশে নজর বোলাল রানা, তারপর তাকাল নাদিয়ার দিকে। প্রচণ্ড গরমে দর দর করে ঘামছে মেয়েটা, বার বার রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে, চেহারায় ইতিমধ্যেই ক্লান্তির ছাপ পড়তে শুরু করেছে।

'এখান থেকেই রাজিবের ব্যাপারে খবর পাঠানো হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল নাদিয়া। 'পিরানহাকে ফাঁকি দিয়ে গাইড লোকটা এখানেই ফিরে এসেছিল।'

'নাম কী লোকটার?'

'জিকো... আমি যদ্দূর জানি।'

'ওকে খুঁজে বের করতে হয় তা হলে...' কথা শেষ হলো না রানার, মুখের মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর দিয়ে কিছু একটা সাঁই করে ছুটে যাওয়ায় থমকে গেল। মাথা

ঘোরাতেই পিছনের একটা গাছের গায়ে বিঁধে যাওয়া তীরটা দেখতে পেল ও, লেজটা এখনও তিরতির করে কাঁপছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গেছে সবাই। কোনমতে বিস্ময়টা চাপা দিয়ে অপূর্ব বলল, 'শিট! কে ছুঁড়ল ওটা?'

যেদিক থেকে তীরটা এসেছে, সেদিকে তাকাল ওরা, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। দোকানদাররাও এমন ভাব করছে যেন দেখতেই পায়নি কিছু।

'ব্যাটাদের ধরে প্যাঁদানি দেব নাকি, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল তৌহিদ। 'বাপ বাপ করে বলে দেবে— এখানে তীর-ধনুক প্র্যাকটিস করছে কে।'

'দরকার নেই,' রানা মাথা নাড়ল। 'আসল লোক এতক্ষণে পগার পার হয়ে গেছে। এদের সঙ্গে ঝামেলা করে লাভ হবে না।' নাদিয়ার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখল রানা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। 'ভয় পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল নাদিয়া। 'বুক কাঁপছে। তীরটা মিস না হলে আমাদের কেউ নিশ্চয়ই খুন হয়ে যেত!'

'ব্যাপারটা অত সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে না,' রানা বলল। 'পাঁচজন জটলা করে দাঁড়িয়ে আছি, তারপরও লাগাতে পারল না, এখানকার লোকজনের হাতের টিপ এত খারাপ হবার কথা নয়।'

'তা হলে ছুঁড়ল কেন?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল নাদিয়া।

জবাব না দিয়ে গাছটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, বাকিরাও পিছু নিল। টান দিয়ে তীরটা খুলে আনল ও, ভাল করে দেখল।

'কোমাঞ্চিদের তীরের মত মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল নাদিয়া।

'সমস্যা একটাই— ওরা এখান থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে... আরেক মহাদেশে বসবাস করে,' রানা বলল। তীরটার গায়ে পেঁচানো এক টুকরো

কাগজ রয়েছে দেখে সাবধানে খুলে আনল ওটা। চিরকুটটায় ইংরেজিতে লেখা দুটো মাত্র শব্দ দেখা গেল।

"গো ব্যাক!" ফিরে যাও!

'ইন্টারেস্টিং!' মুচকি হাসল রানা। 'কেউ একজন আমাদের উপস্থিতি পছন্দ করছে না, এটা তারই ওয়ার্নিং।'

'ভয় দেখাচ্ছে আমাদের!' বলল নাদিয়া।

'পাঁচ মিনিটও তো হয়নি এখানে পা রেখেছি,' অপূর্ব বলল, 'এখুনি আমাদের তাড়াতে উঠেপড়ে লাগল কেন?'

'ভাল প্রশ্ন,' রানা বলল। 'তবে উত্তরটা জানতে হলে হুমকিটাকে অগ্রাহ্য করতে হবে। নাদিয়া, তোমার আপত্তি আছে?'

নিজেকে সামলে নিয়েছে নাদিয়া, বলল, 'মোটেই না। ভয় দেখালেই হলো? রাজিবকে ছাড়া কিছুতেই ফিরছি না আমি।'

'গুড।'

'কীভাবে এগোতে চান, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল তৌহিদ।

'প্রথমে গাইড লোকটাকে পেতে হবে,' রানা বলল। 'ওর কাছ থেকে জানা যাবে—ঠিক কোন জায়গা থেকে রাজিবকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'পাবেন কোথায় ওকে?'

চত্বরের অন্যপাশে একটা ছোট্ট দোতলা বিল্ডিং, সামনে সাইনবোর্ড ঝোলানোঃ হোটেল অ্যালেগ্রা। সেদিকে আঙুল তুলে রানা বলল, 'ওখানে খোঁজ নেব।' জুলফিকারের দিকে ফিরল ও। 'অপূর্ব আর তৌহিদকে নিয়ে যাচ্ছি আমি, তুমি পিকআপের সঙ্গে থাকো ব্যাকআপের প্রয়োজন হতে পারে, হোটেলটার দিকে চোখ রেখো।'

'আমি?' জানতে চাইল নাদিয়া।

‘তুমিও এখানেই থাকো। বাইরে থেকেই হোটেলটার যা চেহারা দেখছি, তাতে ওটা কোনও ভদ্রমহিলার উপযুক্ত জায়গা বলে মনে হচ্ছে না।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল নাদিয়া।

অপূর্ব আর তৌহিদকে ইশারা করল রানা। ‘চলো যাওয়া যাক।’

ছয়

হোটেলের নীচতলা হচ্ছে স্যালুন -একপাশে বার আছে, মুখোমুখি বাকি জায়গাটাতে তিন সারিতে বসানো হয়েছে মোট বারোটা টেবিল। চত্বরের ঠিক উল্টো পরিস্থিতি দেখা গেল ভিতরে -বেশ কিছু মানুষ রয়েছে এখানে, তাদের কোলাহলে স্যালুনটা মুখর হয়ে আছে। তবে বেশভূষায় একজনকেও ভদ্রলোক বলা চলে না— পোশাক-পরিচ্ছদ নোংরা, শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো দেখে মনে হচ্ছে খোসপাঁচড়া হতে চলেছে এদের। এক দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, রুক্ষ-বুনো প্রকৃতির মানুষ এরা, সভ্যতার সঙ্গে সংশ্রব নেই। ভদ্রলোকেরা যেভাবে সঙ্গে কলম রাখে, সেভাবে এরা রাখে ছোরা, নোংরা গালিগালাজ-ই এদের জন্যে সাধুভাষা। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রয়েছে বেশিরভাগই; যারা হয়নি, তাদেরও হতে বেশি দেরি নেই।

কাঠের দেয়ালগুলোতে ওয়ালপেপারের কোনও অস্তিত্ব নেই, বয়সের ভারে কালচে হয়ে যাওয়া শরীর দেখা যাচ্ছে সবদিকে— এখানে-সেখানে ছুরি দিয়ে নিজের নাম খোদাই করে রেখেছে কারা যেন। জানালাগুলোরও ঝরঝরে দশা, কাঁচ অবশিষ্ট নেই একটারও, চৌকাঠও খুলে পড়বে যে-কোনোও মুহূর্তে, কোনমতে হার্ডবোর্ড ঠুকে একেবারে বন্ধ করে দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। একদিকে পেল্লায় এক হরিণের মাথা ঝুলছে, নীচে প্রাচীন আমলের একটা

পিয়ানো রয়েছে, তবে তলাটা ভেঙে গিয়ে ওটার ভিতরের সমস্ত মালমসলা নীচদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। রুমে সুন্দর জিনিস বলতে রয়েছে একটা অ্যাকুয়োরিয়াম, বারটেন্ডারের পিছনের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ওটা, তাতে সাঁতার কাটছে দুটো ছোট্ট পিরানহা। পুরো দৃশ্যটা পুরনো আমলের ওয়েস্টার্ন মুভির সেটের কথা মনে করিয়ে দিল মাসুদ রানাকে।

যার যার মত ব্যস্ত ছিল স্যালুনের লোকেরা, কিন্তু দরজা ঠেলে রানারা ঢুকতেই চকিতের জন্য নীরব হয়ে গেল সবাই, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল স্যালুনের প্রবেশপথের দিকে। প্রত্যেকের চেহারায় বিরক্তি, নবাগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না কারও দৃষ্টিই।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য মুখে একটু হাসি ফোটাল রানা। অভিবাদনের সুরে বলল। 'গুড মর্নিং!'

ইতিবাচক কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না কারও মধ্যে, নিচু স্বরে দু'একটা গালি ভেসে এল তার পরিবর্তে। কয়েক সেকেন্ড ওভাবেই তাকিয়ে থেকে বোধহয় আগ্রহ হারিয়ে ফেলল লোকগুলো, তারপর আবার সোজা হয়ে যার যার মত ব্যস্ত হয়ে পড়ল সরব আলোচনায়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দুই সঙ্গীকে নিয়ে বারের দিকে এগিয়ে গেল রানা।

শুকনো-পটকা এক মাঝবয়েসী লোক বারটেন্ডারের দায়িত্ব পালন করছে। শরীরটা হাড় জিরজিরে হলেও তার চেহারাসুরত এখানকার বাকি সবাইকে হারিয়ে দেবে। একগালে বড় একটা কাটা দাগ রয়েছে তার, ঠোঁটদুটো বাঁকা হয়ে থাকে সেজন্যে; মাথাটা নিখুঁতভাবে কামানো, এক চোখ কালো পট্টিতে ঢাকা— লোকটা যেন জলদস্যুদের নিয়ে লেখা ক্লাসিক কোনও বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। রানাদের এগিয়ে আসতে দেখে খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই— বিয়ার, নাকি হুইস্কি?'

'কোনটাই না,' বলল রানা। 'আমরা একজন লোককে খুঁজছি।'

‘কাকে?’

‘জিকো, রিভার গাইড।’

ভুরু কোঁচকাল বারটেন্ডার। ‘কী দরকার তাকে?’

‘গাইড খোঁজে কেন মানুষ, জানো না?’ বিরক্ত গলায় বলল রানা। ‘জুরুয়ার ফন্টে বোয়ায় যাব আমরা, সেজন্যেই ওকে দরকার।’

‘ফন্টে বোয়ায় কী কাজ আপনাদের?’ প্রশ্নবাণ শেষ হচ্ছে না বারটেন্ডারের।

‘ওটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না,’ একটু ধমকের সুরে বলল রানা, কাউন্টারের উপরে একটা কড়কড়ে পঞ্চাশ ডলারের নোট ঠেলে দিল। ‘জিকোর খোঁজ দিলে এটা পাবে।’

টাকাটার দিকে ফিরেও তাকাল না লোকটা, শুধু বলল, ‘দাঁড়ান একটু।’ কাউন্টারের অন্যপ্রান্তে চলে গেল সে, ওখানে বসা অপর একজনের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল।

আড়চোখে দ্বিতীয় লোকটাকে দেখল রানা, বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মত হবে, গাঁট্টাগোট্টা শরীর, মাথার লম্বা চুল পিছনে ঝুঁটি করে বাঁধা। তেল চিটচিটে একটা টি-শার্ট আর পুরানো একটা আর্মি প্যান্ট পড়ে আছে; চেহারাটা নিষ্ঠুর— দেখেই বোঝা যায়, লোক সুবিধের নয়। মনোযোগ দিয়ে বারটেন্ডারের কথা শুনল সে, আড়চোখে একবার নবাগতদের দিকেও তাকাল। শেষে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, গটমট করে হেঁটে চলে গেল দরজার দিকে। মনে হচ্ছিল বেরিয়ে যাবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে থেমে গেল সে; রানাকে অবাক করে দিয়ে টান দিয়ে দরজার পাল্লাদুটো বন্ধ করে দিল। এমনকি পকেট থেকে তার হাতে একটা চাবিও বেরিয়ে আসতে দেখল রানা -ওটা দিয়ে ভিতর থেকে দরজায় তালাও মেরে দিল। তারপর বারের দিকে ফিরল লোকটা, উদ্ধত ভঙ্গিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, চেহারায় হিংস্রতা ফুটে উঠেছে।

বিপদটার প্রকৃতি বুঝতে একটুও সময় লাগল না তিন বিসিআই এজেন্টের -ফাঁদে পড়েছে ওরা। কমপক্ষে পনেরো জন লোক রয়েছে স্যালুনে, এদের মধ্যে কোনও মিত্র আছে বলে মনে হচ্ছে না। পালানোরও উপায় নেই।

ফিসফিস করে তৌহিদ পিছন থেকে বলল, 'এরা আমাদের যেতে দিতে চাইছে না, মাসুদ ভাই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ঝুঁটিঅলাকে অগ্রাহ্য করে তাকাল বারটেন্ডারের দিকে। শান্ত ভঙ্গিতে কৌতুকের সুরে বলল, 'তোমাদের দেখছি হোটেল চালানোর উপর ট্রেনিং দিতে হবে। কাস্টোমারদের ধরতে হয় ভাল সার্ভিস আর মধুর ব্যবহার দিয়ে, দরজা আটকে নয়।'

'চিন্তা কোরো না, ভালমতই সার্ভিস দেয়া হবে তোমাদের,' মুঠি পাকিয়ে বলল ঝুঁটিঅলা। 'এমন সার্ভিস পাবে যে, মন্টে অ্যালেগ্রা ছেড়ে আর কোথাও যাবার উপায় থাকবে না তোমাদের।'

'তা-ই নাকি? আমরা যদি সার্ভিস না চাই?'

'তা হলে ভালয় ভালয় কেটে পড়ো এখান থেকে। একটাই সুযোগ দিচ্ছি, সেটার সদ্ব্যব্যবহার না করলে পড়ে পস্তাবে।'

'যেতে তো আমরাও চাইছি, সমস্যা হলো -জিকোকে ছাড়া ফন্টে বোয়ায় পৌছুনো সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।'

'ওর কথা ভুলে যাও। ধরে নাও, জংলিটা মারা গেছে। আমার কথা না শুনলে তোমাদেরও একই পরিণতি হবে।'

'সত্যিই মারা গেছে?' আগ্রহ দেখানোর ভান করল অপূর্ব। ঝুঁটিঅলার চোখে আগুন জ্বলে উঠেছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'না, মানে... কাল্পনিকভাবে মরে থাকলে ওই একই পরিণতি ভোগ করতে আপত্তি নেই আমাদের।'

'ব্যাটারা বেশি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছে, মার্কোস,' ঝুঁটিঅলাকে বলল বারটেন্ডার। 'এখনও দাঁড়িয়ে দেখছ কী? ধরে বানানো শুরু করো না!'

‘খবরদার।’ গরম গলায় বলে উঠল তৌহিদ। ‘গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু খারাবি আছে তোমাদের কপালে।’

হেসে উঠল মার্কোস, ডানহাতটা একটু উঁচু করে তুড়ি বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষা খাবার শব্দ হলো, একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল স্যালুনের প্রতিটা লোক, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, অর্ধাবৃত্তাকারে ঘিরে ফেলছে তিন বাঙালি যুবককে। এতক্ষণ সন্দেহ হচ্ছিল, এবার নিশ্চিতভাবে জানা হয়ে গেল -এরা সবাই একই দলের লোক, ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল এখানে।

‘ভেবেছ একা এসেছি?’ বিদ্রুপের সুরে বলল মার্কোস। ‘তোমাদের তুলোধুনো করবার মত যথেষ্ট লোক রয়েছে আমার সঙ্গে।’

মাথা গরম করল না রানা, শান্তভাবে যাচাই করল প্রতিপক্ষকে। মোট চোদ্দ জন লোক... সশস্ত্র, তবে আগ্নেয়াস্ত্র নেই কারও কাছে। কয়েকজনের হাতে ছোট লাঠি দেখা যাচ্ছে, তা ছাড়া পোশাকের আড়ালে সবার কাছে ছুরি থাকতে পারে। সঙ্গে পিস্তল আছে তিন বিসিআই এজেন্টের, তবে এক্ষুনি সেগুলো বের করার মানে হয় না। এরা সবাই স্থানীয় গুন্ডা, প্রশিক্ষিত সৈনিক নয়। ওরা তিনজনেই আন-আর্মড় কমব্যাটে অভিজ্ঞ, সংখ্যায় ভারী হলেও বদমাশগুলোকে খালি হাতেই শায়েস্তা করা সম্ভব। তা-ই করবে বলে ঠিক করল রানা, নিচু গলায় বাংলাতে সিদ্ধান্তটা সঙ্গীদের জানিয়ে দিল ও।

একেবারে কাছে এসে গেছে শত্রুরা, খিক্ খিক্ করে হেসে মার্কোস বলল, ‘ফুসুর-ফাসুর করে লাভ নেই কোনও, আজ তোমাদের শরীরের একটা একটা করে হাড্ডি গুঁড়ো করব আমরা।’

স্থির দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল রানা, শেষবারের মত সতর্ক করল, ‘কাজটা ঠিক করছ না। আমরা কোনও ঝামেলা চাই না, শুধু ফন্টে বোয়াতে যাবার জন্য গাইড খুঁজতে এসেছি।’

‘ফন্টে বোয়াতে কোনোদিনই যাওয়া হবে না তোমাদের!’ হিংস্র গলায় বলল মার্কোস।

‘তাই নাকি?’

জবাব না দিয়ে ঘুসি চালাল মার্কোস।

এক ঘুসিতেই রানাকে ঘায়েল করবে বলে আশা করেছিল সে, ভেবেছিল বাঙ্গালিটার নাক ভর্তা করে দেবে। কিন্তু তার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে এরপর যেটা ঘটল, সেটার জন্য ঝুঁটিঅলা গুণ্ডা তৈরি ছিল না।

ঘুসিটাকে কাটিয়ে ফাঁকি দিয়ে লোকটার পাজরে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানল রানা। পাল্টা ঘুসির টাইমিংটা চমৎকার হয়েছে -জায়গামত লেগেছে। এক পাশে একটু সরে গিয়ে একই জায়গার উপর আরেকটা লেফট হুক বসাল ও। তারপর একটু পিছিয়ে এসে প্রতিপক্ষের থুতনি লক্ষ্য করে আপারকাট মারল।

পড়ে গেল মার্কোস। পাঁজরের উপর মার খেয়ে ওর দম ফুরিয়ে গেছে - ঠোঁট কেটে বেরিয়ে এসেছে রক্ত। মেঝেতে সজোরে আছড়ে পড়ে রীতিমত কেঁপে উঠল গুণ্ডা। এর আগে কেউ ওকে মাটিতে ফেলতে পারেনি। জীবনে এত শক্ত মারও সে কখনও খায়নি।

ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে গেছে স্যালুনের বাকি গুণ্ডারা। এই সুযোগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অপূর্ব আর তৌহিদ। একটা মাত্র আঘাতে কীভাবে মানুষকে অচল করে দেয়া যায়, সেটা খুব ভালো করেই জানে ওরা; ফলে দেখা গেল চোখের পলকে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে পাঁচ গুণ্ডা। বাকি আটজন দাঁড়ানো থাকলেও একসঙ্গে পাল্টা আক্রমণ করতে গিয়ে একে অন্যের গায়ে হোঁচট খেল। ইতিমধ্যে ভূ-পাতিত লোকগুলোর হাত থেকে দুটো লাঠি তুলে নিয়েছে দুই বিসিআই এজেন্ট, সেগুলো দিয়ে মাপা মার শুরু করল। শরীরের এখানে-ওখানে চামড়া-ফাটানো তীব্র আঘাতে দিশেহারা হয়ে পড়ল দলটা, যান্ত্রিক

দক্ষতায় ব্যাটন ফাইট করতে থাকা তৌহিদ আর অপূর্বের কাছে ঘেঁষতে পারলো না।

রানা অবশ্য বাকিদের নিয়ে মাথা ঘামাল না, একজন শুধু ওর দিকে ছুটে এসেছিল, মাত্র দুটো জুডো চপে তাকে কুপোকাত করেও আবার নজর দিয়েছে মার্কোসের দিকে। মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে লোকটা, কিন্তু পুরোপুরি সোজা হবার আগেই দুটো ঘুসি পড়ল তার মুখে। প্রথম ঘুসিতে চোখের নীচে চামড়াটা ফেটে গেল -দ্বিতীয়টাতে থেঁতলে গেল ঠোঁট। তাল সামলাতে না পেরে পিছিয়ে গেল লোকটা, চোখে নগ্ন আতঙ্ক ফুটে উঠেছে, বুঝতে পেরেছে -কঠিন লোকের পাল্লায় পড়েছে, এর সঙ্গে পেরে ওঠা তার কম্মো নয়। পালাতে চাইল... কিন্তু তার কোনও উপায় নেই, দরজায় তালা দিয়ে নিজেই উল্টো ফাঁদে পড়ে গেছে সে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে আরেকবার আক্রমণ চালাল মার্কোস, মুঠি পাকিয়ে ছুটে গেল শত্রুর দিকে। সরে গিয়ে আঘাত এড়াতে চাইল রানা, কিন্তু মেঝেতে পড়ে থাকা একজনের গায়ে পা বেধে গিয়ে হোঁচট খেল ও, ঝুঁটিঅলার ডানহাতের একটা ঘুসি ওর কাঁধে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অবশ হয়ে এল জায়গাটা। এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে মার্কোস, মারপিটের কায়দা কিছুই জানা না থাকলেও ওর ওজন আর শক্তি অনেক বেশি। ব্যথাটা দাঁত চেপে সহ্য করে আলতোভাবে একপাশে সরে গেল রানা, বাঁ দিক থেকে লোকটার পাঁজরে পটাপট কয়েকটা ঘুসি মারল, কণ্ঠার উপরও সাবধানে একটা আঘাত করল। খাবি খেতে শুরু করল মার্কোস, শ্বাস নিতে পারছে না, এবার একটা প্রচণ্ড আপার কাট খেয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল। লোকটা পড়ে যাবার আগে চেয়ালের উপর হাঁটু চালাল রানা, দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার ভয়ানক আওয়াজ হলো... জ্ঞান হারিয়ে মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ল লোকটা।

বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজ হলো এসময়, উড়ে গেল স্যালুনের দরজার হাতলটা। পরমুহূর্তেই পাল্লা ঠেলে ভিতরে ঢুকল জুলফিকার, হাতের শটগানটার ব্যারেল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। গুলির শব্দে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সবাই, থমকে যাওয়া মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ও কপট অনুযোগের সুরে বলল, 'আমাকে ফেলে পার্টিটা শুরু করে দেয়া একদম উচিত হয়নি আপনার, মাসুদ ভাই।'

'কী করব, এরা একটুও অপেক্ষা করতে রাজি হলো না,' রানা বলল। 'অবশ্য তাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি আমাদের।'

'তা-ই তো দেখছি,' ভিতরটায় নজর বুলিয়ে বলল জুলফিকার। 'দরজাটা আটকে দিচ্ছে দেখে এগিয়ে এলাম, কিন্তু আপনারা তো দেখছি আমার জন্য কিছুই রাখেননি।'

'আছে তো।' কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গুণ্ডাদের দেখাল রানা। 'এবার এদের সামলাও।'

'হাতে যা যা আছে, সব ফেলে দাও, বাছারা,' আদেশ দিল জুলফিকার। 'তারপর পিছিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ো মেঝেতে। সাবধান, তেড়িবেড়ি করলে কিন্তু বুকে ফুটবল সাইজের একটা করে গর্ত তৈরি হবে!' হুমকির ভঙ্গিতে শটগানটা নাড়াল ও।

ভয়ে ভয়ে আদেশটা পালন করল লোকগুলো, বেঘোরে মরার সখ নেই কারও। কাঠের মেঝেতে ঠক ঠক করে শব্দ হলো, হাতের ছুরি-লাঠি... সব ফেলে দিচ্ছে ওরা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

বারটেন্ডারের দিকে এবার তাকাল রানা, লোকটার মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। আতঙ্কিত ভঙ্গিতে কাউন্টারের পিছনের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

‘খামোকা পঞ্চাশটা ডলার খোয়ালে,’ জিভ দিয়ে চুক চুক করে বলল রানা। ‘এখন তোমার কাছ থেকে কথাও আদায় করব, টাকাও দেব না।’

‘আ...আমাকে মাফ করে দিন, সেনিয়র!’ হাত জোড় করল বারটেন্ডার। ‘আমার ভুল হয়ে গেছে।’

‘ভুলটা করলে কেন, সেটা বলো। আমাদের এখান থেকে তাড়াতে চাইছ কেন?’

‘আ...আমি কিচ্ছু জানি না, সেনিয়র। এগুলো সব মার্কোসের ব্যাপার। আমি লোভে পড়ে গিয়েছিলাম...’

ভুরু কোঁচকাল রানা। ‘তুমি ওর দলের কেউ নও?’

‘না, না!’ সভয়ে মাথা নাড়ল বারটেন্ডার। ‘আমি ব্যবসা করি, গুণ্ডাপাণ্ডার দলে যোগ দিইনি। সত্যি বলতে কী...’ শুয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখাল সে, ‘...এরাও মার্কোসের দলের নয়। সবাইকে ভাড়া করে এনেছে ও।’

‘আমাদের তাড়াবার জন্য?’

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল বারটেন্ডার। ‘তবে কেন তাড়াতে চাইছে, টা জানি না...বলেনি আমাকে। ও যে আসলে কে, তা-ও বলতে পারব না। শুধু এটুকু জানি যে, মাঝে মাঝে নদীর উজান থেকে আসে, অনেক টাকা খরচ করে, নাম মার্কোস... আর কিছু না।’

হাবভাবেমনে হলো, সত্যি কথাই বলছে লোকটা। তাই ঝুঁটিঅলা গুণ্ডার বিষয়টা নিয়ে আর কিছু জানতে চাইল না রানা। বলল, ‘ঠিক আছে, বাদ দাও ওর কথা। জিকোকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা বলো।’

‘ডকে খোঁজ নিয়ে দেখুন, সার,’ বলল বারটেন্ডার। ‘পরশু গোমেজের বার্জে কাজ করতে দেখছি ওকে।’

‘গোমেজ?’

‘হ্যাঁ। ডকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই যে-কেউ দেখিয়ে দেবে বার্জটা।’

আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই রানার। বলল, 'ঠিক আছে। মাফ করা গেল তোমাকে। আপাতত চলে যাচ্ছি আমরা। খবরদার, কেউ যেন পিছু নেবার চেষ্টা না করে। দেখলেই তো, লোক আমরা সুবিধের নই।'

উপুড় হয়ে থাকা গুণ্ডাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে স্যালুন থেকে বেরিয়ে গেল চার বিসিআই এজেন্ট। আস্ত্রগুলো পড়ে থাকল ওখানেই।

সাত

দ্রুত পা চালিয়ে পিকআপে উঠল ওরা চারজন। নাদিয়া এখনও বসে আছে সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে। হোটেলে কি ঘটেছে, সেটা ওকে খুলে বলার জন্য অপেক্ষা করল না ওরা, তাড়াতাড়ি স্টার্ট দিয়ে রওনা হয়ে গেল ডকের উদ্দেশে। বিপদ পুরোপুরি কাটেনি এখনও, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লোকগুলো নতুন করে হামলা চালাতে পারে।

রাস্তাটা কাঁচা, খানা-খন্দে ভরা। জোরে গাড়ি চালানোয় ক্রমাগত ঝাঁকি খেতে থাকল পিকআপটা, আরোহীদের জন্য অবস্থাটা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে পড়ল। কিন্তু সেদিকে কোনও নজর নেই রানার, এ-মুহূর্তে ও-ই ড্রাইভ করছে -হোটেল থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে দ্রুত। স্পিড না কমিয়ে এককেটা মোড় পেরুচ্ছে ও, তাতে কর্কশ শব্দে প্রতিবাদ করে উঠছে চাকাগুলো, পিছনে ধুলোর ঝড় উঠছে।

পথটা আঁকাবাঁকা ও বন্ধুর হলেও দ্রুত ছোটায় দশ মিনিটের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা। সামনে দেখা গেল নদী, একপাশে কাঠের তৈরি একটা পিয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে তিনটে বার্জ -ওগুলোতে মালামাল লোড করা

হচ্ছে। পিকআপ থামাল রানা, সবাইকে নিয়ে, তৌহিদকে রাস্তার উপর নজর রাখতে বলে বাকিদের নিয়ে পিয়ারে চলে এল।

কাছে পৌছুতেই বোঝা গেল, আসলে মাত্র একটা বার্জে মালামাল লোডিং চলছে, বাকিদুটো খালি... কেউ নেই ওগুলোয়। ডকের একপ্রান্তে জিনিসপত্রের স্তূপ -সিমেন্টের বস্তা স্টিলের গার্ডারসহ নানা রকমের সাপ্লাইয়ের কার্টন রয়েছে ওখানে। স্তূপের পাশ থেকে এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোট বারো জন স্থানীয় শ্রমিক, এক হাত থেকে অন্য হাত করে একটার পর একটা জিনিস তুলছে বার্জে। পুরো ফ্রেইটের যা আকৃতি দেখা গেল, তাতে বোঝা যাচ্ছে -আজ সারাটা দিনই খাটতে হবে ওদের। বার্জটার দিকেও তাকাল রানা -একেবারে লক্কড়-ঝক্কড় অবস্থা ওটার, পঞ্চাশ ফুট লম্বা শরীরটাকে চাদরের মত মুড়ে রেখেছে মরিচা। ডেকের উপর পাইলট হাউস ছাড়া আর কিছু নেই।

ওদের ডকে আসতে দেখে মাঝবয়সী এক শ্রমিক এগিয়ে এল -হাবভাবে তাকেই এদের সর্দার বলে মনে হচ্ছে।

‘কী চাই?’ কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

‘গোমেজের বার্জ কোনটা?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

‘এটাই,’ লোড হতে থাকা বার্জটা দেখাল সর্দার। ‘কেন?’

‘জিকো আছে ওখানে?’

‘জিকো!’

‘হ্যাঁ। জিকো... রিভার গাইড।’

‘কী দরকার ওকে?’

‘আমরা ফন্টে বোয়ায় যাব, ওকে ভাড়া করতে চাই।’

‘জিকো তো চলে গেছে,’ বলল সর্দার।

‘কোথায় গেছে?’ ভুরু কোঁচকাল রানা।

‘তা তো বলতে পারি না,’ মাথা নাড়াল শ্রমিক সর্দার। ‘ছোকরা উড়নচণ্ডী স্বভাবের... কখন কোথায় যায়, কেউ বলতে পারে না।’

‘গোমেজ আছে? ও হয়তো বলতে পারবে।’

‘হাহ্!’ অবজ্ঞার ভঙ্গি করল সর্দার। ‘জিকোর মত মানুষের খবর ক্যাপ্টেন রাখতে যাবেন কেন?’

‘এগুলো কীসের জন্য?’ বার্জে লোড হতে থাকা নির্মাণসামগ্রীর দিকে ইঙ্গিত করল অপূর্ব।

‘নদীর বাঁকের ওপারে একটা মিশনারি চার্চ তৈরি হচ্ছে,’ বলল সর্দার। ওটার কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল এগুলো -নিয়মিত ওদের কার্গো পৌঁছে দেন ক্যাপ্টেন।’

‘নদীর বাঁক... মানে জুরুয়ার উজানে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তা হলে তো আমরা এই বার্জতেই যেতে পারি, মাসুদ ভাই,’ বলল অপূর্ব।

‘সেটা সম্ভব নয়, সেনিয়র,’ জবাব দিল সর্দার মাথা নেড়ে। ‘ক্যাপ্টেন গোমেজ কোনও যাত্রী নেন না।’

‘কথা বলেই দেখি!’ রানা বলল। ‘’আছে সে?’

উত্তর দিতে গিয়েও দূর থেকে ভেসে আসা কোলাহল শুনে থমকে গেল শ্রমিকসর্দার। কান পেতে মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠ-আর ইঞ্জিনের ভারি আওয়াজ চিনতে পারল রানা, পরমুহূর্তেই বন্দুকের ফাঁকা গুলির শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল। কী ঘটছে, বুঝতে অসুবিধে হোল না ওর। আবার হামলা চালাতে আসছে শত্রুপক্ষ... এবার ফায়ার আর্মস নিয়ে!

‘শিট!’ গাল দিয়ে উঠল রানা। সময় খুব কম, গুণ্ডারা উদয় হবে যে-কোনোও মুহূর্তে। ও চেঁচাল, ‘অপূর্ব! জুলফিকার! আমাদের ইকুইপমেন্ট!’

পড়িমরি করে পিকআপের দিকে ছুটল তিন বিসিআই এজেন্ট, ইতিমধ্যে হইচই শুনতে পেয়ে তৌহিদ ক্রেটদুটো নামাতে শুরু করেছে, ওরা গিয়ে হাত লাগাল। বাক্সদুটো নিয়ে ডক পর্যন্ত পৌঁছুতে পারল না, তার আগেই মোড় ঘুরে নদীর তীরে পৌঁছে গেল দুটো আদ্দিকালের জিপ। রানাদের দেখতে পেয়েই ব্রেক কষে থামানো হলো বাহনদুটো, টপাটপ সেখান থেকে লাফিয়ে নামল হোটেল অ্যালেগ্রায় রেখে আসা গুণ্ডারা। প্রত্যেকের দুহাতে শোভা পাচ্ছে অন্তত দু'ধরনের অস্ত্র -ছোরা, মাচেটি, ভাঙা বোতল থেকে শুরু করে লাঠিসোটাও আছে। রাইফেল রয়েছে মোট তিনটে, জিপ থেকে নেমেই আগ্নেয়াস্ত্রধারীরা গুলি ছুঁড়ল।

বাক্সদুটো ফেলে দিয়ে মাটিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা ও তার তিন সঙ্গী, মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেটগুলো। দেরি করল না আর রানা, কোমর থেকে পিস্তল বের করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। থতমত খেয়ে গেল লোকগুলো। একটু আগেই রাস্তা পাহারা দেবার জন্য ক্রেট থেকে একটা সাব-মেশিন গান বের করেছিল তৌহিদ, এই সুযোগে ওর কাছ থেকে সেটা নিয়ে নিল রানা।

সংখ্যায় শত্রুরা বেশি, তার উপর আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত। আপাতত পিছু হটা ছাড়া উপায় নেই, আর সেটার জন্য এ-মুহূর্তে নদীটাই একমাত্র পথ। তাই সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'বাক্সদুটো বার্জে তোলো তোমরা... নাদিয়াকে ওঠাও। ততক্ষণ আমি এদের সামলাচ্ছি।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রানা, ওকে দাঁড়াতে দেখে রৈ রৈ করে উঠল দুর্বৃত্তরা, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে আসতে শুরু করল। মেশিনগান থেকে ব্রাশফায়ার করল ও, এখুনি কারও জীবন নেয়ার ইচ্ছে নেই, তাই নিশানাটা রাখল নীচের দিকে, ছুটন্ত লোকগুলোর সামনে। আত্মা চমকানো আওয়াজের সঙ্গে লোকগুলোর সামনে মাটিতে কামড় বসাল বুলেট, ধুলো ওড়াল।

থমকে দাঁড়াল লোকগুলো, লাফালাফি করে সরে যেতে শুরু করল লাইন অভ ফায়ার থেকে। ঝোপের ভিতর লাফিয়ে পড়ল কেউ কেউ, কয়েক জন ছুটল রাস্তার পাশে গাছের আড়াল নিতে, একজন লাফিয়ে পড়ল পানিতে। সাহস দেখাল শুধু একজন। মেশিনগানকে পরোয়া করছে না সে, হাতের রাইফেলটা তাক করছে শত্রুর দিকে। দেরি না করে একটা সিঙ্গেল শট নিল রানা, কাঁধে গুলি খেয়ে পুরো এক পাক ঘুরে গেল লোকটা, হাতের অস্ত্র খসে পড়েছে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার পাশের একটা গর্তে।

গুলিবর্ষণ চালিয়ে গেল রানা, প্রতিপক্ষকে আড়াল থেকে মাথাই বের করতে দিচ্ছে না, যাতে পাল্টা গুলি ছুঁড়তে না পারে কেউ। একই সঙ্গে পিছুও হটছে ও। একটু একটু করে ডক পর্যন্ত পৌঁছে গেল ওরা, জায়গাটা ততক্ষণে শূন্য হয়ে গেছে। গোলাগুলি দেখে মালপত্র ফেলে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে শ্রমিকেরা, পালিয়েছে সাঁতার কেটে।

ক্রেটদুটো বার্জে তুলতে না তুলতে নতুন বিপদ উদয় হলো, মোড় ঘুরে আগের জিপদুটোর পিছনে হাজির হলো একটা তিন-টনী ট্রাক, সোজা ছুটে আসছে ডকের দিকে। ট্রাকের পিছনে কোনও আচ্ছাদন নেই, ফলে ওখানে অস্ত্র বাগিয়ে পজিশন নিয়ে থাকা নতুন দলটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। লোকগুলোর সাজ-পোশাক দেখে শঙ্কিত বোধ করল ও -প্রথম দলটার মত আনাড়ি নয় এরা, হাত ও কাঁধে ঝোলানো অস্ত্রগুলোও অনেক আধুনিক, ধরেছেও অভিজ্ঞ সৈনিকের মত। ডকের দিকে অস্ত্রগুলোর মুখ ঘুরে যেতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল ও।

'টেক কাভার!'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, বৃষ্টির মত ছুটে এল অটোমেটিক ওয়েপনের বুলেটবৃষ্টি। সেই আঘাত পিয়ারের পুরনো কাঠের তক্তাগুলোর উপরদিক

ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়তে শুরু করল, বার্জের শরীরেও ঠং ঠং করে আওয়াজ তুলছে। একটানা গুলিবর্ষণের ক্যাট ক্যাট শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠল চারপাশ।

ফায়ারিং শুরু হতেই মাটিতে ডাইভ দিয়েছে রানা, ক্রল করে চলে এসেছে একটা বড় বোলার্ডের আড়ালে, নাদিয়াকে নিয়ে জুলফিকাররাও বার্জের ডেকে লোড হওয়া কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালের পিছনে কাভার নিয়েছে। দ্রুত একটা ক্রেট খুলে নিজেদের আর্মস-অ্যামিউনিশন বের করল তৌহিদ, বিতরণ করল অপর দুই বিসিআই এজেন্টের হাতে।

'মাসুদ ভাই!' চেঁচিয়ে উঠল অপূর্ব। 'আমরা কাভার দিচ্ছি, আপনি চলে আসুন এখানে!'

প্রতিপক্ষের গুলিবর্ষণে একটু ফাঁকা পেতেই আড়াল থেকে শরীর জাগাল তিন বিসিআই এজেন্ট, ওদের হাতে এ.আর.-১৫ মেশিনগান, মিনিটে একশো বিশ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া যায়। অগ্রসর হতে থাকা ট্রাকটার দিকে কাভারিং ফায়ার করতে শুরু করল ওরা।

এবার শত্রুদের গা-ঢাকা দেবার পালা, ট্রাকের পিছনে থাকা লোকগুলো ঝট্ করে বসে পড়ল মেঝেতে... ড্রাইভারস্ ক্যাবের আড়ালে। চালক আর তার পাশে বসা আরোহীও মাথা নুইয়ে ফেলল। ক্ষান্ত হলো না তিন বিসিআই এজেন্ট, গুলি ছুঁড়ে ট্রাকটার সামনের অংশ ঝাঁঝরা করে দিল। চুর হয়ে গেছে ওটার উইন্ডশিল্ড -বনেট কাভারও বিশাল এক ঘুড়ির মত পাখা মেলল আকাশে। তার পরেও ধীর ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সামনে।

সুযোগটা কাজে লাগাল রানা, পিয়ার থেকে এক ছুটে উঠে পড়ল বার্জে। জুলফিকারের ছুঁড়ে দেয়া ছুরিটা খপ্ করে ধরল ও, তারপর কেটে দিতে শুরু করল বার্জটার সমস্ত বাঁধন। শেষ রশিটা কাটা হতেই বিকট শব্দে মাথা তুলে তাকাল ও, দেখল -ট্রাকের টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছে তৌহিদ। চোখের পলকে কাত হয়ে গেল ওটা, ডকের দিকে রাস্তার ঢাল বেয়ে নামছিল, ব্যালান্স রইল

না, মাতালের মত একটু দুলেই উল্টে গেল। আহত হামলাকারীদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল বাতাস -ট্রাকের তলায় পড়ে কতজন চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, কে জানে।

জানার উপায়ও নেই অবশ্য, বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে বার্জটা স্রোতের টানে ভেসে এসেছে বেশ কিছুদূর। উল্টে যাওয়া ট্রাকের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে একে একে কয়েকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, সোজা হয়ে নিষ্ফল আক্রোশে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। যারা মারা পড়েছে, তাদের জন্য কোনও করুণা অনুভব করল না রানা, অবাক হয়ে ভাবছে, কারা এরা?

ঘুরে দাঁড়াল রানা, সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল। ভয়ঙ্করদর্শন একটা কোল্ট .৪৫ ঠিক দু'হাত দূর থেকে চেয়ে আছে ওর দিকে, বাট আঁকড়ে ধরে থাকা হাতটা নিস্কম্প। বাহুটাকে অনুসরণ করে মানুষটার দিকে তাকাতেই অপরূপ সুন্দরী এক ল্যাটিন যুবতীকে দেখতে পেলও -বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না, কোঁকড়া কালো চুল নেমে গেছে পিঠ পর্যন্ত, চেহারাটা সুন্দর হলেও সংগ্রামী জীবনযাপনের কারণে চোখমুখে কাঠিন্যের ছাপ এসে গেছে। হল্টার টপ আর খাকি শর্টস পড়ে আছে মেয়েটা, এই অঞ্চলের মেয়েদের পোশাক হিসেবে এ সাজ একটু বেমানানই। মেয়েটা এতক্ষণ পাইলট হাউসে ছিল বলে দেখতে পায়নি ওরা, হঠাৎ করেই পিস্তল বাগিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

ঘটনাটা লক্ষ করে জুলফিকার, তৌহিদ আর অপূর্ব মেশিনগান তাক করল মেয়েটার দিকে, ইশারায় ওদের শান্ত থাকার নির্দেশ দিল রানা। একটু কেশে নিয়ে বলল, 'সুন্দরী মেয়েদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র একেবারেই শোভা পায় না,' গলার স্বর একদম স্বাভাবিক ওর, যেন খোশগল্প করছে। 'পিস্তলটা নামাও, তা হলে হয়তো আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে।'

হালকা কথাবার্তায় মোটেই বিভ্রান্ত হলো না মেয়েটা, থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? আমার বার্জে উঠেছ কেন?'

‘তোমার বার্জ! ভুরু কোঁচকাল রানা। আমি তো ভেবেছি এটা ক্যাপ্টেন গোমেজের।’

‘আমিই গোমেজ। ক্যাপ্টেন মারিয়া গোমেজ।’

একটু অবাকই হলো রানা। অল্পবয়েসী এক তরুণী আমাজনের মত জায়গার রিভার-ক্যাপ্টেন হতে পারে -এটা কল্পনাও করেনি ও। তাড়াতাড়ি বিস্ময়টা সামলে বলল, ‘ নাইস টু মিট ইউ, ক্যাপ্টেন। আমি রানা... মাসুদ রানা।’

‘তোমার নাম জানতে চাইনি,’ রাগী গলায় বলল মারিয়া। ‘বিনা অনুমতিতে আমার বার্জে উঠেছ কেন -সেটা বলো, সেনিয়র।’

‘উপায় ছিল না যে! নদীর ধারের ওই লোকগুলোকে দেখছ নিশ্চয়ই? আমাদের অনুমতি নেয়ার সময় দেইনি ওরা।’

‘কেউ তাড়া করলেই হুড়মুড় করে উঠে আসতে হবে আমার বার্জে?’ মুখ বাঁকা করে বলল মারিয়া।

‘দুঃখিত,’ মিষ্টি করে হাসল রানা। ‘তোমাকে খুব সমস্যায় ফেলে দিয়েছি নিশ্চয়ই?’

‘সেটা আবার বলে দিতে হবে?’ রাগ পড়ছে না তরুণীর। ‘কী পরিমাণ ক্ষতি করেছ তোমরা আমার, তা জানো? অর্ধেক কার্গোও লোড করতে পারিনি; পড়ে গিয়ে যে নিয়ে আসব, তারও উপায় নেই। যাদেরকে খেপিয়ে দিয়ে এসেছ, ওরা প্রতিশোধ নেবার জন্যে সবকিছু আগুন দিয়ে পোড়াবে।’

‘আমাদেরকে ফন্টে বোয়া পর্যন্ত নিয়ে গেলে ক্ষতিটা পুষিয়ে দিতে পারি,’ প্রস্তাব দিল রানা। ‘সঙ্গে বাড়তি ভাড়াও পাবে।’

‘তোমাদের কোথাও নিয়ে যাব না আমি,’ দাঁত কিড়মিড় করল মারিয়া। ‘এক্ষুণি তোমরা নেমে যাবে আমার বার্জ থেকে... এক্ষুণি!’

‘মাঝনদীতে ঝাঁপ দিতে বলছ?’

'ঝাঁপ দেবে না উড়ে যাবে -সেটা তোমাদের মাথাব্যথা,' হুমকির ভঙ্গিতে কোল্টটা নাড়ল মারিয়া। 'কিন্তু গুলি খেতে না চাইলে বোট থেকে তোমাদের নেমে যেতেই হবে।'

'বোকামি কোরো না,' শান্তস্বরে বলল রানা। 'তুমি একা, আমরা পাঁচজন। তুমি একটা গুলি করার আগেই তিন দশকে তিরিশটা গুলি খাবে। জোর খাটিয়ে আমাদের নামাতে পারবে না। তারচেয়ে এসো সমঝোতা করি। ফন্টে বোয়া পর্যন্ত নিয়ে চলো আমাদের, বিনিময়ে চার হাজার ডলার পাবে। আমার তো মনে হয়, তাতে তোমার সমস্ত লস-টস পুষিয়েও বেশ অনেকটা থেকে যাবে।'

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল মারিয়া, বোধহয় প্রস্তাবটার ভালমন্দ খতিয়ে দেখছে। শেষে বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে যেতে পারি তোমাদের, কিন্তু চার হাজারে হবে না, আট হাজার ডলার দিতে হবে।'

'পাগল হয়েছ? আট হাজারে তোমার মত আটটা ক্যাপ্টেন কেনা যায়।'

'তা হলে আটজনই কিনে আনো,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল মারিয়া। 'দেখি, ওরা কোনও কাজে আসে কি না! নদীর উজানে যেতে চাইছ তোমরা, ওখানে কী ধরনের বিপদ মোকাবেলা করতে হবে আমাকে, তা জানো?'

'জানি। এল্ পিরানহার কথা বলছ তো? ওর দোহাই দিয়ে লাভ নেই। লোকটা যে তোমার গায়ে ফুলের টোকাও দেবে না, তা আমি বুঝতে পেরেছি,' হাসল রানা। 'নদীর বাঁকের ওপারে একটা চার্চের জন্য তুমি কার্গো নাও, তাই না? সেটার জন্য প্রতিবারই পিরানহার এলাকা দিয়ে নিশ্চয়ই পার হতে হয় তোমাকে। কীভাবে পার হও? প্রতিবারই ঝুঁকি নিয়ে? আমার তো মনে হয় না। ডাকাতটার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনওরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে তোমার, সেজন্যেই যেতে পারো। আজও ওভাবেই যাবে।'

'অতশত বুঝি না,' খেপাটে গলায় বলল মারিয়া। 'আট হাজার ডলার না পেলে কিছুতেই যাব না আমি।'

‘সেক্ষেত্রে বার্জটা হাইজ্যাক করব আমরা,’ কাটা কাটা স্বরে বলল রানা। ‘দুটো অপশন এখন তোমার সামনে, ক্যাপ্টেন। এই মুহূর্তে চার হাজার ডলার আয় করতে পারো, আর না হয় আমাদের হাতে বার্জটা ছেড়ে দিয়ে বিনে-পয়সার যাত্রী হতে পারো। সিদ্ধান্ত তোমার।’

বেকায়দা পরিস্থিতিটা অনুধাবন করতে অসুবিধে হলো না মেয়েটির। কথা বলল না, ধীরে ধীরে পিস্তল ধরা হাতটা নামিয়ে ফেলল। হাবভাবে হার মানার লক্ষণ, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে গেল, হুইলহাউসের দিকে যাচ্ছে। ওর পিছু নিল রানা।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই আচমকা ঘুরল মারিয়া, হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল কী যেন। সাবধান হবার সুযোগ পেল না রানা, কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল জিনিসটা। মাথা ঘোরাতেই ছুরিটা দেখল এবার ও -কার্গোর একটা বাক্সের গায়ে বিঁধে গেছে।

সঙ্গীরা আবার মেশিনগান তাক করেছে রিভার-ক্যাপ্টেনের দিকে, হাত তুলে ওদের নিরস্ত করল রানা। বুঝতে পেরেছে, ছুরিটা মিস হয়নি, ইচ্ছে করেই কানের পাশ দিয়ে ছুঁড়েছে মেয়েটা। কারণটা জানার জন্যে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ও মারিয়ার দিকে।

‘এটা তোমাদের জন্যে একটা ওয়ার্নিং,’ ছুরিটা খুলে নিয়ে থমথমে গলায় বলল ক্যাপ্টেন গোমেজ। ‘আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা কোরো না কখনও। স্রেফ খুন করে ফেলব!’

‘আমাদের ফন্টে বোয়ায় নিয়ে যাচ্ছ না তা হলে?’ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘যাব, তবে ভয় দেখিয়েছ বলে নয়। টাকা পাব বলে। মনের ভিতরে কোনও ভুল ধারণা নিয়ে বসে থেকো না। মারিয়া গোমেজ কাউকে ভয় পায় না।’ একটা হাত পাতল। ‘চার হাজার ছাড়ো দেখি।’

দ্বিরুক্তি না করে চার হাজার ডলার বের করে দিল রানা। গুনে দেখল না মেয়েটা, কারও কোনও কথা শোনার জন্য অপেক্ষাও করল না, গটমট করে হুইলহাউসে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই ভেসে এল ইঞ্জিন চালু হবার শব্দ। এলোমেলোভাবে ভেসে বেড়ানো বন্ধ হয়ে গেল বার্জের, এখন প্রপেলার আর রাডারের সাহায্যে নির্দিষ্ট হেডিঙের দিকে ছুটছে।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল জুলফিকার। 'বাঘিনী একটা,' মন্তব্য করল ও। 'আমার পছন্দ হয়েছে।'

হাসল রানা। 'আমারও।'

হুইলহাউসে গিয়ে ঢুকল সবাই। মারিয়া জিজ্ঞেস করল, 'ফন্টে বোয়াতে কাজটা কী তোমাদের?'

জবাব না দিয়ে রানা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'রিভার গাইড জিকোকে কোথায় পাওয়া যাবে, জানো? ওকে আমাদের খুব দরকার।'

'পালিয়েছে,' বলল মারিয়া। 'এল পিরানহা ওকে খুঁজছে, মন্টে আলেগ্রা পর্যন্ত লোক পাঠিয়েছিল ধরে নিয়ে যাবার জনে। টের পেয়েই পিঠটান দিয়েছে জিকো, কোথায় গেছে বলতে পারি না। কিন্তু ওকে কি দরকার তোমাদের?'

'ও ড. রাজিব আবরারের গাইড ছিল...' বলতে গেল নাদিয়া।

'ওই বাংলাদেশি আর্কিওলজিস্ট?' বাধা দিয়ে বলল মারিয়া। 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি ঘটনাটা। পিরানহার হাতে ধরা পড়েছে বেচারা। ওঁর খোঁজেই যদি এসে থাকো, তা হলে বলব খামোখা সময় নষ্ট করছ।' গলার স্বর বরফের মত ঠাণ্ডা ওর। 'এই নদী থেকে যারা গায়েব হয়ে যায়, তাদের আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'তুমি বলতে চাইছ, রাজিবকে মেরে ফেলা হয়েছে?' নাদিয়ার কণ্ঠে আকুলতা।

'আমি শুধু বলছি যে, ওদের কেউ কোনোদিন দেখতে পায় না,' শান্তভাবে বলল মারিয়া। 'এল পিরানহা একজন জলদস্যু। কাউকে দয়া দেখায় না ও।'

নাদিয়ার মনে হলো, ওর পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। মারিয়া গোমেজের বলার ভঙ্গিতে একটা অবিচল ভাব আছে, রয়েছে এক ধরনের নিশ্চয়তা –যেন মেয়েটা সন্দেহাতীত ভাবে জানে, ওর ভালবাসার মানুষটা আর বেঁচে নেই। ব্যাকুল দৃষ্টিতে মারিয়ার চোখদুটো দেখল নাদিয়া, ওখানে আশার আলো খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু লাভ হলো না, ভয়টা আরও কয়েক গুন জেঁকে বসল যেন ওর মধ্যে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে হুইলহাউসের বাল্কহেডে পিঠ ঠেকাল নাদিয়া, দুহাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেল তৌহিদ আর অপূর্ব।

বেরিয়ে গেল রানা। জুলফিকার পিছু নিল ওর, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'মাসুদ ভাই, কী মনে হয় আপনার –ড. রাজিব কি সত্যিই মারা গেছেন?'

'মারিয়ার কথায় এত গুরুত্ব দেয়ার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না,' বলল রানা। 'খুন করতে চাইলে রাজিবকে ধরে নিয়ে যেত না পিরানহা, গুলি করে নদীতেই ফেলে দিতে পারত। তবে গোলমাল যে একটা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। এটা সাধারণ কিডন্যাপিঙের কেস হলে আমাদের আসা নিয়ে এত খেপে যেত না কেউ। শহরে পা রাখতে না রাখতে তীর ছুঁড়ে সাবধান করা হলো, প্রথমে হোটেলে... তারপর আবার নদীর ধারে হামলা চালানো হলো –কারণটা কী! নদীর বাঁকের ওপারে কাউকে যেতে দেয়া হয় না, অথচ এই বার্জের মেয়েটা ঠিকই যাচ্ছে... ব্যাপারটা রহস্যজনক নয়? কী যেন মিলছে না।'

'ঠিকই বলেছেন, মাসুদ ভাই,' একমত হলো জুলফিকার। 'আমার কাছেও ঘোলাটে লাগছে। সুবিধের মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। কোথাও বড় ধরনের একটা গণ্ডগোল আছে।'

আট

এল পিরানহার স্কাউট লরেঞ্জো দ্রুতবেগে বৈঠা চালাচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জলদস্যুদের আস্তানায় পৌঁছে সর্দারের কাছে দুঃসংবাদটা দিতে হবে তাকে। নদীর বাঁকের কাছে একটা ফরোয়ার্ড পোস্টে ডিউটি করে সে, ওখানে বসেই ওয়াকিটকিতে খবরটা রিসিভ করেছে। ডকটাকে সামনে দেখতে পেয়ে সস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লরেঞ্জো, কয়েক মিনিটের মধ্যে ওটার সঙ্গে ভিড়াল নৌকাটাকে। পিয়ারে উঠে কোনমতে খুঁটির সঙ্গে ক্যানুর দড়িটা পেঁচাল, তারপর ত্রস্ত পায়ে ছুটল আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তাটা ধরে।

নিজের কুঁড়ের বাইরে বসে পাইপ ফুঁকছিল পিরানহা, স্কাউটকে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে হাঁপাচ্ছিস কেন?'

'খারাপ খবর, বস,' বলল লরেঞ্জো। 'চারজন লোক হাজির হয়েছে মন্টে আলেগ্রায় –রিভার গাইড জিকোকে খুঁজছে। সেনিয়র হোয়াইটের লোক ওদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। গোমেজের বার্জটা দখল করে লোকগুলো এদিকে আসছে।'

খবরটা শুনে মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো উপস্থিত জলদস্যুদের মধ্যে। এগিয়ে এল তারা স্কাউটের দিকে।

পিরানহা বলল, 'মাত্র চারজন লোক আবার আমার জন্য দুঃসংবাদ হয় কী করে?'

'এরা সাধারণ লোক না, বস,' লরেঞ্জো মাথা নাড়ল। 'চারজন চারশো' জনের সমান। মার্কোস... মানে সেনিয়র হোয়াইটের ডান হাত, প্রায় ত্রিশজন লোক ভাড়া করেছিল ওদেরকে ঠেকানোর জন্যে, তারপরেও বিফল হয়েছে। ডেনজারাস লোক ওরা, বস, সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র ও আছে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল পিরানহার। ‘কারা এরা, জানা গেছে?’

‘এক্সপিডিশনের নাম করে এসেছে, কিন্তু কাজের নমুনা তো দেখছি অন্যরকম! সত্যিকার পরিচয় বলতে পারছে না কেউ।’

রাগে দপ করে জ্বলে উঠল খোঁড়া দস্যুসর্দারের চোখদুটো। ‘ভেবেছেটা কী ওরা? আমার রাজত্বে এসে আমারই ওপর মাস্তানি করবে? ঠিক আছে, আসুক দেখি হামজাদা। ওদের টের পাইয়ে দেব -এল পিরানহার অনুমতি ছাড়া নদীর বাঁক পেরুনোর চেষ্টা করলে কী পরিণতি হয়।’

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল সে। একটু পরেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে গেল পুরো দলটা। প্রশিক্ষিত সৈনিকের মত মার্চ করিয়ে তাদের নিয়ে বাহিয়া ব্লাঙ্কায় চড়ল পিরানহা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ডক ছাড়ল, রওনা হয়ে গেল জুরুয়া আর সলিমোসের সংযোগস্থলের দিকে।

মনে মনে কঠিন শপথ নিয়েছে দস্যুসর্দার -এই নদী তার রাজ্য। এখানে তাকে অমান্য করে কেউ পার পায় না। চার বিদেশি লোকগুলোকে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে সে।

বার্জের পাইলট হাউসে শক্ত করে হুইল আঁকড়ে ধরে আছে মারিয়া গোমেজ, সতর্ক দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ -নদীর স্রোতকে বইয়ের পাতার মত পড়তে জানে ও। ঘন ঘন কোর্স বদলে অগভীর পানি আর ডুবোপাথর এড়াচ্ছে। রানা ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে একটা ম্যাপ খুলে স্টাডি করছে নদীর গতিপথটা। তবে সেদিকে মোটেই নজর নেই মারিয়ার -ওই ম্যাপ ওর মগজে গাঁথা আছে, চোখ বন্ধ। করেও কোথায় কী আছে, সব বলে দিতে পারবে।

‘বাকটা সামনেই,’ ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রেখে বলল রানা।

‘হ্যাঁ,’ সায় দিল মারিয়া, তবে সামনে থেকে চোখ ফেরাল না।

ম্যাপটা কয়েক সেকেণ্ড দেখল রানা, তারপর গম্ভীর সুরে ক্যাপ্টেনকে বলল, ‘সেন্টার কারেন্টে থাকো, দুপাশের গভীরতা কম দেখতে পাচ্ছি।’

এবার মুখ ফেরাল মারিয়া, চেহারায় বিরক্তি ফুটে রয়েছে। এই নদী ওর হাতের তালুর মত পরিচিত, কীভাবে চলতে হবে -নবাগত এক বিদেশির কাছ থেকে এ-সংক্রান্ত ডিকটেশন মোটেই পছন্দ করছে না। ব্যাপারটা লক্ষ করে রানা বলল, ‘সরি, উপদেশ দিচ্ছি না। স্রেফ সতর্ক করছি তোমাকে, আর কিছু না।’

কৈফিয়তটায় মোটেই সন্তুষ্ট মনে হলো না মেয়েটিকে, অস্ফুট একটা গাল ঠিয়ে আবার সামনে তাকাল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডেকে বেরিয়ে রেলিঙের ধারে অপূর্বের পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

তীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অপূর্ব, অখণ্ড মনোযোগ ওদিকে, পাশে রানার উপস্থিতি টেরই পেল না। রানা ওর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, ‘কী দেখছ?’

ধড়মড় করে সোজা হলো অপূর্ব। তারপর আঙুল তুলল তীরের একটা অংশ লক্ষ্য করে, ‘ওখানটায় দেখুন।’

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানা। নলখাগড়ার মাঝখানে একটা কাঠের গুঁড়ির মত দেখাল জিনিসটাকে প্রথমে, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরই বোঝা গেল -গুড়ি নয় ওটা, উল্টে থাকা একটা ক্যানু। তাড়াতাড়ি হুইলহাউস থেকে একটা বিনকিউলার এনে চোখে ঠেকাল ও -দৃশ্যটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল সঙ্গে সঙ্গে। রাজিবের ক্যানু নয় এটা, বেশ পুরনো... অন্তত কয়েক মাস আগে উল্টেছে এটা। সারা গায়ে শ্যাওলা আর জলজ আগাছা দেখা গেল -মাত্র ছ’সাত দিনে এ-অবস্থা হবার কথা নয়। তবে ওসব ছাপিয়ে আরেকটা ব্যাপার নজর কাড়ল রানার -ক্যানুটার শরীরে ছোটো ছোটো অসংখ্য গর্ত... একমাত্র বুলেটের আঘাতেই এমন ফুটো হতে পারে।

‘পিরানহার ওয়ার-জোনে পা দিয়ে ফেলেছি মনে হচ্ছে,’ বিনকিউলারটা নামিয়ে বলল রানা। ওটা তারই মার্কিং।’

সঙ্গের তিন বিসিআই এজেন্টকে এলএমজি নিয়ে তৈরি থাকার নির্দেশ দিল ও, নিজে নিল একটা এমপি-ফাইভ সাব-মেশিনগান। আর্মস-অ্যামিউনিশন বিলি-বণ্টন শেষ হলে সবাইকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বার্জের দুপাশে পজিশন নিতে বলল।

‘নাদিয়া, তুমি নীচে চলে যাও,’ বলল রানা। ‘উপরটা নিরাপদ নয়।’

মাথা নাড়ল নাদিয়া -কান্নাকাটি থামিয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে ও। রাজিব যদি মারা গিয়েই থাকে, সেক্ষেত্রে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী লোকটার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে ও। বলল, ‘আমিও লড়াই করব, মাসুদ ভাই।’

‘তুমি কিন্তু আমার কথা শুনবে বলেছিলে!’ বিরক্ত কণ্ঠে মনে করিয়ে দিল রানা।

‘তাই বলে চার ভাইকে বিপদের মুখে ফেলে নীচে গিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?’ জেদি গলায় বলল নাদিয়া। আমি গুলি চালাতে জানি, তাই সাহায্য করতে চাই আপনাদের।’

‘সাহায্য করতে হবে না, বিপদ মোকাবেলার জন্য আমরাই যথেষ্ট।’

‘যা-ই বলুন, আমি কিছুতেই নীচে যাচ্ছি না,’ নাদিয়া নাছোড়বান্দা। ‘প্লিজ, আপনি অনুমতি দিন।’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বুঝতে পারছে -জেদি মেয়েটাকে নীচে পাঠানো যাবে না। জোর খাটালে বরং হিতে-বিপরীত হতে পারে। অগত্যা ও বলল, ‘ঠিক আছে, থাকো এখানে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি বেশি খারাপ হয়, তা হলে কিন্তু নীচে চলে যেতে হবে। তখন কোনও কথা শুনব না, দরকার হলে হাত-পা বেঁধে কার্গো হোল্ডে নামিয়ে দেব। বোঝা গেছে?’

মাথা ঝাঁকাল নাদিয়া। 'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

'গুড,' রানা বলল, তারপর তাকাল তৌহিদের দিকে। 'ওকে একটা কিছু দাও -সিম্পল হয় যেন। কীভাবে ফায়ার করতে হবে দেখিয়ে দিয়ো। আমি হুইলহাউসে যাচ্ছি, ওখান থেকে নজর রাখব চারপাশটায়।'

রানা চলে যেতেই নাদিয়াকে একটা অটোমেটিক রাইফেল দেয়া হলো। তারপর যার যার ওয়েপন চেক করে পজিশন নিয়ে ফেলল দলটা। হুইলহাউসের উইণ্ডশিল্ড দিয়ে নদীর দু'ধার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল রানা। এখন পর্যন্ত অ্যামবুশের কোনও আলামত দেখা যাচ্ছে না, তবে আক্রমণটা আচমকা হওয়াই স্বাভাবিক। চুপিসারে এলাকাটায় ঢুকতে পারলে ঝুঁকিটা কমিয়ে আনা যেত, তবে সেটা সম্ভব নয় -আদ্দিকালের এই বার্জটার ইঞ্জিন সারাক্ষণ ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। আফট থেকে হালকা একটা বাতাস বইছে, ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূর-দূরান্তে। আশপাশের গাছপালা থেকে কিছুক্ষণ পর পরই শব্দের অত্যাচারে ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে ভীত-সন্ত্রস্ত পাখপাখালি।

বার্জের চারপাশে কড়া নজর রেখেছে রানা, সামান্য অস্বাভাবিকতাও যেন চোখ না এড়ায়। দীর্ঘদিন থেকে বিপজ্জনক পেশায় থাকার কারণে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাধারণ মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ, আগেই বিপদের আভাস পায়। এ-মুহূর্তে তেমন একটা অনুভূতিই হচ্ছে ওর, বুঝতে পারছে -খুব শীঘ্রিই ওদের উপর হামলা হবে। আশঙ্কার কালো মেঘ ঝুলে রয়েছে মাথার উপর, প্রতি মুহূর্তেই গাঢ় হচ্ছে ওটা।

রানার এই অনুমান ভুল নয় মোটেই, বার্জ থেকে মাইলখানেক সামনে একটা বাঁকের আড়ালে রয়েছে বাহিয়া ব্লাঙ্কা। জায়গাটায় জঙ্গল খুব ঘন, গাছপালা একটা প্রাকৃতিক দেয়ালের মত আড়াল করে রেখেছে স্টিমারটাকে।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে জলদস্যুরা, নতুন শিকারের আশায় চোখগুলো চকচক করছে ওদের।

ডানদিকে এক ঝাঁক পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে গেল, সেদিকে তাকিয়ে এক মুহুর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেল রানা, পরমুহূর্তেই আবার সতর্ক হয়ে উঠল।

তীক্ষ চোখে আশপাশটা দেখতেই বুঝতে পারল -অ্যামবুশের জন্য একটা আদর্শ স্পটে এসে পৌছেছে। নদীর প্রস্থ এখানটায় অনেক কম, বোট ঘুরিয়ে পালানো সম্ভব নয়। সামনের বাঁকটার কারণে বার্জটার গতিও কমাতে হবে।

হুইলহাউসের দরজা দিয়ে মাথা বের করে চেঁচিয়ে সবাইকে রেডি হতে বলল ও, তারপর তাকাল মারিয়ার দিকে। 'গোলাগুলি শুরু হলে মাথা নামিয়ে রেখো।'

গরম চোখে রানার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমার, যত খুশি গোলাগুলি করো। কিন্তু জেনে রাখো -আমার এই বার্জের যদি কোনও ক্ষতি হয়, তোমাদের কাউকে আমি অস্ত রাখব না।'

'খেপে যাচ্ছ কেন?'

'এখনও তো কিছুই দেখোনি। এই বার্জ আমার একমাত্র সম্বল, এটার যদি কোনও ক্ষতি হয়, তা হলে টের পাবে খেপা কাকে বলে!'

মারিয়াকে ঘাটাল না আর রানা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দু-দু'জন অগ্নিকন্যা জুটেছে ওর কপালে। এদের সামলাতে সামনে আরও ধকল পোহাতে হবে।

কয়েকটা মিনিট নীরবে কেটে গেল এর পর। রানা তো চুপ, ডেকের উপরও কেউ কথা বলছে না। যার যার অস্ত্র দৃঢ় হাতে ধরে রেখেছে অভিযাত্রীরা, চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে সবার ভিতর। নাদিয়ার অবস্থা দেখার জন্য। একবার উঁকি দিল রানা, দেখল-দুঃসাহসী অভিযাত্রীর মুখ থেকে রক্ত সরে

গেছে, হাতে ধরা অটোমেটিক রাইফেলটা কাঁপছে থরথর করে। জুলফিকারকে ইশারা করল রানা -মেয়েটাকে শান্ত করবার জন্য।

একটু পরেই বাঁকে পৌছে গেল ওদের বার্জ। ইঞ্জিনের আরপিএম কমিয়ে দিল মারিয়া, জলযানটাকে ধীর গতিতে মোড় নেয়াতে শুরু করল। বেশি সময় লাগল না জায়গাটা পেরুতে, খানিক পরেই সামনে বিশাল জলরাশি চোখে পড়ল। সবার -দুই শাখানদীর সংযোগস্থলে পৌঁছে গেছে ওরা। বহমান দুই জলধারার মিলনকেন্দ্র এবং দুপাশের সবুজ বনভূমি মিলে দৃশ্যটা অপূর্ব সুন্দর, তবে তাতে মুগ্ধ হবার সুযোগ পেল না কেউ, আড়াল ছেড়ে আচমকা বেরিয়ে এল পিরানহার ঝরঝরে স্টিমারটা -ডেক থেকে যুদ্ধ-হুঙ্কার দিতে শুরু করেছে দুর্বৃত্তরা।

'ফুল স্টিম অ্যাহেড!' চেঁচিয়ে নিজের পাইলটকে আদেশ দিল পিরানহা।

ফার্নেসে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় লাকড়ি ছুঁড়তে শুরু করল দুজন জলদস্যু, বাহিয়া ব্লাঙ্কার ফানেল দিয়ে বেরুতে শুরু করল রাশ রাশ কালো ধোঁয়া, গতি বেড়ে গেল। ধারালো ছুরির মত স্রোত কেটে বার্জের দিকে ছুটে এল স্টিমারটা, ত্রিশ গজ সামনে থেমে দাঁড়াল। বার্জের পথরোধ করে ফেলেছে।

সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল মারিয়া, থ্রটল সামান্য রিভার্সে ঠেলে বন্ধ করল বার্জের অগ্রযাত্রা। দুটো জলযানই এখন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। জলদস্যুদের উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল, অস্ত্র তাক করছে শিকারের দিকে।

শান্ত ভঙ্গিতে এমপি-ফাইভের সেফটি অফ করল রানা, জানালা দিয়ে। চেঁচিয়ে সঙ্গীদের নির্দেশ দিল, 'এখুনি কিছু কোরো না, শুধু তৈরি থাকো।'

শত্রুদের বোটের দিকে এবার নজর দিল রানা, এক দেখাতেই চিনে ফেলল, দস্যুসর্দারকে। বাহিয়া ব্লাঙ্কার ডেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসেছে। মোটাসোটা লোকটা, হাত তুলে নিজের লোককে শান্ত করল সে,

তারপর রেলিঙের কাছে এসে গলা চড়িয়ে বলল, ‘এক্সকিউজ মি, সেনিয়র। আমাদের। বোটের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে, একটু সাহায্য করুন।’

হাসি পেল রানার, ব্যাটা ওদের বোকা ভাবছে নাকি? এভাবে রাস্তা আটকেছে, ডেকে রেখেছে সশস্ত্র সঙ্গীসাথীদের... তারপর আবার নাটক করছে! কেউই ধোঁকা খাবে না এতে। বিরক্ত গলায় ও বলল, ছেঁদো কথা বাদ দিয়ে তোমার ওই জং-ধরা বালতিটা সরাও সামনে থেকে, মিস্টার। নইলে চাপা দিয়ে চলে যাব আমরা।’

মুখোশটা খসে পড়ল পিরানহার চেহারা থেকে। দাঁত বের করে শয়তানি হাসি হাসল সে, বলল, ‘সেটা এককথায় অসম্ভব, সেনিয়র। আমার বোট চাপা দেয়ার ক্ষমতা নেই আপনার, ভাল চান তো আর্মস ফেলে দিন, পাশে ভিড়বে আমার বোট। বার্জে চড়ব আমরা।’

‘তোমাদের মত নোংরা আবর্জনা একেবারেই পছন্দ নয় আমার,’ রানা বলল। ‘যদি এখানে ওঠার চেষ্টা করো তো ঝেঁটিয়ে পানিতে ফেলে দেব।’

‘অমন কিছু করতে গেলে নিজেই বিপদে পড়বেন, সেনিয়র,’ মুখের হাসিটা ধরে রেখে জানাল পিরানহা। ‘আপনারা মাত্র চারজন পুরুষ, আর আমার সঙ্গে আছে বিশজন। একেকজনকে পাঁচজনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। পারবেন?’

‘পাঁচটা চামচিকা সামলানো আমাদের কারো জন্যেই কোনও সমস্যা হবে না।’

খোঁচাটা সহ্য হলো না অহংকারী দস্যুসর্দারের, পায়ের কাছ থেকে একটা রাইফেল তুলে ফাঁকা গুলি করল সে -ভয় দেখাতে চাইছে। এই সঙ্কেতটারই অপেক্ষায় ছিল যেন বাকিরা, বাহিয়া বাঙ্কার সমস্ত ক্রু যার যার আগেয়াস্ত্র থেকে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, মুখে বিচিত্র ভাষায় চিৎকার করছে, যেন উন্মাদ হয়ে গেছে সবাই। দৃশ্যটার সঙ্গে পুরনো আমলের ওয়েস্টার্ন মুভির

মিল পেল রানা -হামলা শুরু করবার আগে রেড ইণ্ডিয়ানরা এভাবেই গুলি ছুঁড়ে আর হইচই করে নিরীহ সেটলারদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিত।

রানা অবশ্য নিশ্চল রইল, শান্তভাবে পরিস্থিতিটা বিচার করছে ও। বুঝতে পারছে, ফাঁকা গুলি আর চেঁচামেচি শেষ হলেই আসল আক্রমণটা শুরু করবে প্রতিপক্ষ। তবে তাদের সুযোগটা দিতে রাজি নয় ও, তাই হৈচৈ থামতে না থামতেই হুইলহাউসের জানালা দিয়ে মাথা বের করল। সঙ্গীদের বলল, 'ব্যাটারা কথা শুনবে না দেখছি। ওপেন ফায়ার! স্টিমারটা ডুবিয়ে দাও।'

ঝট করে গানেলের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল জুলফিকার, তৌহিদ আর অপূর্ব -তিনজনেরই হাতে শোভা পাচ্ছে ভয়ালদর্শন তিনটে এলএমজি। অস্ত্রগুলো দেখে পাথরের মত স্থবির হয়ে গেল জলদস্যুরা। ওদের হতভম্ব ভাবটা কাটার আগেই গুলি শুরু করল বিসিআই টিম।

আগুনের একটা ধারার মত পুরনো স্টিমারটার দিকে ছুটে গেল রাশ রাশ ভারি শেল, নির্দয়ভাবে আঘাত করল জলযানটাকে। কানফাটা আওয়াজে দিগ্বিদিক কেঁপে উঠল, বোটের দেহ আর ডেকের উপর থেকে উড়তে শুরু করল ছিন্নভিন্ন কাঠের টুকরো। জলদস্যুরা ততক্ষণে আড়ালের খোঁজে ঝাঁপ দিয়েছে, প্রতিরোধ গড়ার কোনও চেষ্টাই দেখা গেল না তাদের মধ্যে। আসলে চেষ্টা করে লাভও নেই, জনসংখ্যার দিক থেকে ভারি হলেও তিন-তিনটে এলএমজি-র সঙ্গে পাল্লা দেবার মত ফায়ারপাওয়ার বা ক্ষমতা নেই ওদের। বিনা বাধায় গুলি ছুঁড়ে গেল তিন বিসিআই এজেন্ট, প্রথমে ভয় দেখানোর জন্য এদিক-সেদিক গুলি ছুঁড়লেও কিছুক্ষণের মধ্যেই টার্গেট নির্দিষ্ট করে ফেলল ওরা। স্টিমারের একটা পাশ লক্ষ্য করে এখন এক সারিতে ফায়ার করছে তিনজনে, ফুটোগুলো পানির এল সইতে না পেরে ভেঙে যাচ্ছে... প্যান্টের জিপার খোলার মত বাহিয়া ব্লাঙ্কার হালটা দুভাগ হয়ে যাচ্ছে।

সর্বনাশটা বুঝতে বেশি দেরি হলো না পিরানহার, সঙ্গীদের নিয়ে পাল্টা আঘাত হানার একটা প্রয়াস চালাল সে, কিন্তু বেচারার উদ্দেশ্যটা সফল হতে দিল না রানা। সাবমেশিনগান নিয়ে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে ও, প্রতিপক্ষের বোটের ডেক লক্ষ্য করে ক্রমাগত সাপ্রেসিং ফায়ার করে যাচ্ছে। সাহস ফিরে পেয়ে নাদিয়াও যোগ দিয়েছে ওর সঙ্গে, এসএমজি আর অটোমেটিক রাইফেলের গোলাগুলির ফলে আড়াল ছেড়ে মাথাই বের করতে পারল না জলদস্যুরা, দু'একটা ফাঁকা গুলি ছোঁড়া পর্যন্তই রইল তাদের প্রতিরোধের মাত্রা -তাতে বার্জ অথবা বার্জের আরোহীদের কারও কোনও ক্ষতিই হলো না। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে দুঃসাহসী দু'একজন বেরিয়ে এল বটে, তবে রানার বুলেটের আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকগুলো।

গোঁয়ার টাইপের মানুষ এল পিরানহা, পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে দেখেও পিছু হটছে না। বিস্ময়ে বাকহারা হয়ে গেছে সে –প্রতিপক্ষ সশস্ত্র হবে বলে জানত, তাই বলে দলটা এই ধরনের আক্রমণ হানার মত অস্ত্র নিয়ে এসেছে, তা জানানো হয়নি তাকে। সেই অজ্ঞানতা এখন অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে, বিদেশি আগন্তুকরা কচুকাটা করছে আমাজনের আতঙ্ককে।

পাইলট হাউসের পিছনে ডেকের উপর মাথা গুঁজে পড়ে রয়েছে দস্যুসর্দার, অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার সাধের বোটের ধ্বংস-হওয়া। মাত্র ছ'ফুট দূরে দলের একজনকে গুলি খেয়ে চিত হয়ে পড়তে দেখেই ঘোর ভাঙল তার, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল পাইলট হাউসের খোলা দরজার দিকে।

বোটের চালক এখনও বেঁচে আছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পিরানহা- হুইল ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে আছে লোকটা, দুহাতে ঢেকে রেখেছে কান। দস্যুসর্দার চেঁচিয়ে বলল, 'বোট ঘোরাও! পালাও এখান থেকে!'

মাথা তুলে আদেশটা বোঝার ভঙ্গি করল পাইলট, মনে মনে সে-ও এটাই চাইছিল, শুধু সর্দার খেপে যেতে পারে ভেবে প্রস্তাবটা উচ্চারণ করেনি।

গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ ছাপিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্যান্ত হয়ে উঠল বাহিয়া ব্লাঙ্গার ইঞ্জিন। বোটের চারপাশে ছলকে উঠল দুরন্ত স্রোতের পানি, রিভার্স টার্ন করছে প্রপেলার, জলযানটাকে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। ত্রিশ গজ যাবার আগেই প্রচণ্ড এক শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল -বোটের একটা বয়লার ভারি শেলের আঘাতে ফেটে গেছে। হালের একপাশে বিশাল এক ফোকর সৃষ্টি হলো, হুড়মুড় করে সেখান দিয়ে পানি ঢুকতে শুরু করল। দেখতে দেখতে পোর্ট সাইডে কাত হয়ে গেল বাহিয়া ব্লাঙ্কা, ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে, উল্টে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। মরণ আর্তনাদ ছাড়তে শুরু করল পুরনো স্টিমারটার ইঞ্জিন -প্রথমে চাপা গোঙানির মত শোনাল শব্দটা, ধীরে ধীরে সেটা পরিণত হলো ইস্পাত ভাঙার কর্কশ আওয়াজে... প্রেশার সহ্য করতে না পেরে ইঞ্জিনের ভিতরে কলকব্জাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই দ্বিতীয় বয়লারটাও বিস্ফোরিত হলো, বোটের ক্ষত-বিক্ষত শরীরের ফুটোগুলো দিয়ে বেরিয়ে এল একরাশ কালো ধোঁয়া, কৃষ্ণ-চাদরে ঢেকে ফেলল মরণোন্মুখ জলযানটাকে।

জলদস্যুদের আতঙ্কিত চেঁচামেচি শোনা গেল এবার, দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তারা। কাত হয়ে যাওয়া আ পার ডেকে আর টিকে থাকতে পারছে না, বাচ্চাদের স্লিপারের মত পিছলে চলে আসছে কিনারে, গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া নাজুক গানেল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে পানিতে। দু'একজন অবশ্য ডেকের পার্মানেন্ট ফিটিংস্ আঁকড়ে ধরে থাকায় পড়ে গেল না, তবে তাদের জন্য নতুন বিপদ উদয়। হলো। বিস্ফোরণে আগুন ধরে গেছে ইঞ্জিনরুমে, করাল শিখা সেখান থেকে পৌঁছে গেছে ডেকেও। এখানে-ওখানে উন্মত্ত পশুর মত দাপাদাপি করছে। আগুনটা, ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করেছে গোটা নোটটাকে। দস্যুসর্দারের হাঁকডাকে এখনও যারা ডেকে টিকে আছে, তাদেরই দায়িত্ব নিতে হলো আগুন নেভানোর। কিন্তু কাজটা সহজ নয়

মোটেই -একপাশে কাত হয়ে থাকা পাটাতনে দাড়ানোই কঠিন, ফায়ার-এক্সটিংগুইশার বা বালতি ভরা পানি ব্যবহার করা তো একেবারেই অসম্ভব। আছাড় খেয়ে পড়ল কয়েকজন, গড়াতে গড়াতে চলে গেল পানিতে, আর কেউ কেউ ইচ্ছে করেই ঝাঁপ দিল নদীতে।

গুলি থামানোর নির্দেশ দিয়েছে রানা। কিছুক্ষণ আগেই -শত্রুরা পরাস্ত হয়েছে, গণহত্যা করতে চায় না ও। স্থির ভঙ্গিতে মেশিনগানটা ডুবন্ত স্টিমারটার দিকে তাক করে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ খোলা ডেকে বেরিয়ে আসতে দেখল পিরানহাকে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে দস্যুসর্দার। কয়েক মিনিট দৃষ্টিবিনিময় হলো, তারপরই সঙ্গীদের পিছু পিছ পানিতে লাফিয়ে পড়ল মোটাসোটা লোকটা, একটা পা না থাকলেও অসুবিধে হচ্ছে না, মোটামুটি সাবলীল ভঙ্গিতেই সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে তীরের দিকে।

দলের বাকিদের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝোঁকাল রানা -যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তারপর গিয়ে ঢুকল হুইলহাউসে, ওখানে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। এত বড় একটা লড়াই হলো, কিন্তু মেয়েটার মধ্যে সামান্য ভাবান্তরও নেই। ওকে দেখে শুধু মুখ বাঁকা করে বলল, 'খুনোখুনি শেষ হয়েছে আপনাদের? এবার তা হলে এগোতে পারি?'

'মোটেই না,' রানা মাথা নাড়ল। ব্যাটাদের এত সহজে পালাতে দিচ্ছি না আমি। তীরে ভেড়াও বার্জটাকে।'

'এখানে ভেড়ার মত জায়গা নেই,' প্রতিবাদের সুরে বলল মারিয়া। 'বিচ করতে হবে।'

'তা হলে তা-ই করো।'

'মাটিতে আটকে যাব তো!' মারিয়ার কণ্ঠে স্পষ্ট আপত্তি। 'পরে নামাব কী করে?'

‘ভাবনাটা আমার ওপর ছেড়ে দাও,’ রানা বিরক্ত। কথা শোনো এখন! যা বলছি, করো!’ শেষ কথাটা বলল ধমকের সুরে।

অপমানে মুখটা লাল হয়ে গেল মারিয়ার, বন বন করে হুইল ঘোরাল সে। মুখ ঘুরিয়ে নদীর তীরের দিকে ছুটতে শুরু করল বার্জ।

হাঁপাতে হাঁপাতে দলবল নিয়ে ইতিমধ্যে তীরে উঠে এসেছে এল পিরানহা। জায়গাটা আঠালো কাদায় ভরা; পরিশ্রান্ত জলদস্যুরা যখন তার ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে, দূর থেকে তাদের মনে হল কিলবিল করতে থাকা এক জঙ্গল সিলমাছের মত। ডেকে বেরিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে দৃশ্যটা দেখল রানা, তারপর তৌহিদের হাত থেকে এলএমজি-টা নিল। কাদামাখা দস্যুদের কয়েক গজ সামনে গাছের সারি লক্ষ্য করে ফায়ার করল ও।

একটু উঁচুতে গুলি করেছে রানা, তাতে একগাদা ডালপালা ভেঙে পড়ল লোকগুলোর কয়েক হাত সামনে। থেমে গেল নড়াচড়া, দস্যুরা বুঝতে পারছে -পালাবার চেষ্টা করলে পরের গুলিগুলো তাদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হবে। বার্জটা পৌঁছানো পর্যন্ত আর একটুও নড়াচড়া করল না তারা -সাহস হারিয়ে ফেলেছে। অজেয় পিরানহাকে সামান্য তিন-চারজন বিদেশির হাতে এভাবে নাজেহাল হতে দেখে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে সবাই।

বার্জটার সামনের দিক অগভীর পানিতে পৌছে থমকে যেতেই লাফ দিয়ে নেমে এল রানা, পিছু পিছু ওর সঙ্গীরা। সবার হাতে অস্ত্র রয়েছে, পড়ে থাকা জলদস্যুদের দিকে তাক করে এগিয়ে গেল ওরা।

‘ওঠো সবাই,’ হুকুম দিল রানা। সাবধান, চালাকি করতে যেয়ো না কেউ, তা হলে মরবে!’

দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল দস্যুরা, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুহাত তুলে রেখেছে। একজন শুধু ব্যতিক্রম, সে হলো পিরানহা। কেউ তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করেনি, ফলে এখনও কাদায় শুয়ে আছে সে।

‘তুমিই পিরানহা?’ নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করল রানা।।

‘জী, সেনিয়র,’ স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসল দস্যুসর্দার। ‘আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?’

‘প্রয়োজন আছে কি?’

‘অবশ্যই! আমাজনের ত্রাসের সঙ্গে এভাবে পাল্লা দিল যে-লোক, তার পরিচয় জানতে হবে না আমাকে?’

‘দুঃখিত,’ মুচকি হাসল রানা। ‘ত্রাস বলে তোমাকে মানতে রাজি নই আমি। তুমি হলে উলুবনের শেয়াল, সিংহ না থাকায় রাজা সেজে বসে আছ। তবে তোমার রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে, বুঝেছ?’

মুখের হাসিটা মুছে গেল পিরানহার।

নয়

সন্ধ্যা নামার একটু আগে এল পিরানহার ক্যাম্পে এসে পৌছুল ওরা। কাঁচা রাস্তাটা ধরে গ্রামে এসে ঢুকল সবাই -বন্দি জলদস্যুরা রইল সামনে, আগ্নেয়াস্ত্র বাগিয়ে পিছনে থাকল রানা ও তার সঙ্গীরা। অস্ত্রের মুখে নিজের আস্তানার সন্ধান দিতে বাধ্য করা হয়েছে পিরানহাকে, ওখানেই আপাতত ক্যাম্পিং আর ইন্টারোগেশনের কাজ করবে বলে ঠিক করেছে রানা।

পুরো জায়গাটাই জনশূন্য দেখা গেল। জীবন্ত প্রাণী বলতে রয়েছে শুধু কানের কাছে ভনভন করতে থাকা একদল মাছি, আর একটা নেড়ি কুকুর - নিভে যাওয়া ক্যাম্পফায়ারের পাশে পড়ে থাকা থালাবাসন আর হাঁড়ি চেটে বেড়াচ্ছে ওটা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা মানুষদের পায়ের শব্দ

পেয়ে মাথা তুলে তাকাল ওটা, তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে নির্বিকার ভঙ্গিতে চলে গেল কম্পাউণ্ড ছেড়ে।

চারপাশে নজর বোলাল রানা -নিজের বলে দাবি করার মত কোনও জায়গা নয় এটা, যুদ্ধ করে দখল করবারও কিছু নেই এখানে। জলদস্যুদের ধনসম্পদ বলতে কিছু নেই, সবকিছুই সস্তা এবং পুরনো। যুদ্ধজয়ের চিহ্ন হিসেবে নেবার মত কিছুই ধরা পড়ল না চোখে।

উঠানে বন্দিদের জড়ো করে রেখে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পেরিমিটার-সার্চ করল ওরা তবে আড়ালে-আবডালে ঘাপটি মেরে থাকা কাউকে পেল না। পিরানহার “গেস্ট-কোয়ার্টার"-গুলো দেখতে পেয়ে হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, ভাগ্য নির্ধারণের আগ পর্যন্ত সর্দার আর তার চ্যালা-চামুণ্ডাদের ওখানেই আটকে রাখা যাবে।

জুলফিকারের দিকে তাকাল ও। ‘চেক করে দেখো খাঁচাগুলো ব্যাটাদের ধরে রাখতে পারবে কি না।’

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল জুলফিকার, সবগুলো খাঁচা পরীক্ষা করে দেখল। সঙ্গে ডাণ্ডাবেড়ি জাতীয় শিকলও আছে... দেখল ওগুলোও। সবই মজবুত বলে মনে হলো ওর কাছে, তারপরেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নিচ্ছে।

পিরানহার সামনে চলে এল রানা। হালকা সুরে বলল, ‘ডাকাতির ব্যবসা। বিশেষ ভাল যাচ্ছে না, তাই না?’ গ্রামের ভগ্নদশার দিকে ইঙ্গিত করল ও।

পিরানহা পাকা অভিনেতা; ডাকাতি করতে গিয়ে নিজেই বন্দি হয়েছে, পরিণাম ভাল হবার কথা নয় -তারপরেও চেহারায় দুশ্চিন্তার কোনও ছাপ নেই। মুখটা হাসি হাসি রেখে বলল, ‘কী আর করব বলুন, সেনিয়র? এখানকার জীবন বড় কষ্টের... জলদস্যুদের তো আরও বেশি।’

‘কষ্টের আর দেখছ কী?’ অপূর্ব বলল। তোমার খারাপ সময় তো কেবল শুরু হলো।’

একটু পরেই ফিরে এল জুলফিকার। বলল, 'সব ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। ব্যাটাদের খাঁচায় পোরা যেতে পারে, ভিতর থেকে পালাবার উপায় নেই।’

‘ঠিক আছে, সবাইকে নিয়ে যাও তা হলে,’ রানা বলল। ‘পালের গোদাটা বাদে।’

গরু খেদানোর মত করে বন্দিদের নিয়ে গেল তিন বিসিআই এজেন্ট, উঠানে রয়ে গেল শুধু রানা, নাদিয়া আর ওদের মুখোমুখি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পিরানহা। সঙ্গীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে দস্যুসর্দার জানতে চাইল, ‘আমাকে পাঠাচ্ছেন না?’

‘উঁহু, আগে আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাকে,’ সংক্ষেপে বলল রানা। ‘তোমার কুঁড়ে কোনটা?’

বিরক্ত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল দস্যুসর্দার, যেন প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেছে। বলল, ‘দেখে বুঝতে পারছেন না, সেনিয়র? টিভি অ্যান্টেনা আছে। যেটায়... ওটাই তো হবার কথা, তাই না?’

‘বাহ, বাহ! টিভিও আছে এখানে?’

ময়লা দাঁত বের করে হাসল পিরানহা। ‘রিসেপশন খুব খারাপ। শনিবার সকালে ডোনাল্ড ডাকের কার্টুন ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না... তাও শব্দ ছাড়া!’

‘সত্যি বলছ কি না, চলো দেখি।’

লোকটাকে নিয়ে কুঁড়ের দিকে পা বাড়াল রানা। নাদিয়াও পিছু নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত তুলে বাধা দিল ও। ধুরন্ধর জলদস্যুটার পেট থেকে কথা বের করতে হলে টরচার করতে হতে পারে, সে দৃশ্য অল্পবয়েসী কোনও মেয়ের না দেখাই ভাল।

‘এখানেই থাকো,’ ওকে বলল রানা। ‘জুলফিকারদের সাহায্য করো।’

কী বুঝল কে জানে, তবে কাধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল নাদিয়া। পিরানহাকে নিয়ে কুঁড়েতে চলে গেল রানা।

সামনের ঘর পেরিয়ে পিছনের কামরাটায় গিয়ে থামল দস্যুসর্দার। গোবেচারা ভঙ্গিতে বলল, 'বলুন সেনিয়র, আপনার কী খেদমত করতে পারি?'

'ড. রাজিব আবরারের খোঁজ চাই আমি,' সোজা-সাপ্টা স্পষ্ট ভাষায় চাহিদাটা জানাল রানা।

'কে?'

'রাজিব আবরার... বাংলাদেশি আর্কিয়ালোজিস্ট,' আবার বলল রানা। 'বোকা সাজার চেষ্টা কোরো না, পিরানহা । আমি জানি, তুমিই ওর বোটে হামলা চালিয়েছিলে... ওকে বন্দি করে নিয়ে গেছ। কোথায় এখন ও?'

ত্যাঁদোড় দস্যুসর্দার কৌশলে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। মুখে কাতর একটা ভাব ফুটিয়ে বলল, 'আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, সেনিয়র। একটা পায়ে চলাফেরা করা যে কী কষ্টের... বসে কথা বললে আশাকরি কিছু মনে করবেন না?'

অনুমতি পাবার জন্য অপেক্ষা করল না লোকটা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে নিজের ডেস্কটার উল্টোপাশে, বসে পড়ল চেয়ারে। এরপর, যেন অভ্যাসবশে কাঠের তৈরি পা-টা ডেস্কের উপর তুলে দিল সে, ওটা এখন রানার দিকে তাক হয়ে রয়েছে। মুখে একটা হাসি ফুটল পিরানহার –শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে সে, এখুনি এই বেয়াড়া বিদেশিকে শায়েস্তা করবে।

রানার অভিজ্ঞ চোখে অবশ্য লোকটার হাবভাবের ক্ষীণ পরিবর্তনটা ঠিকই ধরা পড়ল, ভুরু কুঁচকে গেল ওর, মনে মনে সতর্ক হয়ে গেল। বলল, 'হাতদুটো এমনভাবে রাখো যাতে দেখতে পাই আমি। খবরদার, চালাকি করতে যেয়ো না! স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

‘আমাকে খুন করা এত সহজ নয়, সেনিয়র,’ আত্মপ্রসাদ প্রকাশ পেল পিরানহার কথায়। ‘হয়তো শুনে থাকবেন, এখানকার লোকজন আমাকে অমর ভাবে।’

‘চিন্তা কোরো না, তোমার লাশটা দেখিয়ে ওদের ভুল ধারণা ভেঙে দেয়া যাবে,’ বলল রানা। এখন ছেঁদো কথা বাদ দিয়ে ড. রাজিব আবরারের খবর বলো। কী করেছ তুমি ওকে নিয়ে?’

মাথা চুলকাল পিরানহা, যেন নামটা এই প্রথম শুনছে সে। বলল, ‘রাজিব আবরারটা আবার কে! বিখ্যাত কেউ নাকি? তার জন্যই এতসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছেন আপনারা?’

বিরক্তিসূচক একটা আওয়াজ করল রানা। ‘আবার কথা প্যাঁচাচ্ছ? শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি -কোথায় ড. আবরার? তাড়াতাড়ি বলো, নইলে কিন্তু পিটিয়ে পেটের কথা বের করব।’

‘ছি ছি! ভদ্রলোকে এভাবে কথা বলে?’ তিরস্কারের সুরে বলল পিরানহা। ‘অনুরোধ-টনুরোধ করলে নাহয় ভেবে দেখতাম, আপনাকে সাহায্য করা যায় কি না!’

হুমকির ভঙ্গিতে হাতের এমপি-৫-টা নাড়ল রানা। ‘তোমার মত লোককে এভাবেই অনুরোধ করি আমি।’

‘তা হলে তো এ-ধরনের অনুরোধে কীভাবে সাড়া দিই, সেটাও দেখাতে হয় আপনাকে।’

ঝট্ করে সামনের দিকে ঝুঁকল পিরানহা, প্রসারিত হাতটা নিয়ে ঠেকাল কাঠের পায়ে লুকানো ট্রিগার-মেকানিজমের বোতামে। তবে রানার রিফ্লেক্সও অসাধারণ, কুঁড়েতে ঢোকার পর থেকেই লোকটার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখে সতর্ক হয়ে গেছে; এখন তাকে আচমকা নড়ে উঠতে দেখেই আশু-বিপদটা আঁচ করতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ঝাঁপ দিল ও।

নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে ট্রিগার বাটনে চাপ দিল পিরানহা, রিকয়েলের ঝাঁকি সহ্য করবার জন্য শরীরটা শক্ত করে ফেলল একই সঙ্গে। পায়ের ডগায় বিস্ফোরণ, ধোঁয়া আর গুলিবিদ্ধ প্রতিপক্ষের উল্টেপাল্টে পড়ে যাওয়া -মানসচেখে এগুলোর সবই দেখে ফেলল সে, কিন্তু চর্মচোখে তেমন কিছু উপভোগ করবার সৌভাগ্য হলো না। আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ট্রিগার বাটনটা আবার চাপল সে। কিন্তু গুলি হলো না। প্রথমবার ক্লিক শব্দ হয়েছিল, এবার তা-ও নেই।

বাপারটা বুঝতে পেরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, এগিয়ে গিয়ে কলার ধরে টেনে তুলল ধুরন্ধর দস্যুসর্দারকে। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল ও, ভুঁড়িতে ঠেকিয়ে রেখেছে এমপি-৫-এর মাজলটা।

‘ছলচাতুরির সময় শেষ, পিরানহা!’ রাগী গলায় বলল রানা। ‘এবার তুমি মরবে!’

‘না, না,’ ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল দস্যুসর্দার। ‘আমি তো কিছু করিনি...’

লাথি মেরে লোকটার নকল পা-টা খসিয়ে দিল রানা, ভিতর থেকে বের করল শটগানটা। ‘কিছুই করোনি?’ বাঁকা সুরে বলল ও। ‘তা হলে এটা কী? খেলনা-বন্দুক?’

জবাব দিতে পারল না পিরানহা, মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য কয়েকটা গাল বেরুল শুধু -কাকে যেন শাপ-শাপান্ত করছে। হয়তো নিজেকেই।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল নাদিয়া, রাজিবের ব্যাপারে পিরানহা কী বলছে না বলছে, সেটা জানার কৌতুহল সামলাতে না পেরে, চলে এসেছে। দস্যুসর্দারের অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, ‘কী হয়েছে?’

‘তেমন কিছু না,’ হালকা গলায় বলল রানা। ‘আমাকে খুন করার চেষ্টা করে দেখল আরকী।’

বিস্মিত দৃষ্টিতে নকল পা আর শটগানটার দিকে তাকাল নাদিয়া। 'ফায়ার। হয়নি কেন?'

রান হাসল, 'পায়ের মধ্যে শটগান রেখে যে সাঁতার কাটতে হয় না, সেটা বোধহয় জানত না। পানিতে ভিজে কার্তুজের একেবারে বারোটা বেজে গেছে।'

পিরানহার দিকে তাকাল এবার ও। 'গুড বাই, পিরানহা। যমের বাড়িতে আমি নই, তুমিই যাবে এখন।'

ভয় পেয়েছে দস্যুসর্দার। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'প্লিজ, সেনিয়র! আমাকে একটা সুযোগ দিন...'

'ঠিক যেমনটা তুমি আমাকে দিতে যাচ্ছিলে?'

'আপনার জীবনের কোনও মূল্য ছিল না আমার কাছে। কিন্তু আমাকে বাঁচতে দিলে আপনার লাভ হবে।'

কথা না বলে মাজলটা পিরানহার বুকে ঠেকাল রানা, চেহারাটা কঠোর হয়ে উঠেছে। জলদস্যুর কপাল থেকে ঘাম গড়াতে শুরু করল। ঢোঁক গিলে সে বলল, 'কসম যিশুর... ওই আর্কিয়োলজিস্ট... ড. আবরারের খোঁজ দেব আমি। দয়া করুন, আমাকে বাঁচতে দিন!'

রানার মধ্যে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না, স্থির দৃষ্টিতে পিরানহার চোখে চোখ রাখল ও। বলল, 'অ্যাডিওস, পিরানহা। বিদায়। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল দস্যুসর্দার।

দশ

মিস্টার হোয়াইটের অস্থায়ী ক্যাম্পটা জলদস্যুদের গ্রাম থেকে কয়েক মাইল উজানে। নিজের তাবুর সামনে বসে আছে সে, সামনে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে

রয়েছে রাজিব আবরার। ওর চেহারাটা আর চেনার উপায় নেই -মার খেয়ে সারা মুখে কালসিটে দাগ পড়ে গেছে, ফুলে গেছে একটা চোখ। ছেঁড়াখোঁড়া জামার এখানে-সেখানে শরীরের যতটুকু দেখা যায়, সবখানেই জমাট বেঁধে রয়েছে শুকনো রক্ত। এখনও অত্যাচার চলছিল, হঠাৎ ফিল্ড রেডিও নিয়ে ক্যাম্পের কমিউনিকেটর হাজির হওয়ায় তাতে ছেদ পড়ল।

'আপনার জন্যে মেসেজ, সার। পিরানহা কথা বলতে চায়।'

মাউথপিসটা হাতে নিল হোয়াইট। 'হোয়াইট বলছি। কী ব্যাপার?'

'গুড ইভনিং, সেনিয়র,' ওপাশ থেকে দস্যুসর্দারের অতি পরিচিত কণ্ঠ ভেসে এল। 'আপনার জন্য খবর আছে। সুসংবাদ!'

'নাটক না করে যা-বলার জলদি বলে ফেলো,' ধমক দিল হোয়াইট।

'মন্টে অ্যাগ্রোর লোকগুলোর সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে আমার,' জানাল পিরানহা। 'সাক্ষাৎটা ওদের জন্য মোটেই আনন্দদায়ক হয়নি।'

'আটকেছ ওদের?'

'জী, সেনিয়র।'

'কে ওরা, কী চায় -জানতে পেরেছ?'

'শুধু এটুকুই যে, বিদেশি আর্কিয়োলজিস্ট ব্যাটাকে খুঁজছে ওরা। আর কিছু বলেনি।'

'এখন কোথায় ওরা?'

'আছে... আমার এখানেই আছে। কবর খুঁড়ব ওদের জন্য?'

'না!' বলল হোয়াইট। 'যা-করার আমিই করব। তুমি শুধু আটকে রাখো, আগামীকাল ভোরের মধ্যে আমি আসছি তোমার ওখানে... ওদেরকে নিয়ে আসব এখানে।'

'এবার কিন্তু ডবল টাকা দিতে হবে, সেনিয়র,' আবদারের ভঙ্গিতে বলল পিরানহা। 'লোকগুলো খতরনাক টাইপের। মার্কোসের কাছে শুনেছেন হয়তো।

মন্টে অ্যালেগ্রায় আপনার লোকেরা তো কিচ্ছু করতে পারেনি, ঝামেলা সব আমাকেই পোহাতে হয়েছে। লোক মরেছে, বোটটাও হারিয়েছি -এসবের ক্ষতিপূরণ চাইছি আরকী।'

ভিতরটা তিক্ততায় ভরে গেল হোয়াইট -কথাটা মিথ্যে নয়। কিছুক্ষণ আগেই এসে পৌঁছেছে তার সহচর মার্কোস, ওর মুখে পুরো ঘটনা শুনেছে সে। এক্সপিডিশন টিমের নামে যারা এসেছে, তারা মোটেই সুবিধের লোক নয়। ব্রাসিলিয়া থেকে ওর কন্ট্যাক্টও এ-ধরনেরই আভাস দিয়েছে, দলটার ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

হোয়াইট বলল, 'পেমেন্ট নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, তোমার সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে। লোকগুলোকে শুধু পাহারা দিয়ে রাখো। কাল সকালে দেখা হচ্ছে আমাদের। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল হোয়াইট।

কথা শেষ হতেই পিরানহার কাছ থেকে রেডিও মাইকটা নিয়ে নিল অপূর্ব। দস্যুসর্দারের পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে পুরো বিসিআই টিম, তার দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে। জান বাঁচানোর তাগিদে ওদের কথামত কাজ করতে রাজি হয়েছে লোকটা, রানাও তাকে রেহাই দিয়েছে।

এখন কমিউনিকেশনটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ঘুরে রানার দিকে তাকাল পিরানহা। বলল, 'টোপ গিলেছে হোয়াইট।'

'ভাল,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'আয়ু কিছুটা বাড়ল তোমার।'

নার্ভাস একটা হাসি ফুটল দস্যুসর্দারের মুখে, ভুলেই গেছে -কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত আমাজন নদী শাসন করে বেড়িয়েছে সে, ক্ষমতারও কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। জীবন বাঁচানোর জন্য সমস্ত অহংকার ধুলোয় বিসর্জন

দিয়েছে বেচারা, এই বিদেশিদের হাতের পুতুল হয়ে গেছে। রানার কথাটা শুনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গিতে সে শুধু বলল, 'আপনার অনেক দয়া, সেনিয়র!'

'আরও দয়া দেখতে পাবে,' রানা বলল। 'তৌহিদ-অপূর্ব, একে নিয়ে বাকিদের সঙ্গে খোঁয়াড়ে পোরো এবার।'

লোকটাকে নিয়ে চলে গেল দুই বিসিআই এজেন্ট।

জুলফিকারকে নিয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করতে বসল রানা। সারাদিনে কম ধকল যায়নি, সবারই যে বিশ্রাম দরকার, এ-ব্যাপারে দ্বিমত নেই দুজনের কারও। তা ছাড়া আগামীকাল রহস্যময় মিস্টার হোয়াইটকে মোকাবেলা করতে হবে। লড়াই করতে হবে কি না, হলে সেটা কতটা ভয়ঙ্কর হবে -বলা যাচ্ছে না। যে-কোনও পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য সবাইকে ফিট থাকতে হবে। তাই ঠিক করা হলো -ঘুমাবে সবাই, পালা করে একজন শুধু পাহারায় থাকবে। দলের চার পুরুষ মিলেই কাজটা করবে বলে ভেবেছিল, নাদিয়ার পীড়াপীড়িতে ওকেও এক ঘণ্টার একটা শিফট দিতে রাজি হলো রানা।

'বার্জের ক্যাপ্টেন মেয়েটার ব্যাপারে কী করা যায়?' জিজ্ঞেস করল জুলফিকার।

মারিয়াকে যেতে দেয়নি ওরা, বার্জসহ ডকেই রয়েছে ও। মেয়েটাকে এখন পর্যন্ত কোনও থ্রেট বলে মনে হয়নি ওদের কারও কাছে, তারপরেও ঝুঁকি নিতে চাইল না রানা। বলল, 'ও-ও এখানে চলে আসুক, আমাদের সঙ্গে থাকবে। চলে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, হোয়াইট যদি কোনভাবে ওর নাগাল পেয়ে যায়, তা হলে পুরো আয়োজনটাই লেজেগোবরে হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, আমি তা হলে ওকে ডেকে নিয়ে আসি,' বলে চলে গেল জুলফিকার।

আনমনা হয়ে গেল রান। কিছুটা দুশ্চিন্তা কাজ করছে ওর ভিতর। মিস্টা হোয়াইট নামের রহস্যময় মানুষটা খুব ভাবাচ্ছে ওকে। কে এই লোক, কী তার

ক্ষমতা -জানা যায়নি। পিরানহাও জানে না কিছু -ইন্টারোগেশনে তেমন কোনও তথ্য বেরিয়ে আসেনি। বছরখানেক আগে এই এলাকায় উদয় হয়েছে লোকটা, জলদস্যুদের ভাড়া করেছে নদীর বাঁক থেকে উজানের বাকি অংশটা প্রোটেকশন দেবার জন্য, সেই সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসী যুবকদের ধরে আনার জন্য ভাল টাকা দিতে চেয়েছে। লোক ধরে দিছে সে, কিন্তু তাদের নিয়ে কী করা হচ্ছে, সেটা বলতে পারে না সর্দার। শ্বেতাঙ্গ একটা লোক... এমন দুর্গম একটা জায়গায় করছেটা কী? কেনই বা কাউকে উজানে যেতে দিচ্ছে না? কী লুকোচ্ছে সে -ব্যাপারটা একটা বিরাট রহস্য তো বটেই।

রাত গভীর হচ্ছে ধীরে ধীরে, শুকনো খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েছে সবাই। পাহারার প্রথম পালাটা রানার, তাই শুধু ওকেই জেগে থাকতে হলো। ছোট্ট করে একটা ক্যাম্পফায়ার জ্বেলেছে ওরা, ওটার পাশে বসে থাকতে থাকতে হাত-পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেল ওর। তাই ঘণ্টাদুই পর উঠে পড়ল ও, নদীর ধারে হাঁটতে শুরু করল।

হঠাৎ পিছনে খসখস শব্দ হতেই পাই করে ঘুরল ও, মেশিনগানটা তুলে ধরেছে একই সঙ্গে। পরমুহূর্তেই অবশ্য স্নায়ুতে ঢিল দিতে হলো -অচেনা কোনও শত্রু নয়, কাঁচা রাস্তাটা ধরে ছোট ছোট পায়ে হেঁটে আসছে মারিয়া গোমেজ।

'কী করছ এখানে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

আঙুল তুলে ডকটা দেখাল মারিয়া। 'বার্জে আমার ওষুধ আছে। ঘুম আসছে না, তাই ওগুলো আনতে যাচ্ছি।'

'আমি আসব?'

'আপনার ইচ্ছে।'

মেয়েটার পিছু পিছু ভাসমান বার্জে গিয়ে উঠল রানা। হুইলহাউসের বাল্কহেডে একটা মেডিসিন কেবিনেট আছে, সেখান থেকে কয়েকটা পিল নিল

মারিয়া। খাবার পানি নেই আশপাশে, তবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না ও, নেভিগেশন টেবিলের নীচে বসানো কাবার্ড থেকে ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল আর গ্লাস বের করল। ওটা দিয়েই ওষুধগুলো গিলে ফেলল মেয়েটা।

'ড্রিঙ্ক চলবে?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

'এই অসময়ে?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'অসুবিধে কী?' বলল মারিয়া। 'আধ-গ্লাস ব্র্যাণ্ডি খেলেই মাতাল হয়ে যাবেন নাকি?'

'তা হব না।' রানা স্বীকার করল।

'তা হলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ঠিক আছে। 'দাও অল্প করে।'

'আরেকটা গ্লাস বের করে ব্র্যাণ্ডি ঢালল মারিয়া, বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। নিজেও নিল। ওর কোমরে খাপে ভরা একটা ছুরি লক্ষ করে রানা বলল, 'ওটা কীসের জন্যে?'

'আত্মরক্ষা। আবার কী?'

'এই রাতদুপুরেও?'

'একা একটা মেয়ের জন্যে রাতদুপুর যে কত ভয়ঙ্কর সময়, সেটা কি আপনি জানেন, সেনিয়র রানা?'

'অনুমান করতে পারি,' ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'তবে সামান্য, একটা ছুরি দিয়ে নিজেকে কতটা রক্ষা করতে পারবে, সে-ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ আছে আমার।'

'ব্যবহার করতে জানলে একটা ছুরিই যে কীরকম ভয়ঙ্কর অস্ত্র হতে পারে, সেটা তো আপনার ভালই জানার কথা।'

'একথা বলছ কেন?'

‘আপনাকে চিনতে পেরেছি বলে। আমি বোকা নই, সেনিয়র রানা। বহু ঘাটের জল খেয়েছি, এক দেখাতেই মানুষ বিচার করতে জানি। আপনি আর আপনার দলের প্রত্যেকে একেকজন সৈনিক... উঁচু মানের ট্রেনিং পাওয়া সৈনিক। ভুল বলেছি?’

জবাব দিল না রানা। শুধু বলল, ‘আমাদেরকে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই তোমার।’

‘ভয় পাচ্ছি না, কিন্তু কৌতূহলে মরে যাচ্ছি। আপনারা এখানে কী করছেন, সেনিয়র? কে এই রাজিব আবরার? কেন সে আপনাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ?’

‘আমার দেশের একজন প্রতিভাবান আর্কিয়োলজিস্ট ও।’

‘তাতে কী? আর্কিয়োলজিস্ট কি আপনার দেশে ওই একজনই? লোকটাকে উদ্ধার করবার জন্য যেভাবে ঝুঁকি নিচ্ছেন আপনারা, তাতে তো মনে হয় এর পিছনে অন্য আরও কারণ আছে। তা ছাড়া নাদিয়ার ব্যাপারটাও বুঝতে পারছি না -ও আপনাদের সঙ্গে কী করছে?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ‘ও-ই মূল কারণ। রাজিব ওর হবু-বর।’

ভুরু কোঁচকাল মারিয়া। ‘আপনাদের কারও প্রেমিকা নয় ও?’

‘কী যে বলো না!’ হেসে উঠল রানা। ‘প্রেমিকাকে কেউ এমন নরকের মধ্যে টেনে আনে?’

‘তা হলে? আপনাদের কারও বোন বা আত্মীয় নয়তো ও?’

‘তা-ও না। ওর সঙ্গে মাত্র তিনদিনের পরিচয় আমার, বাকিদের আরও কম।’

অবাক হয়ে গেল মারিয়া। সদ্যপরিচিত একটা মেয়ের কথায় কেউ বুঝি আমাজনের মত ভয়ানক জায়গায় ছুটে আসে? বিস্মিত গলায় ও বলল, ‘আপনারা ওকে স্রেফ সাহায্য করতে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন? আর কিছু নয়?’

‘এতে অবাক হবার কী আছে?’ রানা বলল। ‘মানুষই তো মানুষকে বিপদে সাহায্য করবে। এর পিছনে অন্য কোনও মতলব থাকতে হবে কেন?’

ঠক করে টেবিলের উপর খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল মারিয়া গোমেজ। তিক্ত গলায় বলল, ‘মতলব ছাড়া এ-দুনিয়ায় কেউ কারও জন্যে কিছু করে না, সেনিয়র রানা। সেটা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি।’

‘তা হলে বলব, তোমার অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ। পৃথিবীতে স্বার্থের চেয়েও বড় বড় অনেক জিনিস আছে -দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, প্রেম, ভালবাসা, মমতা...’

‘সব ফাঁপা বুলি,’ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল মারিয়া। ‘ওসবে আজকাল আর বিশ্বাস করে না কেউ।’

তর্কে গেল না আর রানা। বলল, ‘তা হলে কীসে বিশ্বাস করে? প্রতিদানে? তোমার ব্যাপারটাই বলো -কোন প্রতিদানের বিনিময়ে তোমাকে নদীর উজানে যেতে দিচ্ছে ওই হোয়াইট লোকটা? আর কেউ তো যেতে পারছে না।’

‘এসব নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে,’ ফুঁসে উঠে বলল মারিয়া, বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল হুইলহাউস থেকে।

কিন্তু ওর পথরোধ করে দাঁড়াল রানা। ‘মাথাটা আমাকেই ঘামাতে হবে, মারিয়া। কারণ দলের সবার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ওপর। হোয়াইটের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা না জানা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না আমি।’

‘সম্পর্ক মানে!’ তীক্ষ্ণ গলায় বলল মারিয়া। ‘আপনার কি ধারণা, আমি ওর সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছি?’

‘সেটা কি একেবারেই অসম্ভব?’

‘অবশ্যই!’ জোর গলায় বলল মারিয়া। ‘হোয়াইট একটা শুয়োর... আর শুয়োরদের কখনোই আমি কাছে ভিড়তে দিই না।’

‘তুমি ওকে চেনো দেখছি!’

‘খুব ভাল করে। লোকটার সঙ্গে স্রেফ ব্যবসায়িক যোগাযোগ রাখি আমি... টাকা কামানোর জন্যে। বার্জে যত মালামাল দেখছেন, এগুলো ওর-ই; আমি পৌঁছে দিই। বিনিময়ে ও আমাকে টাকা দেয়, আমি কিছু দিই না। বুঝেছেন?’

‘এগুলো তা হলে কোনও চার্চের কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল নয়?’ ভুরু কোঁচকাল রানা।

‘হোয়াইটের মত লোক চার্চ তৈরি করে না, সেনিয়র, ধ্বংস করে।’

‘তা হলে এগুলো দিয়ে কী বানাচ্ছে ও?’

‘আমি জানি না, জানার চেষ্টাও করি না। যারা কৌতূহল দেখায়, তাদের পরিণতিটা মোটেই ভাল হয় না। কৌতূহলী মানুষ মোটেই পছন্দ করে না হোয়াইট।’

‘বাঁকের ওপারে কাউকে যেতে দিচ্ছে না দেখে সেটা অবশ্য আমি আগেই আন্দাজ করেছি।’ হালকা গলায় বলল রানা।

‘লোকটা খুব খারাপ টাইপের, সেনিয়র,’ সামনের দিকে ঝুঁকে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল মারিয়া। ‘আপনার জায়গায় আমি হলে ওর সঙ্গে লাগতে যেতাম না।’

‘সেজন্যেই তো তুমি আমার জায়গায় নেই,’ হাসল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল মারিয়া। ‘আমি শুধু আপনাকে সাবধান করছি।’

‘করতেই যদি হয়, তা হলে হোয়াইটকে সাবধান করা উচিত তোমার। লোক তো আমরাও খুব একটা সুবিধের নই।’

কথায় না পেয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মারিয়া। ‘আমি ঘুমাতে যাচ্ছি। গুড নাইট।’ বলে বেরিয়ে গেল ও।

লম্বা এক চুমুকে ব্র্যাণ্ডিটুকু শেষ করল রানা, তারপর হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এল ও-ও।

এগারো

আমাজনের সকাল। পরদিন।

সূর্য উঠেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো, পুবাকাশের লালিমা ভেদ করে ধীরে ধীরে চড়তে শুরু করেছে ওটা, নীল আকাশে বিশাল এক অগ্নিপিণ্ড হয়ে তাপ ছড়াচ্ছে চারদিকে।

রাত দুটোয় ক্যাম্প ছেড়ে রওনা হয়েছে হোয়াইট আর তার দলের লোকেরা, ঠিকমত ঘুম হয়নি কারোই। আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠায় ক্লান্তি ভর করেছে সবার মধ্যে, তবে সেটা দলনেতাকে মোটেই স্পর্শ করছে না। শিকারে বেরুনোর একটা অনুভূতি কাজ করছে হোয়াইটের ভিতর, বুকের মধ্যে চাপা উত্তেজনায় লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। চোয়ালদুটো শক্ত করে রেখেছে সে; পিরানহার গ্রামের কাছাকাছি যখন পৌঁছুল, তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করতে শুরু করল নদীর দু'পার -কোথাও কোনও বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কি না, বোঝার চেষ্টা করছে। জলদস্যুদের বোটটা দেখতে পেল না সে, পাবে বলে আশাও করেনি -রেডিওতে ওটা অচল হয়ে গেছে বলে জানিয়েছিল পিরানহা, নিশ্চয়ই নদীর ধারেই কোথাও ফেলে রেখে এসেছে, গ্রাম পর্যন্ত আনতে পারার কথা না। তবে মারিয়া গোমেজের বার্জটা চোখে পড়ল তার, ডকের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে... কোথাও কোনও ঝামেলা চোখে পড়ছে না। নিশ্চিন্ত বোধ করল হোয়াইট, পাইলটকে ডকে ভেড়ার ইঙ্গিত করল।

ইঞ্জিন বন্ধ করল চালক, ভাসতে ভাসতে কাঠের জেটিটায় গিয়ে ভিড়ল লঞ্চ। ঝটপট ডকে নেমে পড়ল সবাই, দলবল নিয়ে সমরনায়কের কায়দায় মার্চ করে গ্রামে ঢুকল হোয়াইট।

উঠানে কোনও মানুষ নেই। আশপাশেও জলদস্যুদের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ করেই সন্দিহান হয়ে পড়ল হোয়াইট –কিছু একটা

গোলমাল আছে এখানে। হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে আনল সে, হাবভাবে অনিশ্চয়তা -মন হঠাৎ কুডাক ডাকতে শুরু করেছে।

দস্যুসর্দারের কুঁড়ের দরজা খুলে যেতে দেখা গেল, ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পিরানহা। বরাবরের মত মুখে পিচ্ছিল হাসি ফুটে রয়েছে তার মুখে, উদাত্ত গলায় বলল, 'সেনিয়র হোয়াইট! স্বাগতম... স্বাগতম!'

'হচ্ছেটা কী?' চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল হোয়াইট। তোমার লোকজন সব কোথায়?'

'প্রশ্নটা বরং ওদেরকেই করুন,' আঙুল তুলে হোয়াইটের পিছনদিকটা দেখিয়ে দিল পিরানহা।

পাঁই করে উল্টো ঘুরল হোয়াইট, থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গাছপালার আড়াল থেকে মেশিনগান হাতে বেরিয়ে এসেছে এক বিদেশি যুবক, আড়চোখে দুপাশ থেকে আরও তিনজনকে বেরিয়ে আসতে দেখল। প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে অস্ত্র ধরেছে, পজিশনও নিয়েছে চমৎকারভাবে -চাইলেই ত্রিমুখী ক্রসফায়ারে হোয়াইট আর তার দলবলকে কচুকাটা করতে পারবে।

'হ্যালো, হোয়াইট!' সম্ভাষণের সুরে বলল রানা। 'হাতের অস্ত্রগুলো লক্ষ্মী ছেলের মত ফেলে দাও দেখি!'

ফাঁদটা টের পেয়ে ক্রোধ ফুটল লোকটার রুক্ষ চেহারায়। পিরানহার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দু'মুখো সাপ কোথাকার! আমার সঙ্গে বেঈমানী?'

'খামোকা গাল দেবেন না,' বিরক্ত গলায় বলল পিরানহা। 'ওদের কথা না শুনলে কবরে যেতে হত আমাকে।'

'এখনও কবরেই যাবি!' খেপাটে গলায় বলল হোয়াইট। আমার সঙ্গে বেঈমানী করে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পিরানহা।

‘মুখটা বন্ধ করো, হোয়াইট,’ রানা বলল। ‘কথা যা বলার আমাদের সঙ্গে বলতে হবে তোমাকে।’

রাগী চোখে ওর দিকে তাকাল হোয়াইট। ‘কে তোমরা? কী চাও?’

রানা জবাব দেবার আগেই পিরানহার কুঁড়ে থেকে ত্রস্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল নাদিয়া। কাতর গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘ড. রাজিব আবরার কোথায়? কী করেছ তুমি ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে?’

উত্তর না দিয়ে এবার মেয়েটার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল হোয়াইট, যেন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ফেলবে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, লোকটা কিছু বলছে না দেখে রানা বলল, ‘তোমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, মিস্টার। সেটার জবাব দাও।’

‘কোনও প্রশ্নেরই জবাব দেব না আমি,’ উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল হোয়াইট। ‘যা-খুশি করতে পারো, আমি ভয় করি না।’

‘তা-ই নাকি?’ সকৌতুকে বলল অপূর্ব। ‘একটা কান কেটে নিলে কেমন হয়, মাসুদ ভাই? দেখতে কিন্তু খারাপ লাগবে না!’

রসিকতাটায় মনোযোগ নেই নাদিয়ার, কয়েক পা এগিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় রাজিব? জবাব দাও!!’

ওর পিছু পিছু মারিয়াও বেরিয়ে এসেছে পিরানহার কুঁড়ে থেকে। হঠাৎ হেসে উঠল সে। বলল, ‘প্রেমিকের জন্য তোমার যখন এতই টান, তা হলে তো দুজনের দেখা করিয়ে দিতেই হয়!’

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল নাদিয়া। কথাটার মানে বুঝতে পারছে না।

ব্যাখ্যা করার ঝামেলায় গেল না, হোয়াইটের দিকে তাকাল মারিয়া গোমেজ। হাসিমুখে বলল, ‘ওদের আটক করতে পারেন, সেনিয়র, হোয়াইট। কারও অস্ত্র থেকে একটা গুলিও বেরুবে না।’

কুৎসিত একটা হাসি ফুটল হোয়াইটের ঠোঁটে, হাতের পিস্তলটা তুলে তাক করল সে রানার দিকে। অন্যান্য দুর্বৃত্তরাও বাকি তিন বিসিআই এজেন্টের দিকে অস্ত্র তুলল।

ফায়ার করার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে শুধু একটা ক্লিক শব্দ হলো। জুলফিকার, তৌহিদ আর অপূর্বের অস্ত্রেরও একই অবস্থা। সবারটাই অচল হয়ে পড়েছে।

টান দিয়ে নাদিয়াকে নিজের সামনে নিয়ে এল হোয়াইট, ওর মাথায় পিস্তল ঠকিয়ে বলল, 'ড্রপ আর্মস! নইলে এখুনি এই মেয়ের লাশ পড়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ফেলে দিল মেশিনগান -হাতে রেখে লাভও নেই, এ-মুহূর্তে ওটা স্রেফ একটা লোহার টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়। বাকিদেরও অস্ত্র নামিয়ে রাখতে ইশারা করল ও। নির্দেশ পেয়ে সবার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিল হোয়াইটের লোকজন, সবাই নিরস্ত্র হতেই ধাক্কা দিয়ে নাদিয়াকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল লোকটা।

মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'সবগুলোর ফায়ারিং পিন খুলে নিয়েছ, না? কখন করলে কাজটা?'

'নাদিয়ার মত আনাড়ি একজনকে পাহারার দায়িত্ব দেয়া মোটেই উচিত হয়নি তোমাদের' হাসল মারিয়া। 'মাত্র এক ঘণ্টা ডিউটি করেছে ও, তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটই ঝিমিয়েছে। কাজটা যে-কারও জন্যেই ছেলেখেলা ছিল।'

অপরাধীর ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল নাদিয়া। 'সরি, মাসুদ ভাই, আমার ভুল...'

'ইটস ওকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'তোমার চেয়ে অনেক বড় ভুল করেছে ও -আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

পাশার ছক উল্টে যেতে দেখে পিরানহার মধ্যে আবার আগের আত্মবিশ্বাসী ভাবটা ফিরে এসেছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনে এগিয়ে এসে পড়ে থাকা

বিসিআই টিমের অস্ত্রগুলো তুলে নিল সে। তারপর বলল, ‘এবার মজা টের পাবে তোমরা, বাছারা। তোমাদের সবক’টা হাড্ডি ভেঙে গুঁড়ো করব আমি।’

বোঝা গেল এ প্রস্তাবে হোয়াইট রাজি নয়। গভীরভাবে কী যেন ভাবছিল সে, পিরানহার কথাটা কানে যেতেই সচকিত হয়ে বলল, ‘এদেরকে তোমার হাতে দিচ্ছি না আমি, মোটকু। যাও, বেঁধে বার্জে তোলার ব্যবস্থা করো।’

‘নিয়ে যাবেন কেন?’ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল পিরানহা। ফালতু ঝামেলা এরা, এখানেই মাটিচাপা দিলে...’

‘সেটা আমি বুঝব,’ বিরক্তি প্রকাশ পেল হোয়াইটের কণ্ঠে। তোমাকে এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।’

‘নেবেন তো নিন,’ মারিয়া বলল। কিন্তু আমার বার্জে কেন?’

‘আমার বোট ছোট, সবাইকে নেয়া যাবে না,’ ধমকের সুরে বলল হোয়াইট।

‘তা ছাড়া তুমি তো ওদিকেই যাবে, তাই না? এদেরকে আমার ক্যাম্পে নামিয়ে দিয়ে জায়গামত সমস্ত সাপ্লাইও দিয়ে আসতে পারবে। আসতে হবে না তোমাকে এদিকে।’

‘আরেকটা ট্রিপ আমাকে দিতেই হবে,’ মারিয়া বলল।

‘মানে! এটাই তো তোমার শেষ ট্রিপ।’

‘হত, যদি এই বিদেশিরা সমস্ত মাল লোড হবার আগেই বার্জটা হাইজ্যাক না করত।’

এলএমজিগুলোর দিকে তাকাল হোয়াইট, তারপর হাত বাড়াল মারিয়ার দিকে। ফায়ারিং পিনগুলো দাও।’

‘ওগুলো খুলে ফেলে দিয়েছি জঙ্গলে,’ বলল মারিয়া। ‘কোনটা কোথায় পড়েছে কে জানে! এখন ও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।’

ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবল হোয়াইট, তারপর ফিরে গেল আগের প্রসঙ্গে। ‘বাড়তি ট্রিপের জন্যে কি বাড়তি ভাড়াও দিতে হবে?’

‘অবশ্যই,’ মারিয়া বলল। ‘বিনে পয়সায় সার্ভিস দিতে যাব কেন আমি?’

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ব্যাপারটা হোয়াইটের পছন্দ হচ্ছে না। কড়া গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, মাঝখান থেকে নাক গলাল পিরানহা। তেলমারা ভঙ্গিতে বলল, ‘একটা মাত্র ট্রিপে আপনার মত লোকের কী এমন এসে যাবে, সেনিয়র? বন্ধুত্বের খাতিরে সামান্য ক’টা টাকা নাহয় বেশিই দিলেন। যতকিছুই হোক, এই মেয়েটা কিন্তু চমৎকার কাজ দেখিয়েছে।’

‘তার মানে এই নয় যে, আমার পকেট মেরে ইচ্ছেমত টাকা লুটতে পারবে ও।’

‘যেভাবে খুশি ভাবতে পারেন ব্যাপারটা,’ কাঁধ ঝাকিয়ে বলল মারিয়া। ‘তবে আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় নেই আপনার, সেনিয়র।’

রাগে চোখদুটো জ্বলে উঠল হোয়াইটের, একটা মেয়ে তার মুখের উপর কথা বলবে -এটা সে মানতে রাজি নয়। এগিয়ে গিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মারিয়ার গালে প্রচণ্ড এক চড় কষাল সে। অতর্কিত আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল। হতভম্ব মারিয়া।

‘আর কখনও আমার উপর দিয়ে কথা বলতে আসবি না, খবরদার!’ হিসিয়ে উঠে বলল হোয়াইট।

মারিয়া কিছু বলতে পারল না, ঘটনার আকস্মিকতায় পিরানহাও স্তম্ভিত - হোয়াইট রাগী ভঙ্গিতে ওর দিকে ফিরতেই সভয়ে পিছিয়ে গেল।

বিসিআই টিমের সদস্যদের দড়ি দিয়ে বাঁধছে হোয়াইটের লোকেরা -ওরাও দেখল ঘটনাটা। পাশ থেকে ফিসফিস করে জুলফিকার রানাকে বলল, ‘ব্যাপারটা দেখলেন, মাসুদ ভাই? ব্যাটা নিজের পার্টনারের গায়ে হাত তুলল!’

‘হুম,’ হালকা গলায় বলল রানা। ‘পার্টনারশিপের সংজ্ঞা ওদের কাছে অন্যরকম দেখা যাচ্ছে।’

মাথা ঝাঁকি দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করল মারিয়া, উঠে দাঁড়াল মাটি ছেড়ে। হোয়াইটের চড়ে টকটকে লাল হয়ে গেছে ওর গাল, ঠোঁটের কোনা বেয়ে বেরিয়ে এসেছে রক্তের একটা সরু ধারা। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রক্তটুকু মুছল মেয়েটা, চরম অপমানে মাথায় আগুন জ্বলছে ওর, ছুরিটা বের করে আনার জন্য কোমরের দিকে যাচ্ছিল, ওর হাত... কিন্তু থমকে গেল মাঝপথে। পিরানহা ইশারায় ওকে নিষেধ করছে, কারণটা পরিস্কার -হোয়াইটের হাতের পিস্তল এখন সরাসরি মারিয়ার বুকের দিকে ধরা। নিঃশব্দে হাতটা সরিয়ে নিল মারিয়া, হার স্বীকার করছে।

ব্যাপারটা লক্ষ করে বিজয়ীর হাসি দেখা দিল হোয়াইটের মুখে। সিদ্ধান্ত জানানোর ভঙ্গিতে সে বলল, ‘বন্দি আর কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালের সাপ্লাই জায়গামত পৌঁছে দেবে তুমি, গোমেজ! যত ট্রিপই লাগুক না কেন! আর হ্যাঁ, এর জন্য বাড়তি একটা পয়সাও পাবে না, বোঝা গেছে?’

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না মারিয়া, মাথা নিচু করে সরে গেল সামনে থেকে -কাঁচা রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছে ডকের দিকে।

‘কাজটা ঠিক হলো না, সেনিয়র,’ মাথা নেড়ে বলল পিরানহা। এখন আর হাসছে না সে। এমন ব্যবহার করলেন... অথচ মেয়েটা না থাকলে আমরাই এখন বন্দি হয়ে থাকতাম।’

‘মেয়েটার কারণেই যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা ভাবছ না কেন? পাল্টা যুক্তি দেখাল হোয়াইট। ‘ও যদি সাহায্য না করত, তা হলে এই বিদেশিরা পৌছুতে পারত এখান পর্যন্ত?’

‘তারপরেও... ইচ্ছে করে তো আর অর্ধেক কার্গো ফেলে আসেনি। বাড়তি একটা ট্রিপে...’

‘ট্রিপ দিতে গিয়ে আমার গোটা অপারেশনটাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে ও, বলল হোয়াইট। রানাদের দেখাল সে। ‘এদের জন্যে যে পিছনে কেউ অপেক্ষা করছে না, সেটা শিয়োর হব কী করে? যদি সত্যিই থাকে, তা হলে গোমেজকে নাগালে পেলে সব কথা জেনে ফেলবে না?’

‘জানলেও কিছু যায় আসে না,’ পিরানহা বলল। ‘কী ধরনের হামলা ঠেকাতে হবে, সেটা তো বুঝতে পেরেছি। যত অস্ত্রশস্ত্রই নিয়ে আসুক, এবার ঠিকই ঠেকিয়ে দিতে পারব।’

‘সেজন্যে মন্টে অ্যালেগ্রায় গিয়ে ঢোল পেটাতে হবে নাকি?’

‘তা বলছি না। কিন্তু মেয়েটা বড় একরোখা, ওর গায়ে হাত তোলাটা ঠিক হয়নি। সুযোগ পেলে ঠিকই প্রতিশোধ নেবে ও।’

‘সেই সুযোগ কোনোদিন পাবে না ও,’ শান্তস্বরে বলল হোয়াইট। ‘কার্গোর এই শেষ চালানটা এসে গেলে ওর প্রয়োজন ফুরোবে আমার কাছে।’

কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না দস্যুসর্দার সঙ্গে সঙ্গে। যখন পারল, তখন চোখদুটো বড় হয়ে গেল তার। অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি চাইছেন, আমি ওকে খুন করি?’

‘তোমাকে কিছুই করতে হবে না, নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল হোয়াইট। ‘মেয়েটা আমার।’

বিসিআই টিম আর নাদিয়াকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে হোয়াইট বলল, ‘নিয়ে চলো ওদের।’

বারো

উজানের পথে এগিয়ে চলেছে মারিয়া গোমেজের বার্জ, ওটাকে সামনে থেকে পথ দেখাচ্ছে হোয়াইটের ছোট্ট মোটর-লঞ্চ। হুইলের পিছনে দাঁড়িয়ে স্বস্তি বোধ করছে মারিয়া। ইঞ্জিনের গুমগুম শব্দ আর পায়ের নীচের মৃদু কাপুনিতে খানিক আগের অপমানজনক ঘটনাটা প্রায় ভুলেই গেছে ও। পুরো মনোযোগ এখন বার্জ চালানোর দিকে। উজানের অনেক জায়গা অগভীর।

আপার ডেকের মাঝামাঝি জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছে রানাদেরকে। হোয়াইটের দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে ওদের। লোকগুলো রুক্ষ প্রকৃতির, দাড়ানোর ভঙ্গিতে প্রশিক্ষণের ছাপ রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, বন্দিদের ব্যাপারে সামান্যতম ঢিলেমি নেই। সতর্ক রয়েছে ওরা যে-কোনও পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য। বাজিয়ে দেখার জন্য একটা সিগারেট চেয়েছিল রানা, কিন্তু প্রত্যুত্তরে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়েছে দুই পাহারাদার যে, বোঝাই গেছে -এদের সঙ্গে একটু এদিক-ওদিক করা ঠিক হবে না।

বিপদের প্রকৃতিটা বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না রানার। প্রতিপক্ষ হিসেবে পিরানহা বা তার দলকে খুব একটা বড় করে দেখেনি ও, বাস্তবেও বোঝা গেছে -অভিজ্ঞ চার বিসিআই এজেন্টের বিরুদ্ধে নদীর ডাকাতেরা আসলে কিছুই নয়। কিন্তু এই হোয়াইট লোকটা সমস্ত হিসেব গোলমাল করে দিচ্ছে। আনাড়ি কোনও দুবৃত্ত নয় সে, কথাবার্তা-চালচলনে উঁচুদরের সন্ত্রাসীর ছাপ পাওয়া যায়। সঙ্গের লোকগুলোও প্রশিক্ষিত সৈনিকের মত। কে এরা, বুঝতে পারছে না ও। ইংরেজিতে কথা বলছে হোয়াইট, তবে উচ্চারণটা ইংরেজ বা অ্যামেরিকানদের মত নয়। সূক্ষ্ম একটা টান রয়েছে... সম্ভবত ইয়োরোপীয়। রানার কাছে তাকে পূর্ব ইয়োরোপের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে হোয়াইট নামটা ভুয়া হবার কথা। নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য নিশ্চয়ই নেয়া

হয়েছে নামটা। নদীর উজানে কী ধরনের অপারেশন চালাচ্ছে লোকটা -তার কিছুই অনুমান করা যাচ্ছে না। এটুকু পরিষ্কার -কাজটা যা-ই হোক, ছোটখাট কিছু নয়। নইলে এত গোপনীয়তা অবলম্বনের প্রয়োজন হত না।

চেহারায় চিন্তাভাবনা বা দুশ্চিন্তার কোনও ছাপ অবশ্য ফুটতে দিল না রানা। দলনেতা হিসেবে সবার মনোবল চাঙ্গা রাখাটা ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, তাই মাঝে মাঝেই বাকিদের দিকে তাকিয়ে অভয় দিতে হচ্ছে ওকে। মাসুদ ভাইয়ের উপর অগাধ আস্থা আছে তিন বিসিআই এজেন্টের, তাই স্বাভাবিক রয়েছে ওরা; কিন্তু নাদিয়ার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। জীবনে এই প্রথম এ-ধরনের বিপদে পড়েছে মেয়েটা, ভয়ে মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে; নিচু গলায় ওকে মাঝে মাঝে মনোবল জোগাতে চেষ্টা করছে অন্যেরা, কিন্তু বন্দি সঙ্গীদের সেসব আশ্বাসবাণী বিফলে যাচ্ছে।

পরিস্থিতিটা অনুধাবন করতে অবশ্য জুলফিকারেরও অসুবিধে হচ্ছে না। তাই ও খানিক পরে জিজ্ঞেস করল, 'আশা করি নতুন কোনও প্ল্যান আঁটছেন, মাসুদ ভাই?'

অবাক হবার ভান করল রানা। 'নতুন প্ল্যান আঁটব কেন? পুরনোটাই তো আছে!'

'এখনও, আগের প্ল্যান ফলো করবেন?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল জুলফিকার।

'কোন প্ল্যানের কথা বলছেন?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল নাদিয়া।

'রাজিবকে খুঁজে বের করারটা... আবার কোনটা!'

অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল নাদিয়া কয়েক সেকেণ্ড। 'এদের হাতে ধরা পড়াটাকে প্ল্যানের অংশ বলছেন?'

'ওটা সামান্য হিসেবের গরমিল। তবে এণ্ড-রেযাল্ট কিন্তু একই হতে যাচ্ছে। রাজিবের কাছে যেতে পারছি আমরা, তাই না? বন্দি হিসেবে যাচ্ছি

নাকি বিজয়ীর বেশে যাচ্ছি -তাতে কী? রাজিবের খোঁজ পাওয়াটাই ছিল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, সেটা তো সফল হচ্ছে। সবকিছু প্ল্যান মোতাবেক এগোচ্ছে বললে কি ভুল বলা হবে?'

ভুরু কোঁচকাল নাদিয়া। 'ভালই যুক্তি দেখাচ্ছেন। কিন্তু কথার মারপ্যাঁচে কি আমাদের মুক্ত করতে পারবেন?'

'সময় এলেই দেখতে পাবে,' বলল রানা।

ভোররাতে স্রোত ঠেলে এসেছে হোয়াইট, তাই সময় লেগেছে বেশি। কিন্তু এখন জোয়ার চলছে, উজানের দিকে বেশ দ্রুতই ছুটছে জলযানদুটো, ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেল। সামনে হঠাৎ বাঁক নিল লঞ্চটা, ওটার পিছু পিছু নদীর তীরে এসে বিচ করল বার্জটা।

একটা গ্যাং-প্ল্যাঙ্ক ফেলা হলো, সেটা ধরে লোকজন নিয়ে উঠে এল। হোয়াইট -বন্দিদের নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। পিঠে রাইফেলের নলের খোঁচা খেয়ে উঠে দাঁড়াল বন্দিরা, গ্যাং-প্ল্যাঙ্ক ব্যবহার করতে দেয়া হলো না ওদের, বার্জের কিনারা থেকে সরাসরি নামানো হলো অগভীর পানিতে। ছপ ছপ করে পানি ভেঙে ডাঙায় উঠল ওরা, তারপর সশস্ত্র প্রহরায় হাঁটতে শুরু করল হোয়াইটের ক্যাম্প-কম্পাউণ্ডের দিকে।

হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এসে বন্দিদের নিয়ে যাওয়া দেখছিল মারিয়া, তার সামনে এসে দাঁড়াল হোয়াইট। বিষ মেশানো দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল ও, বদমাশটার উপস্থিতি একেবারেই সহ্য করতে পারছে না।

'উজানে চলে যাও,' বলল হোয়াইট। 'সমস্ত মাল আনলোড করে আবার ফিরে যাবে পিরানহার গ্রামে, আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি ওখানে। ঠিক আছে?'

হিসিয়ে উঠে, মারিয়া বলল, 'ওখানে যা ঘটেছে, তা আমি ভুলব না, সেনিয়র।'

কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না হোয়াইটের ভিতর। দৃষ্টিটা বরফের মত শীতল, নীরস গলায় বলল, 'শুনে খুশি হলাম। ভাল স্মৃতিশক্তিওয়ালা মেয়েই আমার পছন্দ।' গোড়ালিতে ভর দিয়ে উল্টো ঘুরল লোকটা, গটমট করে হেঁটে নেমে গেল বার্জ থেকে।

তীরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন এগিয়ে এল, ঠেলে বার্জটাকে আবার গভীর পানিতে নামিয়ে দিল তারা। গ্যাং-প্ল্যাঙ্কটা তুলে ফেলা হয়েছে ইতিমধ্যে, ইঞ্জিনের পাওয়ার বাড়িয়ে দিল মারিয়া। প্রচণ্ড আওয়াজে চারপাশ কাঁপিয়ে চলে গেল বার্জ।

ক্যাম্পের সামনের খোলা জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে রানাদের। নাদিয়াকে দেখে মনে হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নয় ও, ক্যাম্পটাতে পৌঁছুতেই গলা চড়িয়ে রাজিবকে ডাকতে শুরু করেছে।

'রাজিব! রাজিব!!'

খোলা জায়গাটা থেকে সামান্য দূরে রয়েছে রাজিব আবরার আধা-সচেতন, শারীরিক কষ্ট সহ্য করে ছোট ছোট শ্বাস ফেলছে। অতি-পরিচিত কণ্ঠটা শুনে সচকিত হয়ে উঠল ও। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে সোজা হলো, প্রায় বুজে যাওয়া চোখদুটো মেলে তাকাল উঠানের দিকে। স্বপ্ন দেখছে না তো! আদৌ কি বেঁচে আছে ও? সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সারা মুখে লেগে থাকা শুকনো রক্ত আর ধুলোবালি পরিষ্কার করল। একটু চেষ্টা করতেই মনে পড়ে গেল সব। হোয়াইট! সে আর তার লোকেরা মিলে অত্যাচার চালিয়েছে ওর উপর, তারপর চ্যাংদোলা করে তুলে এনে ছুঁড়ে ফেলেছে কাঠের তৈরি একটা খাঁচার ভিতর।

ভাল করে তাকাল রাজিব, কিন্তু সবকিছু ধোঁয়াটে মনে হলো ওর কাছে। কয়েকজন মানুষ এগিয়ে আসছে খাঁচার দিকে, কিন্তু তাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছে না। খাঁচার পাশে দাড়িয়ে থাকা দুজন প্রহরী হেসে উঠল ওর অবস্থা

দেখে -এদের একজন হচ্ছে মার্কোস, মন্টে অ্যালেগ্রার বারে এর সঙ্গে আগেই সাক্ষাৎ হয়েছে রানাদের।

খেদিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে বিসিআই টিমকে। দূর থেকেই বন্দিশালাটা দেখতে পেল ওরা -মোট তিনটে খাঁচা; একটায় রাজিব, অন্যদুটোয় রাখা হয়েছে রিভার-গাইড জিকো আর তার শ্যালক মাসাপাকে। গরাদের ফাঁক দিয়ে রাজিবকে দেখতে পেল নাদিয়া।

'হায় খোদা! রাজিব!! এ কী অবস্থা তোমার!' বলার ভঙ্গিতে মনের মানুষের কষ্ট দেখে বুক ভেঙে যাওয়া বেদনা, সেই সঙ্গে মানুষটা বেঁচে আছে দেখে রাজ্যের স্বস্তি মিশে আছে।

দৌড় দিল নাদিয়া। এতক্ষণে রাজিব বুঝতে পারল -স্বপ্ন দেখছে না সে। ছুটে আসতে থাকা মেয়েটা সত্যিই ওর নাদিয়া। খাঁচার গরাদগুলো খামচে ধরে। কষ্টেসৃষ্টে সোজা হলো ও, হাতদুটো মেলে ধরল বাইরে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল মার্কোস আর তার সঙ্গী, ঝট করে প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝখানে চলে এল তারা, দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করেছে। থামার আগেই ওদের গায়ের উপর এসে পড়ল মেয়েটা।

'এসো সুন্দরী!' ময়লা দাঁত বের করে খিকখিক করে হেসে উঠল মার্কোস।

খপ করে নদিয়ার কোমর আঁকড়ে ধরল সে, আলগোছে তুলে ফেলল মাটি থেকে। চেঁচিয়ে উঠল নাদিয়া, বেয়াড়া লোকটার নাকে-মুখে দমাদ্দম কিল মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। লাভ হলো না তাতে, মার্কোস আর তার সঙ্গীর হাসি কয়েকগুন বেড়ে গেল বরং। ছাড়া পাবার জন্য মোচড়ামুচড়ি শুরু করেছে নাদিয়া, কিন্তু ওকে ছাড়ল না বদমাশটা, বজ্র-আঁটুনিতে ধরে রাখল।

'ছাড়ো ওকে!'

চাবুকের মত সপাং করে উঠল রানার গলা। থতমত খেয়ে গেল মার্কোস, হাতের বাঁধনে ঢিল পড়ল অজান্তেই। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নাদিয়া

এই সুযোগে, দুই প্রহরীকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল রাজিবের দিকে। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে নাদিয়াকে আঁকড়ে ধরল বন্দি রাজিব, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'আল্লাহ! এ কী হয়েছে তোমার!' চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়াতে শুরু করেছে নাদিয়ার।

দৃশ্যটা একনজর দেখে নিয়ে বাকিদের দিকে ফিরল মার্কোস। রানা আর ওর সঙ্গীদের চিনতে পেরে হাসি ফুটল লোকটার মুখে। বিদ্রুপের সুরে বলল, 'বাহ! দেখো কারা এখানে পায়ের ধুলো দিতে এসেছে।'

'হাই, মার্কোস!' বলল রানা। 'গায়ের ব্যথাটা কমেছে?'

হাসি মুছে গিয়ে চোখদুটো জ্বলে উঠল মার্কোসের। 'আমার কাছে তোমার কিছু পাওনা রয়েছে, সেনিয়র।'

'ভুলে যাও' হাত নড়ল রানা। 'মাটিতে যেভাবে গড়াগড়ি খেয়েছ গতকাল, সেটা দেখে সমস্ত দেনা মাফ করে দিয়েছি আমি।' লোকটাকে খেপিয়ে তুলতে চাইছে রানা।

অপমানটা সহ্য করতে পারল না বুনো ষাঁড়, এগিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা ঘুসি ঝাড়ল রানার চোয়াল লক্ষ্য করে। চোখে আঁধার দেখল রানা, দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

পা তুলেছিল মার্কোস রানার মুখে লাথি মারবে বলে, কিন্তু পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল হোয়াইট। 'থামো!'

'এই ব্যাটাকে ছাড়ব না আমি, বস...' বলতে শুরু করেছিল মার্কোস, কিন্তু থেমে গেল মাঝপথে। হোয়াইটের চোখ থেকে আগুন ঝরছে।

'ওকে আমার জ্যান্ত দরকার,' বলল হোয়াইট। '...অন্তত এই মুহূর্তে।'

মাথা ঝাড়া দিয়ে ব্যথাটা সয়ে নিল রানা, তারপর কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল। দুই প্রহরীকে খাঁচার দরজা খুলতে ইঙ্গিত করল হোয়াইট, তারপর বন্দিদের

দিকে তাকিয়ে বলল, যাও ঢুকে পড়ো ওখানে। খুব শীঘ্রি মরবে তোমরা, তাঁর আগে কিছুটা সময় দিচ্ছি, যাতে সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা-টমা যা চাইবার চেয়ে নিতে পারো। নিশ্চিত থাকো, মরণটা খুব বিশ্রীভাবে হবে তোমাদের।'

একটুও ভাবান্তর হলো না রানার মধ্যে। বলল, 'ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, হোয়াইট। এমন কিছু তোমার পক্ষে ভেবে বের করা সম্ভব নয়, যা আমি বা আমার লোকেরা আগে কোথাও মোকাবেলা করিনি।'

হালকা একটা হাসি ফুটল হোয়াইটের ঠোঁটের কোণে। হাত তুলে আর্কিয়োলজিস্ট-জুটিকে দেখাল। 'ওরাও কি সেসব মোকাবেলা করেছে?' জবাবের অপেক্ষা করল না লোকটা, বলল, 'আমার তো মনে হয় না। তোমাদের মরণ ওদের বুক কাঁপিয়ে দেবে, মিস্টার!'

পরস্পরকে ধরে নীরবে চোখের পানি ফেলছে প্রেমিক-প্রেমিকা, হোয়াইটের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল রানা। 'ওদের নিয়ে কী করবে তুমি, হোয়াইট?'

'একসঙ্গে ওদেরকে কিছুটা সময় কাটাতে দেব আমি, যাতে একজনের জন্য অন্যজনের টানটা আরও বাড়ে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল হোয়াইট। 'তারপর মেয়েটাকে কেড়ে নেব আমি; টর্চার... প্রয়োজনে রেপ করব উঠানে ফেলে। দেখব, রাজিব আবরার এরপরও মুখ বন্ধ রাখতে পারে কি না। আমি যা জানতে চাই, সব ওকে বলতেই হবে।'

লোকটার কথাবার্তা শুনে আগুন জ্বলছে রানার মাথায়, চেহারাটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। শীতল গলায় বলল, 'বুদ্ধিমান হলে তুমি এখুনি আমাদের ছেড়ে দেবে, হোয়াইট! আমরাও সব ভুলে যাব সেক্ষেত্রে।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল হোয়াইট। 'হুমকি দিচ্ছ মনে হচ্ছে?'

'না, সুযোগ দিচ্ছি... বাঁচার সুযোগ।'

রানার কণ্ঠে এমন কিছু রয়েছে, যেটা কাঁপিয়ে দিল লোকটার বুক। কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল হোয়াইট, কিছু বলতে পারল না। তারপর প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে নীরবে শুধু বন্দিদের খাচায় ঢোকাতে ইশারা করল। একে একে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সবাইকে রাজিবের খাঁচায় পোরা হলো।

দরজায় তালা লাগানো হতেই উল্টো ঘুরল হোয়াইট, নিজের তাঁবুর দিকে যাচ্ছে। পিছন থেকে এগিয়ে গেল মার্কোস। দাবি করার সুরে বলল, 'বস, পালের গোদাটাকে আমার চাই!'

'না,' গম্ভীর গলায় বলল হোয়াইট। 'ওর ব্যবস্থা আমি করব।'

নিষ্ফল আক্রোশে বিড়বিড় করে গাল দিয়ে উঠল মার্কোস। আরও কিছুদূর গেল সে হোয়াইটের পিছু নিয়ে -কী কথা হলো ওদের মধ্যে বোঝা গেল না দূর থেকে।

তেরো

কাঠের তৈরি খাঁচাগুলোকে কোনভাবেই মানুষের বসবাসযোগ্য বলা চলে না। ছ'জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্য যথেষ্ট জায়গা নেই ভিতরে। তার ওপর চারপাশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে ভরদুপুরের কড়া রোদ, কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠল। গায়ে গা লাগিয়ে বসে দরদর করে ঘামতে শুরু করল ছয় বন্দি, নড়াচড়ার অভাবে হাত-পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে, তার উপর কেন কে জানে, শরীরের এখানে-সেখানে শুরু হয়েছে চুলকানি।

অবশ্য এত অসুবিধের পরেও কেউ অভিযোগ করছে না। বিসিআইয়ের কঠোর ট্রেনিঙের বদৌলতে রানা, জুলফিকার, তৌহিদ আর অপূর্ব স্বাভাবিক

রয়েছে; রাজিব-নাদিয়াও অনেকদিন পর পরস্পরকে কাছে পেয়ে যেন সব কষ্ট ভুলে গেছে।

খাঁচায় ঢোকার পর পরই সবার সঙ্গে রাজিবের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নাদিয়া, অপূর্ব ছাড়া অন্য সবার হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে রাজিব। রানা বারণ অনায় অপূর্বর বাঁধন খোলা হয়নি। এই বারণের ব্যাপারে কাউকে কোনও কারণও দর্শায়নি ও, শুধু বলেছেঃ দেখা যাক না, কী হয়!

এরপর অনেকক্ষণ আর কোনও কথা হয়নি ওদের মধ্যে। কিন্তু এক পর্যায়ে নীরবতাটা অসহ্য হয়ে ওঠায় মুখ খুলল রানা। রাজিবকে বলল, 'আপনার অবস্থা...'

বাধা দিয়ে রাজিব বলল, 'আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত, মি. রানা, আমাকে তুমি করে বললে খুশি হব।'

'তা হলে আমাকেও মিস্টার বলা চলবে না। শুধু মাসুদ ভাই বলতে হবে।'

'আমি রাজি।'

'ঠিক আছে, এখন বলো -তোমার এ-অবস্থা কেন?'

'হোয়াইট হারামজাদার কারণে,' তিক্ত গলায় বলল রাজিব। 'হারানো শহরটার খোঁজ চাইছে ও, আমি বলতে রাজি হইনি। সেজন্যেই নিয়মিত অকথ্য নির্যাতন করছে।'

'তারপরেও বলোনি?' নাদিয়া অবাক।

'বললেই ওর কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত, খুন করতে বাধা থাকত আর।'

'ও!'

'কিন্তু এভাবে এখানে ছুটে আসাটা একদমই উচিত হয়নি তোমার, নাদিয়া। নিজে তো বিপদে পড়েইছ, সঙ্গের সবাইকেও ফেলেছ ভয়ঙ্কর ঝামেলায়।'

‘কিন্তু তুমি কিডন্যাপ হয়েছ জেনেও আমি চুপচাপ বসে থাকি কী করে? তবে এটা ঠিক, ওঁদেরকে টেনে এনে...’

‘আমাদের নিয়ে ভেবো না,’ রানা বলল। ‘এ-ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের। শুধু একটা সুযোগ পেতে দাও... তা যত ছোটই হোক না কেন, ঠিকই সবাইকে মুক্ত করে নিয়ে বেরিয়ে যাব।’

‘কিন্তু হোয়াইট আর তার দলের লোকেরা অসম্ভব ধূর্ত। আমি তো কয়েকবারই পালাবার চেষ্টা করেছি, লাভ হয়নি। আমার চোখের সামনেই মেরে ফেলেছে তিনজনকে। আপনারা কীভাবে বাঁচবেন বলে ভাবছেন?’

জবাব না দিয়ে সাহস জোগানোর ভঙ্গিতে হাসল রানা। ‘সময় এলেই দেখতে পাবে। ওই প্রসঙ্গ আপাতত বাদ থাকুক, এখন বলো -লস ডেল রিয়োর খোঁজ কি সত্যিই জানো তুমি?’

লোকেশন পিনপয়েন্ট করে বলতে পারব না, তবে কোন এলাকায় পাওয়া যাবে -সে-ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা মার্কার থাকবার কথা, সেগুলোকে অনুসরণ করলে অবশ্যই পাওয়া যাবে শহরটা।’

আর্কিয়ালজির প্রতি আগে থেকেই প্রবল ঝোঁক রয়েছে রানার, তাই শহরটার ব্যাপারে কিছু কিছু তথ্য জানা আছে ওর। তবে বাকি তিন বিসিআই। এজেন্ট একেবারেই অজ্ঞ, তাই ওদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ করে লস ডেল রিয়ো সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা লেকচার দিয়ে ফেলল রাজিব। জানা গেল -ইনকা সভ্যতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কেন্দ্র ছিল ওটা। গল্পগাথা অনুসারে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে ওটা। সত্যিই যদি সেসব অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করা যায়, তা হলে সেটা গত একশো বছরের অন্যতম একটা আবিষ্কার হবে। এসব ধনসম্পদের সামনে ফারাও সম্রাট তুতেনখামেনের গুপ্তধনও কিছু নয়।

গল্পটা শুনতে শুনতে উত্তেজনা অনুভব করল সবাই। তৌহিদ বলল, ‘বলেন কী! এত ধনসম্পদ আছে ওখানে?’

‘কিংবদন্তি তো তা-ই বলে,’ মাথা ঝাঁকাল রাজিব।

‘হুঁ, এজন্যেই হোয়াইট ওঁকে এভাবে আটকে রেখেছে, মাসুদ ভাই,’ মন্তব্য করল অপূর্ব।

‘হয়তো,’ রানা স্বীকার করল। তারপরেও নদীর উজানে মারিয়া গোমেজ বার্জে করে মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে কেন -সেটা পরিষ্কার হচ্ছে না। পিরানহার কাছ থেকে যাদেরকে কিনে আনছে হোয়াইট, তারাই বা কোথায়?’

‘রাজিবের আশায় না থেকে লোকটা নিজেই শহরটা খুঁজে বেড়াচ্ছে হয়তো,’ নিজের ধারণাটা জানাল নাদিয়া। ‘ম্যাপ-ট্যাপ না থাকলে বিরাট একটা এলাকা কাভার করতে হবে তাকে। লোকবল আর লজিস্টিক সাপ্লাই সেজন্যেই। লাগছে হয়তো।’

‘উঁহুঁ,’ মাথা নাড়ল জুলফিকার। বার্জে কোনও লজিস্টিক সাপ্লাই ছিল না, আমি গতকালই কয়েকটা বাক্স খুলে দেখেছি। ওগুলো সত্যিই কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল। তবে হোয়াইটের মত লোক আসলেই চার্চ তৈরি করছে বলে বিশ্বাস করি না আমি।’

‘তা হলে ওগুলো কী কাজে লাগছে ওদের?’ বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল নাদিয়া।

‘মনে হচ্ছে জবাবটা আমাদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে,’ বলল রানা, তারপর উঠে দাঁড়াল। ওদেরকে খাঁচায় ঢোকানোর একটু পরেই দলবল নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে হোয়াইট। পুরো ক্যাম্পে এখন বন্দিদের পাহারায় থাকা। দুই গার্ড ছাড়া আর কেউ নেই -একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে ওরা।

ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল একটু রানা, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল মার্কোসের সঙ্গের লোকটাকে। 'এই যে, *অ্যামিগো!* হ্যাঁ... তোমাকেই বলছি।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোকটা। 'কী ব্যাপার?'

'একটা সিগারেট হবে?'

জবাব না দিয়ে একগাল হাসি উপহার দিল লোকটা। অর্থাৎ, দেবে না। আপন মনে সিগারেট টানতে থাকল। আবার ডাকল ওকে রানা।

'একটু দয়া দেখাও, ভাই। সিগারেটের পিপাসায় বুকটা এক্কেবারে শুকিয়ে গেছে আমার।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু মার্কোস বাধা দেয়ায় বের করে আনল খালি হাত।

আধমিনিট বিরতির পর আবার ডাকল রানা।

'এই যে, *অ্যামিগো!* হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি, ওই জানোয়ারটাকে না। শোনো, একটু সাবধানে থেকো, ভাই। ওর গায়ে কিন্তু খুজলি আছে... তোমাকেও ধরতে পারে।'

ঝট্ করে খাঁচার দিকে ফিরল মার্কোস, ভুরু কুঁচকে চোখ পাকালো। খেপে গেছে।

'করছেনটা কী উনি?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল রাজিব।

'সেটা উনিই জানেন,' বলল জুলফিকার । হয়তো রাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। দেখুনই না, কী হয়।'

রানার পাশে উঠে দাঁড়াল অপূর্ব। করুণ গলায় বলল, 'আপনার এই আত্মঘাতী প্ল্যানটা পরে কাজে লাগালে হয় না, মাসুদ ভাই? ইয়ে... মানে, আমি যখন আশপাশে থাকব...?'

জবাব না দিয়ে হাসল রানা। মার্কোসের উদ্দেশে বলল, ‘একটু দূরে দূরে থেকো, মার্কোস। তোমার বন্ধুর কথা জানি না, তবে আমরা কেউই চর্মরোগে আক্রান্ত হতে চাই না।’

খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াল মার্কোস। ‘নাগালের বাইরে থেকে খুব চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলা হচ্ছে, না?’

‘নাগালের ভেতরেও একই ভাবে বলব!’

রাগে ফুঁসতে শুরু করল মার্কোস, পকেটে হাত দিয়ে চাবির গোছা বের করে আনল।

‘না!’ হাত ধরে তাকে থামাবার চেষ্টা করল দ্বিতীয় লোকটা। ‘বস্ নিষেধ করেছে।’

একটু থামল মার্কোস, পরমুহূর্তেই কুটিল হাসি দেখা দিল তার মুখে। বলল, ‘পালের গোদাটার গায়ে হাত তুলতে নিষেধ করেছে বস্, অন্যদের ব্যাপারে কোনও নিষেধ নেই।’ অপূর্বের দিকে তাকাল সে। এটাকেই বের করে আনি না কেন? দেখি, নিজের লোককে মার খেতে দেখলে হারামজাদার কেমন লাগে!’

কপাল চাপড়াল অপূর্ব। ‘হায় হায়। দাঁড়াতে গেলাম কেন, রে ভগবান!’

শয়তানি হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মার্কোস। রানা বলল, ‘খামোকা দাঁত ক্যালাচ্ছ। আমি জানি, কাউকেই পেটানোর সাহস নেই তোমার। খেয়ে খেয়ে হোঁৎকা হয়েছ, জানো শুধু পিট্টি খেয়ে জ্ঞান হারাতে। গতকালকের মার এখনই ভুলে গেলে? আমাদের কারও গায়ে হাত তোলার সাহস আছে তোমার?’

কপট আতঙ্ক ফুটিয়ে ওর দিকে তাকাল অপূর্ব। ‘ও মাসুদ ভাই! করছেটা কী!’

‘ধ্যাত! ভয় পাও কেন?’ শুনিয়ে শুনিয়ে বলল রানা। ‘ও তো একটা নির্বিষ ঢোঁড়া! গতকাল আমার হাতে মার খেয়ে কী রকম চিৎপটাং হলো, দেখোনি? তুমিও পিটিয়ে ওর হাড়গোড় ভেঙে দিতে পারবে।’

মুখ থেকে হাসিটা মুছে গেল মার্কোসের। বিসিআই টিমের চারজনের ভিতরে অপূর্বই সবচেয়ে শুকনো-পটকা, আর এই হাড় জিরজিরে ছেলেই কি না তাকে পিটিয়ে চিৎপটাং করে দেবে! তালা খোলার জন্য এক পা এগোল সে, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গার্ড পিছন থেকে টেনে ধরল তাকে।

‘ফিরে এসো, ফিরে এসো বলছি! বস্ কিন্তু তোমার চামড়া খুলে লবণ মাখিয়ে দেবে।’

আবার থেমে গেল মার্কোস। কয়েক মুহূর্ত রাগী চোখে তাকিয়ে রইল বেয়াড়া লোকগুলোর দিকে, তারপর মুখ খারাপ করে একটা গাল দিয়ে চলে গেল।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ল অপূর্ব। ‘ভগবান বাঁচিয়েছে। ব্যাটা একটা গণ্ডার, আমার হাড়গোড় একটাও আস্ত রাখত না শালা।’

‘এখনও বাঁচোনি,’ নিচু গলায় রানা বলল। ‘বাইরে তোমাকে যেতেই হবে, নইলে প্ল্যানটা মাঠে মারা যাবে। লোকটাকে ঘায়েল করে খাঁচার গায়ে ফেলতে হবে তোমার।’

‘কী!’ আঁৎকে উঠল অপূর্ব।

ওর দিকে আর তাকাল না রানা। গলা চড়িয়ে বলল, 'অ্যাই মার্কোসের বাচ্চা! লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস কেন? তুই দেখছি মেয়েমানুষেরও অধম!'

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল গুণ্ডাটার, সঙ্গীর বারণ শুনল না আর। এক ছুটে, খাঁচার সামনে এসে দরজা খুলল, হিড়হিড় করে টেনে বের করল অপূর্বকে, তারপর আবার লাগিয়ে দিল তালা।

‘সর্বনাশ!’ ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল নাদিয়া।

‘লোকটাকে এভাবে খেপানো কি ঠিক হলো?’ রাজিবও সন্দিহান।

রানার মতলব আঁচ করতে না পেরে চুপ করে থাকল তৌহিদ ও জুলফিকার। ভাবল, এভাবে খেপিয়ে তোলার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।

খাঁচার শিকগুলো আঁকড়ে ধরে সামনে ঝুঁকল সবাই, কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে পুরো ব্যাপারটা দেখবে বলে।

ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে অপূর্ব, নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মার্কোসের হিংস্র চেহারাটা চোখে পড়ল, খেপা ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে লোকটা। তার পেশিবহুল দেহের সঙ্গে নিজেরটা মেলাল ও, পরমুহূর্তেই অজান্তে ঢোঁক গিলল একটা। ওর ভয় টের পেয়ে গেল মার্কোস, তাতে সাহস বাড়ল আরও।

‘কাম অন, অপূর্ব।’ উৎসাহ দেয়ার সুরে বলল রানা। ‘চিন্তার কিছু নেই, দুহাত বেঁধে দিলেও ব্যাটাকে প্যাঁদাতে অসুবিধে হবে না তোমার।’

‘ঠাট্টা করছেন নাকি?’ তিক্ত গলায় বলল অপূর্ব। ‘গরিলার সঙ্গে যুদ্ধ করব... তা-ও হাত বাঁধা অবস্থায়!’

কথাটা শোনামাত্র কোমর থেকে ছোরা বের করে ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল লোকটা অপূর্বর হাতের বাঁধন। ছোরাটা খাপে গুঁজে রেখে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

আবার মার্কোসকে ভাল করে দেখল অপূর্ব। বিশাল লোকটা: গণ্ডারের ঘাড়, চেতানো বুকের ছাতি, চ্যাপ্টা পেট -এক কথায় সুঠাম; হাতদুটো যেন ভীমের গদা, পেশিগুলো কিলবিল করছে গোটা শরীরে। গরিলাই বটে! ওর তুলনায় কমপক্ষে ইঞ্চিদুয়েক খাটো অপূর্ব, ওজনও আধমণ কম: একহারা গড়ন, কোমরের কাছে সরু, এই শরীরে দ্রুত নড়াচড়া করা সম্ভব; তবে লড়াই জেতার জন্য সেটা যথেষ্ট কি না, বলা কঠিন। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঠোঁট চাটতে চাটতে সামনে এগোল মার্কোস, হাসছে, শয়তানি খেলা করছে ধূসর চোখে।

একটুও তাড়াহুড়ো করল না লোকটা, হাসি মুখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল প্রতিপক্ষের দিকে। দু'পা ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে অপূর্ব। মার্কোস কাছে আসতেই আচমকা ঝলসে উঠল ওর বাম হাত। ঘুসি খেয়ে একটু যেন টলে উঠল মার্কোস, পিছিয়ে গেল, চোখজোড়া কুঁচকে উঠল তার। পরমুহূর্তে মাথা নিচু করে খ্যাপা ষাঁড়ের মত গুঁতো মারার ভঙ্গিতে তেড়ে এল সে -শরীরের তুলনায় অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র লোকটা। হঠাৎ লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল সে, জোড়াপায়ে লাথি হাকাল অপূর্বর উদ্দেশে।

এক লাফে পিছনে সরে যাবার চেষ্টা করল অপূর্ব, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। লাথির ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, ব্যথায় ককিয়ে উঠল। পরমুহূর্তে আবার লাফ দিল মার্কোস, ভূপাতিত অপূর্বর উপর শরীরের সব ভর নিয়ে পড়ল সে, সেই সঙ্গে ডান হাতে ঘুসি হাঁকাল, অপূর্বর চিবুকে লাগল প্রচণ্ড আঘাতটা। চোখে সর্ষেফুল দেখল ও, দুভাঁজ হয়ে গেল শরীর। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পা চালাল গরিলা। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে হঠাৎ মাথা সরিয়ে নিল অপূর্ব, ফলে নাকের বদলে কানের পাশ দিয়ে মাটিতে পড়ল লাথিটা -কেঁপে উঠল জমিন।

খানিকটা সরে গিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে খাঁচার দিকে চাইল মার্কোস। রানার চেহারায় শঙ্কার ছাপ দেখে নিজের উপর আস্থা বেড়ে গেল আরও। ঝাঁপ দিল সে ধরাশায়ী অপূর্বের বুক লক্ষ্য করে। উঠতে যাচ্ছিল, চট্‌ করে মাটিতে শুয়ে পড়ে শূন্যে পা তুলে দিল অপূর্ব, উড়ন্ত মার্কোসের নাভীতে পায়ের পাতাদুটো ঠেকিয়ে ঠেলে দিল উপর দিকে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোকটা। একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল দুজন, ঝাঁপিয়ে পড়ল পরস্পরের ওপর। এখন আর ভয় পাওয়ার অভিনয় করছে না, লড়ছে অপূর্ব প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।

মাথা ঘুরছে, উপর্যুপরি জোরালো আঘাতে এপাশ-ওপাশ দুলছে। একটু ফাঁক পেয়ে ডান হাতে গায়ের জোরে গরিলার চোয়ালে ঘুসি হানল ও, কিন্তু, ফস্কে গেল সেটা, ঝুপ করে বসে পড়ল লোকটা, কাঁধের ধাক্কায় বেসামাল করে দিল ওকে, পরমুহূর্তে সর্বশক্তিতে আঘাত হানল ওর বুকের পাঁজরে। একপাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল অপূর্ব, পারল না। পা হড়কে গেল ওর, চিত হয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সময় নষ্ট না করে প্রাণপণে লাথি চালাল মার্কোস ওর পেট বরাবর।

প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁচকে গেল অপূর্বের শরীর, তারপরেও থামল না লোকটা, আরও কয়েকটা লাথি মারল এখানে-ওখানে। এখন আর লড়াই হচ্ছে না, পড়ে পড়ে স্রেফ মার খাচ্ছে বিসিআই এজেন্ট। শুধু লাথি মেরেই ক্ষান্ত হলো না অবশ্য মার্কোস, অপূর্ব দূর্বল হয়ে পড়তেই কলার চেপে তুলে ধরে আশপাশের গাছপালার গায়ে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল। ধাম ধাম করে গাছের কাণ্ডে বাড়ি খাচ্ছে অপূর্ব, ব্যথায় ককিয়ে উঠছে প্রতিবারই। খাঁচার ভিতরে চোখ বন্ধ করে ফেলল নাদিয়া -এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে চায় না। অবস্থাটা লক্ষ করে উল্লসিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল মার্কোসের সঙ্গী -খুব মজা পাচ্ছে সে!

খাঁচার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, জুলফিকার আর তৌহিদ। হাত নিশপিশ করছে ওদের, অথচ করার কিছু নেই। চোখের সামনে নেতিয়ে পড়ল অপূর্ব -আক্রমণ তো দূরের কথা, আত্মরক্ষা করবারও শক্তি নেই এখন। আর একবার গাছের গায়ে বাড়ি খেয়েই চিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। পাশ থেকে লাথি কষল মার্কোস, গাছের গুঁড়ির মত গড়িয়ে গেল ও। নড়াচড়া করছে না আর।

মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল মার্কোস -মুখে শয়তানী হাসিটা ফুটে উঠেছে আবার। 'কী, মজা পাচ্ছ তো?'

'পাব, যদি মাটিতে তুমি গড়াগড়ি দাও।'

‘তা-ই? তা হলে তো ওকে আরেকটু সাইজ করতে হয়।’

‘দেখো, পারো কি না!’

আবার আক্রোশ ফুটল মার্কোসের চেহারায় -ব্যাটা এখনও মুখে মুখে কথা বলছে! খেপাটে ভঙ্গিতে অপূর্বের দিকে এগোল সে, ভাবল, রোগাপটকা বাঙালিটাকে মেরেই ফেলবে এবার।

রানা অবশ্য এমনি এমনি হালকা মেজাজে নেই। অপূর্ব প্ল্যান মোতাবেকই লড়ছে, তাই চিন্তার কিছু নেই। চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় এসে গেছে ওর, রানা তাই পাশ ফিরে জুলফিকারকে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। ‘রেডি থাকো।’

আহত হয়েছে তো বটেই, তবে একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়নি অপূর্ব। শরীরে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে চূড়ান্ত আঘাতটা হানার জন্য। এতক্ষণে সেই আঘাত হানার মত একটা পজিশনে পৌঁছুনো গেছে দেখে নড়ে উঠল ও, মার্কোসকে অবাক করে দিয়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল, তারপরই বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল তার দিকে।

প্রতিক্রিয়ার সময় পেল না মার্কোস, তার পেটের উপর এত জোরে ঘুসি পড়ল যে আতঙ্ক ফুটে উঠল গরিলার চোখে, পরমুহূর্তে কাঁধের প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল একই জায়গায়। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল মার্কোস, ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো পা ফেলে পিছনে চলে যাচ্ছে, চেষ্টা করছে ব্যালান্স ফিরে পেতে। কিন্তু তার আগেই চিবুকে অপূর্বর নকআউট পাঞ্চ খেয়ে দড়াম করে খাঁচার গায়ে পিঠ দিয়ে পড়ল সে।

জুলফিকার যেন ঠিক এজন্যই অপেক্ষায় ছিল ওখানে। লোকটাকে নাগালে পেতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে শিকের ফাঁক দিয়ে শক্তিশালী ডান হাতটা বের করে শিকারের গলা পেঁচিয়ে ধরল, বাম হাতে টেনে ধরল ওর বাবরি চুল। দু’চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল মার্কোসের, দম নিতে পারছে না, জুলফিকারের ডান বাহু

ক্রমে চেপে বসে যাচ্ছে তার গলায়। নিজেকে ছাড়াবার জন্য মোচড়ামুচড়ি শুরু করল। এবার হাত লাগাল রানা -গরিলার পকেট থেকে চাবির গোছাটা তুলে নিল ও, কোমর থেকে টান দিয়ে ছোরা বের করে আগাটা ধরল লোকটার হৃৎপিণ্ড বরাবর। খোঁচা লাগতেই স্থির হয়ে গেল গরিলা। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে এল সে।

চোখের সামনে মার্কোসের এই অবস্থা দেখে থমকে গিয়েছিল দ্বিতীয় গার্ড, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। মুখ দিয়ে বিচ্ছিরি গাল বেরিয়ে এল তার, নড়ে উঠল হাতের রাইফেলটা কাধে তুলবে বলে। তবে দেরি যা করার করে ফেলেছে সে, মার্কোসকে ধাক্কা দিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছে অপূর্ব, তিন লাফে চলে এসেছে তার পাঁচ হাতের মধ্যে। ওখান থেকেই লাফিয়ে শূন্যে উঠল ও ফ্লাইংকিক মারবে বলে, দক্ষ অ্যাক্রোব্যাটের মত চমৎকার ভঙ্গিতে বাতাসে ভেসে ছুটে যাচ্ছে লক্ষ্যের দিকে।

গার্ডের বুকের উপর পড়ল অপূর্বের জোড়া পায়ের লাথি, আঘাতের তীব্রতায় হুঁক্ করে একটা শব্দ করল লোকটা -সব বাতাস বেরিয়ে গেছে ফুসফুস থেকে। ধাক্কা খেয়ে কয়েক হাত দূরের একটা গাছের গায়ে আছড়ে পড়ল সে, মাথার পিছনদিকটা ঠুকে গেল ভীষণভাবে। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল, লোকটা -জ্ঞান হারিয়েছে এক লাথিতেই। অচেতন হয়ে গেছে, মার্কোসও, জুলফিকারের বাহুর বাঁধন আলগা হতেই দড়ি ছেঁড়া পুতুলের মত লুটিয়ে পড়ল।

অপূর্বর দিকে তাকাল রানা। 'ওয়েল ডান, অপূর্ব! আমি জানতাম, ওকে ঘায়েল করা তোমার জন্যে কিছুই না। তবে প্রথম দিকে ওকে অতটা সুযোগ না দিলেও পারতে।'

হাঁপাচ্ছে অপূর্ব, কথাটা শুনে বলল, 'আপনিই না বললেন প্রথমে একটু অভিনয় করতে?'

'তাই বলে এতটা?' হাসল রানা, 'তবে একেবারে সিনেমার হিরোর মত ফিনিশিং দিয়েছ, অপূর্ব! আমি ইমপ্রেসড!'

তিক্ততা ফুটল অপূর্বের চেহারায়। কোন্ কুক্ষণে যে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম!

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমি চেয়েছিলাম এদের কাউকে পাঠাতে, কিন্তু মাঝখান থেকে তুমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর মনোযোগ টেনে নিয়েছ নিজের দিকে।'

কপাল চাপড়াল অপূর্ব। বলল, 'আগে বলবেন না, মাসুদ ভাই! খামোকা ওদের মারটা আমি খেলাম।'

ওর বলার ভঙ্গি শুনে হেসে ফেলল সবাই।

খাঁচার দিকে এগোতে যাবে, আচমকা থমকে গেল অপূর্ব। সাঁই করে উড়ে এসেছে একটা ছুরি, সবাইকে অবাক করে দিয়ে সামনের মাটিতে গেঁথে গেল। নতুন বিপদ সামলানোর জন্য চোখ ফেরাতেই গাছপালার আড়াল থেকে মারিয়া গোমেজকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল ও। দৃপ্ত পায়ে হাঁটছে মেয়েটা, কাছে এসে বলল, 'ভাবছিলাম, তোমার বুঝি সাহায্য দরকার হবে, সেনিয়র!' হাসল সে। 'কিন্তু শেষমেশ যা দেখালে! ওফ!'

পড়ে থাকা গার্ডের রাইফেলটা ঝট্ করে তুলল অপূর্ব, তাক করল মারিয়ার দিকে। 'সাহায্য করতে এসেছ? নাকি খুন করতে?'

'রিল্যাক্স, সেনিয়র। আমি তোমাদের বন্ধু হতে এসেছি।'

ভাবান্তর হলো না অপূর্বের মধ্যে। রাইফেল স্থির রেখে বলল, 'খাঁচার দরজা খোলো।'

মাথা ঝাঁকাল মারিয়া, এগিয়ে গিয়ে রানার হাত থেকে চাবির গোছাটা নিল, তারপর খুলে দিল তালা। একে একে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল পাঁচ বন্দি। জুলফিকার আর তৌহিদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল রানা, সঙ্গে সঙ্গে দড়ি খুঁজে এনে মার্কোস আর তার সঙ্গীকে বেঁধে ফেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। এই

ফাঁকে জিকো আর মাসাপাকেও মুক্ত করল মারিয়া -বন্দুক তাক করে ওকে কাভার দিল অপূর্ব।

'কী অবস্থা তোমার?' অপূর্বকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'চলতে-ফিরতে পারবে?'

'আমাকে নিয়ে ভাববেন না, মাসুদ ভাই। ঠিকই আছি।' অপূর্ব আশ্বাস দিল। 'কিন্তু এই দু'মুখো সাপটাকে নিয়ে কী করা যায়, তা-ই বলুন।' মারিয়াকে দেখাল ও।

ওদের কথাবার্তায় মোটেই মনোযোগ নেই মারিয়ার। সবাইকে মুক্ত হতেই বলল, 'তাড়াতাড়ি... হোয়াইট ফিরে আসার আগেই কেটে পড়তে হবে এখান থেকে।' নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। 'বার্জটা এদিকে... আসুন আপনারা।'

পথরোধ করে দাঁড়াল রানা। 'জাস্ট আ মিনিট, ম্যাম। আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে।'

'কী প্রশ্ন?'

'তুমি এখানে কেন, মারিয়া? কী করছ?'

'অদ্ভুত প্রশ্ন। দেখতে পাচ্ছেন না, আপনাদের পালাতে সাহায্য করছি?'

'কেন?'

'বা রে! যাতে হোয়াইটের হাতে খুন হয়ে না যান।'

'হঠাৎ আমাদের বাঁচা-মরা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলে কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল অপূর্ব।

'আমি ক্রিমিনাল হতে পারি, কিন্তু অমানুষ নই,' বলল মারিয়া। মুখ বুজে নিরপরাধ কাউকে খুন হতে দিতে পারি না।'

'তা-ই নাকি? সেজন্যেই আমাদের তুলে দিয়েছিলে হোয়াইটের হাতে?'

রানাও বিশ্বাস করছে না কথাটা। 'শুধু মানবতার খাতিরে আমাদের সাহায্য করতে এসেছ? উঁহুঁ, আরও কোনও ব্যাপার আছে। স্বার্থ ছাড়া কিছু যে করা সম্ভব -সেটাই তো তুমি বিশ্বাস করো না। সত্যি করে বলো, দল পাল্টাতে চাইছ কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল মারিয়া -ফাঁকি দিয়ে যে পার পাবে না, বুঝতে পেরেছে। ইতস্তত করে বলল, 'ইয়ে... মানে... হোয়াইট আমাকে খুন করার প্ল্যান এঁটেছে।'

'হুঁ, একা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, তাই আমাদের সাহায্য চাইছ, তাই না?' রানা বলল।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মারিয়া।

'কিন্তু তোমাকে হঠাৎ খুন করতে চাইছে কেন সে? যদ্দূর বুঝেছি, তুমি তো ওর কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

'আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, সেনিয়র। কার্গোর শেষ চালানটা পৌঁছে দেবার পর আমাকে বা আমার বার্জটাকে আর দরকার হবে না ওর।'

'বুঝলাম। কিন্তু তার জন্য তোমার মুখ বন্ধ করে দিতে হবে কেন? কী লুকোচ্ছে সে?'

'এসব নিয়ে এখন কথা বলার সময় নেই,' এস্ত ভঙ্গিতে বলল মারিয়া। 'আপনারা আসুন আমার সঙ্গে। দেরি করলে ধরা পড়ে যাবেন। হোয়াইট টের পাবার আগেই নদীর বাঁকটা পেরুতে হবে আমাদের।'

'হোয়াইট টের না পাক,' অপূর্ব বলল, 'পিরানহা তো পাবে। ওর নাকের ডগা দিয়ে যাব আমরা, এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?'

'পিরানহাকে নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না আপনাদের,' আত্ম-বিশ্বাসের সুরে বলল মারিয়া। 'ও আমাদের ঠেকাবে না।'

রওনা হবার চেষ্টা করল মেয়েটা, কিন্তু খপ করে ওর হাত ধরে থামাল রানা। কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কেন পিরানহা আমাদের ঠেকাবে না?’ চেহারাটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে ওর। ‘জবাব দাও।’

নিরুত্তর রইল মারিয়া। শুধু বলল, ‘সেটা আমার আর পিরানহার ব্যাপার -আপনাদের না জানলেও চলবে।’

‘আমাদের জানতে হবে, মারিয়া।’

বিরক্ত চোখে সবার দিকে একবার তাকাল মেয়েটা। ‘গোঁ ধরে বসে থাকতে চাইলে থাকতে পারেন। তবে আমি থাকছি না। গুডবাই।’

‘খবরদার।’ চেঁচিয়ে উঠল অপূর্ব। এক পা-ও নড়বে না!'

‘চাইলে গুলি করো, কিন্তু আমি কিছুতেই থাকছি না এখানে,’ হিসিয়ে উঠে বলল মারিয়া। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ‘যারা চাও, আমার সঙ্গী হতে পার।’

অসহায় দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল অপূর্ব, সত্যি সত্যি গুলি করবে কি না, বুঝতে পারছে না। ইশারায় ওকে মানা করল রানা। জুলফিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিড় বিড় করে বলল, ‘অগ্নিকন্যা!’

‘হুঁ,’ রানা একমত হলো। ‘রহস্যময়ীও বটে। কড়া নজর রাখতে হবে ওর উপর।’

‘তার মানে আমরা আবার ওর সঙ্গে যাচ্ছি?’ জিজ্ঞেস করল জুলফিকার। ‘সেটা কি ঠিক হবে?’

‘চোখে চোখে রাখার জন্য এরচেয়ে ভাল উপায় আর নেই,’ রানা বলল। তা ছাড়া আমাদের একটা ট্রান্সপোর্টও দরকার।’

‘আপনি যা ভাল মনে করেন,’ কাঁধ ঝাঁকাল জুলফিকার। ‘কিন্তু এদের কী হবে?’ দুই রিভার গাইডকে দেখাল ও। ‘সঙ্গে নিয়ে যাব?’

‘ফেলে যাবার তো উপায় নেই,’ রানা বলল। ‘আমাদের না পেয়ে তখন এদের উপরই ঝাল মেটাবে হোয়াইট।’

কিন্তু দেখা গেল, গাইডেরা প্রস্তাবটায় রাজি নয়। জিকো মাথা নেড়ে বলল, ‘আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব না। মণ্টে অ্যালেগ্রায় নিজেরাই ফিরতে পারব।’

‘পাগলামি কোরো না,’ বিরক্ত গলায় বলল রাজিব। পায়ে হেঁটে কখনও অতদূর যেতে পারবে না তোমরা, অর্ধেক রাস্তা পেরুবার আগেই ফের ধরা পড়বে।’

‘কিন্তু আপনাদের সঙ্গে গেলেও তো ঝুঁকি কম নয়, জিকো বলল। মাসাপা ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে -আপনাদের উপর বিপদের কালো মেঘ ভাসছে।’

‘সেটা তো শুরু থেকেই ভাসছে,’ হালকা গলায় বলল রানা। কথা বাড়িয়ো না, জিকো। তোমাদের কিছুতেই ফেলে যাব না আমি, কথা না শুনলে বেঁধে নিয়ে যাব।’

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই গাইড, নিজেদের ভাষায় কথা বলল একটু। তারপর জিকো বলল, ‘ঠিক আছে, জোর করতে হবে না। চলুন।’

মারিয়ার পিছু পিছু গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটল সবাই।

চোদ্দ

ধাক্কা দিয়ে বিচ করা বার্জটাকে পানিতে নামাল ওরা, তারপর উঠে পড়ল ওটাতে। রাজিবকে সবার আগে তোলা হয়েছে -বেশ আহত ও, ডেকে শুইয়ে ওর সেবা-শুশ্রুষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল নাদিয়া। ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এসে অপূর্বের ক্ষতগুলোও ব্যাণ্ডেজ করে দিল মারিয়া।

অজ্ঞান দুই গার্ডের রাইফেল নিয়ে আসা হয়েছে, তবে তা দিয়ে বড় ধরনের আক্রমণ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই মারিয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'অস্ত্র-শস্ত্র কিছু আছে তোমার কাছে?'

মাথা নাড়ল মারিয়া। বলল, 'বাড়তি অস্ত্র প্রয়োজন হবে না তোমাদের। আমি নিরাপদেই সবাইকে মন্টে অ্যালেগ্রায় পৌঁছে দেব।'

'কথাটা শুনেই মাথা তুলল রাজিব। 'মন্টে অ্যালেগ্রা। না, না, ওখানে এখুনি যাওয়া চলবে না।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সবাই। গম্ভীর গলায় রানা জানতে চাইল, 'কেন?'

'হারানো শহরটার খুব কাছাকাছি রয়েছি আমরা,' রাজিব বলল। 'এত কাছ থেকে উল্টো ঘুরব কেন?'

'রাজিব... শহর-টহর না, সবচেয়ে আগে একজন ডাক্তার প্রয়োজন তোমার,' নাদিয়া বলল। 'নিজের অবস্থাটা দেখো!'

'কিচ্ছু হয়নি আমার,' জোর গলায় বলল রাজিব। যেটুকু কষ্ট হচ্ছে, সেটা লস ডেল রিয়ো খুঁজে বের করার জন্যে সহ্য করতে রাজি আছি।' রানার দিকে তাকাল ও। 'প্লিজ, মাসুদ ভাই! আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না! সাফল্যের এত কাছে এসে লেজ গুটিয়ে পালাতে চাই না আমি। ভেবে দেখুন, এত কষ্ট করলাম... অত্যাচার সইলাম... শহরটা যদি খুঁজেই না বের করি, তা হলে তো সবই বৃথা যাবে।'

রাজিবের আকুতিটা স্পর্শ করল রানাকে। তা ছাড়া এটাও ঠিক -একবার এখান থেকে চলে গেলে আবার কবে আসা যাবে, তার কোনও ঠিক নেই। দলের অন্যান্যদের দিকে তাকাল ও। মতামত চাইল, 'কী বলো তোমরা?'

একটু সময়ের জন্য চুপ হয়ে গেল সবাই। ভাবনায় ডুবে গেছে। খানিক পরে জুলফিকার বলল, কথাটা ঠিকই বলেছেন ড. রাজিব। এত কাছ থেকে

ফিরে যাওয়াটা ঠিক নয়। ওঁর যদি শারীরিক অসুবিধে না হয়, আমাদেরই বা ওঁকে সাহায্য করতে বাধা কোথায়?'

'হোয়াইটের বাচ্চাকে উচিত একটা শিক্ষা না দিয়ে পাততাড়ি গোটাতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমারও,' তৌহিদ যোগ করল।

দেখা গেল অপূর্বরও একই মত। রাজিবের দিকে তাকিয়ে নাদিয়াও নিমরাজি হয়ে গেল।

'সেক্ষেত্রে আমিও আর আপত্তি করব না,' রানা বলল। 'ঠিক আছে, রাজিব, যাচ্ছি আমরা লস ডেল রিয়োতে।'

'পাগল হয়ে গেছেন নাকি আপনারা?' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া। 'জেনে-শুনে আবার হোয়াইটের খপ্পরে পড়তে চান?'

'কে কার খপ্পরে পড়ে, কে বলতে পারে!' হাসল রানা।

'এসব বলে লাভ নেই,' গোঁয়ারের মত গোঁজ গোঁজ করল মারিয়া। 'আমি আপনাদের নিয়ে নদীর উজানে যাব না, ব্যস।'

'তা হলে বার্জটা আবার হাইজ্যাক করব আমরা,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'হাত-পা বেঁধে তোমাকে ফেলে রাখব হোল্ডে।'

'কী! আ... আমি আপনাদের উদ্ধার করলাম, তারপরেও আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করবেন?'

'এখনও উদ্ধার পাইনি আমরা, তা ছাড়া তোমার বেঈমানীর জন্যেই ধরা পড়েছিলাম সবাই। দুঃখিত, *সেনিয়োরিটা*, তোমাকে আমি এখুনি বিশ্বাস করতে রাজি নই। আমরা এখনও জানি না, আজ সকালে ওই জঘন্য কাজটা তুমি কেন করেছিলে। চুপচাপ কথা শোনো, নইলে নিষ্ঠুর হতে হবে আমাকে।'

খেপাটে দৃষ্টিতে রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মারিয়া। যখন বুঝল, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না লোকটা, তখন হার মেনে পিছিয়ে গেল।

রাজিবের কথা ভেবে যেতে রাজি হয়েছে, কিন্তু মনে মনে নাদিয়া ভাবছে ক্যাপ্টেনই ঠিক বলছে। মারিয়া হুইলহাউসে চলে যেতেই বলল, ‘মাসুদ ভাই, ও কিন্তু খুব একটা ভুল বলেনি। হোয়াইটের মুখোমুখি হয়ে গেলে আত্মরক্ষা করবার মত তেমন কিছু সত্যিই নেই আমাদের হাতে। ফিরে যাওয়াটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হত।’

‘রাজিবের কারণেই তো যেতে রাজি হয়েছি,’ রানা বলল। ‘যদি ফিরতেই হয়, সেটা ওর সিদ্ধান্ত।’

‘আমাকে বাঁধা দিয়ো না, নাদিয়া,’ শান্ত গলায় বলল রাজিব। ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আমাদের নাগালের মধ্যে... শুধু ভয় পেয়ে যদি পিঠ ফিরিয়ে নিই, তা হলে জীবনে কোনদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।’

‘কিন্তু তোমার এই পাগলামির জন্য তো আরও অনেকগুলো মানুষ বিপদে পড়তে যাচ্ছে, সেটা ভাববে না?’

‘চাইলে যে-কেউ ফিরে যেতে পারে, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই।’

‘দুঃখিত, ড. রাজিব,’ বলে উঠল জুলফিকার। ‘আপনাকে ছাড়া কেউ কোথাও যাচ্ছে না।’

‘আমরা না থাকলে আপনি এই আমাজনে দশ মিনিটও টিকতে পারবেন না, শহর-টহর খোঁজা তো অনেক পরের কথা,’ যোগ করল তৌহিদ।

অপূর্ব, বলল, ‘হোয়াইটের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার আমাদেরও।’

রানা হাসল। ‘সব তো ওরাই বলে ফেলল। আমার আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে কী?’

রাজিবও হাসল। ‘যদি ওঁদের কারণগুলোর বাইরে আরও কোনও কারণ থাকে।’

‘তা অবশ্য আছে,’ রানা মাথা ঝাঁকাল। ‘আমি জানতে চাই, নদীর উজানে করছেটা কী হোয়াইট? কেন ওদিকে যেতে দেয়া হচ্ছে না কাউকে?’

নাদিয়া ঢোঁক গিলল। ‘চিন্তা করবেন না, আপনাদের সবার যে-মনোভাব দেখছি, তাতে খুব শীঘ্রিই প্রশ্নগুলোর জবাব জানতে পারব আমরা... চাই বা না-চাই।’

উজানের দিকে যতই এগোচ্ছে বার্জটা, নদীর প্রস্থ ততই কমে আসছে। দুপাশের জঙ্গল ধীরে ধীরে ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে। এদিকে আদিবাসীদের কোনও আবাসও দেখা যাচ্ছে না। বনে পশুপাখিও নেই তেমন একটা, প্রাণের সাড়া বলতে রয়েছে শুধু অসংখ্য পোকামাকড়। বিরতিহীনভাবে ওগুলোর ডাকাডাকি শুনতে পাচ্ছে ওরা। নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ দিতে উদয় হচ্ছে মশার পাল -সন্ধে ঘনিয়ে আসায় রাজত্ব শুরু করতে যাচ্ছে ওগুলো। কদাচিৎ প্রজাপতিও চোখে পড়ে -রঙ-বেরঙের ডানা মেলে পানির উপর দিয়ে উড়ে যায়।

সূর্য ডুবে যাবার পরও শেষ হলো না যাত্রা; আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে, সেই আলোয় এগিয়ে চলল বার্জ। আবছা আলোয় চারপাশের সবকিছু অদ্ভুত দেখাচ্ছে -উত্তাল নদী, দু’পাশের কিম্ভুতকিমাকার গাছপালা-ঝোপঝাড় আর পোকামাকড়ের ডাক পরিবেশটাকে করে তুলেছে অপার্থিব। হঠাৎ হঠাৎ অভিযাত্রীদের পিলে চমকে দিয়ে ডেকে উঠছে বন্য পশুপাখি -যেন হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের।

রাত বাড়তেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ল। বার্জে ন’জন মানুষের রাত কাটাবার জায়গা নেই, তাই কার্গো ঢেকে রাখার ক্যানভাস দিয়ে একটা ছাউনি তৈরি করা হলো, ওটার নীচে আশ্রয় নিল সবাই। আরও কিছু ক্যানভাস কম্বল হিসেবে

ব্যবহার করল ওরা। পরদিন সকালে ছাউনিটা কড়া রোদ থেকে বাঁচতেও সাহায্য করল।

দ্রুত সেরে উঠছে রাজিব। চব্বিশ ঘণ্টায় অনেকটাই উন্নতি হয়েছে ওর, চেহারায় প্রাণের সাড়া ফিরে এসেছে, নড়তে-চড়তেও পারছে আগের চেয়ে অনেক সহজে। নাদিয়া এক মুহূর্তের জন্যও ওর পাশ থেকে সরেনি -সারাক্ষণ সেবাযত্ন করে যাচ্ছে ও। ডেকের একপাশে বসে থেকে একদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মারিয়া, বার্জ চালানোর দায়িত্বটা বিসিআই টিম ভাগাভাগি করে নেয়ায় এ-মুহূর্তে ফ্রি রয়েছে ও। কপোত-কপোতীর দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ অপূর্ব এসে পাশে দাঁড়ানোয় ধ্যান ভাঙল।

'হিংসে হচ্ছে ওদের দেখে?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল অপূর্ব।

থতমত খেয়ে গেল মারিয়া। 'হিংসে হবে কেন?'

'নিজের জীবনে ওদের মত কারও অভাব অনুভব করছ না?'

বিরক্তি ফুটল মারিয়ার চেহারায়। 'প্রেম-ভালবাসার মত ফালতু জিনিসে আমার কোনও আগ্রহ নেই।'

'বেশিরভাগ মানুষই তোমার সঙ্গে একমত হবে না।'

'তাতে আমার বয়েই যাবে! কে কী ভাবল, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই,' বলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল মারিয়া, বোধহয় গল্পগুজবের মুডে নেই। ওর পাশে বসে পড়ল অপূর্ব।

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটতেই হঠাৎ মারিয়া ঘাড় ফিরিয়ে বলল, "তোমাদের ওই মাসুদ ভাই... মানে, সেনিয়র রানা... অদ্ভুত একটা মানুষ, তা-ই না?'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দলনেতার দিকে তাকাল অপূর্ব -বার্জের বো'র কাছে দাঁড়িয়ে আছে রানা, শান্ত-অবিচল। হাতে রাইফেল, সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে নদীর দু'ধারে, যে-কোনও বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি। মুখে দু'দিন ধরে না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বাতাসে এলোমেলো হয়ে আছে চুল... তারপরেও

কোথায় কী যেন রয়েছে, শ্রদ্ধা কাড়ে; হয়তো দৃঢ় আর আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে দাঁড়ানোর কারণেই। পুরনো আমলের একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রীর মত দেখাচ্ছে ওকে, অচেনা কোনও মহাদেশ আবিষ্কারে চলেছে যেন।

'অদ্ভুত না, অসাধারণ একজন মানুষ,' বলল অপূর্ব, গলার সুরে প্রশংসার ভাবটা চাপা রইল না।

'ঠিকই বলেছ, সাধারণ নয় মোটেই,' মারিয়া স্বীকার করল। অচেনা ওই বাঙালি যুবকের প্রতি কেন জানি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। যতই দেখছে, ততই ওকে মুগ্ধ করে ফেলছে মানুষটা। বিশাল তার হৃদয়, নিজেকে বড্ড ছোট মনে হয় লোকটার সামনে। সাহসের তুলনা হয় না -বিপদে যেমন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে, পারে হাসি মুখে বিপদকে মোকাবেলা করতেও! যত ঝামেলাই আসুক, নিজের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ধরে রাখাতে জানে মানুষটা। কালো দু'চোখের তারায় সবার জন্য অসীম মমতার ছাপ; আবার ঠোঁটের কোণে কয়েকটা ভাঁজ দেখলে বোঝা যায়, মুহূর্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে মানুষটা। সৃষ্টিকর্তা মেয়েদের রহস্যময়ী করে পাঠান, কিন্তু একজন পুরুষও যে কত বড় রহস্য হতে পারে -তা এই মাসুদ রানাকে না দেখলে কোনদিন জানাতে পারত না মারিয়া।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখল মারিয়া। তারপর বলল, 'হারানো শহরের লোভে ও উজানে যাচ্ছে বলে বিশ্বাস করি না আমি। আসলে যাচ্ছে হোয়াইটের সঙ্গে বোঝাপড়া করাতে, তাই না?'

'মন্দ লোকদের সহজে ছাড় দেন না মাসুদ ভাই' অপূর্ব বলল। 'আসলে...'

কথা শেষ হলো না ওর, হঠাৎ নড়ে উঠতে দেখা গেল রাজিবকে। আধশোয়া অবস্থা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ও। চেঁচিয়ে বলল, 'ওই তো! ওই যে! শয়তানের শিং!' উত্তেজিতভাবে একদিকে আঙুল তুলে রেখেছে ও।

কৌতুহলী হয়ে ডেকের স্টারবোর্ড সাইডে ভিড় জমাল সবাই, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে এল রাজিবও -দেখিয়ে দিল শিংদুটো।

নদীর ডানপাশে... ঘন জঙ্গলের মাঝখানে মাথা উঁচু করে রেখেছে একটা শৈলশিরা। চুড়োটা দ্বিখণ্ডিত, পরস্পরের দিকে বেঁকে গেছে অর্ধবৃত্তাকারে -দেখতে ঠিক শিঙের মতই লাগছে।

'জানতাম... জানতাম ওটা এদিকেই আছে...' বিড় বিড় করল রাজিব।

'এটাই তোমার প্রথমে মার্কার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল রাজিব, তারপর আনন্দের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরল নাদিয়াকে। ধেই ধেই করে নাচবার অবস্থা ওদের, দেখে মনে হচ্ছে -সামান্য একটা চিহ্ন নয়, গোটা লস ডেল রিয়োই আবিষ্কার করে ফেলেছে ওরা। খুশির জোয়ারটা বাকিদেরও স্পর্শ করল।

ওদেরকে শান্ত হবার জন্য একটু সময় দিল রানা, তারপর রাজিবকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল। সাইটে পৌঁছুনোর পথে আর কী কী মার্কার চোখে পড়বে, কীভাবে যেতে হবে... সব জেনে নিল ও। বুঝতে পারল, সত্যিই শহরটা খুঁজে বের করবার মত একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ওদের সামনে।

'খুব ভাল, রাজিব,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল ও। 'এবার এটা তোমার শো। কী করতে চাও?'

'তীরে ভেড়ান বার্জটাকে,' বলল রাজিব। 'জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোতে হবে এবার আমাদের। হাঁটব আমরা।'

কাজটা আরও জটিল হলেই যেন মানাত বেশি, এমন একটা ভাব করল সবাই। তবে ইতিহাস সাক্ষী -পৃথিবীর সব অভিযাত্রা এক পায়ের সামনে আরেকটা পা ফেলা... মানে প্রথম পদক্ষেপের মাধ্যমে শুরু হয়। ওদেরটাও তা-ই হতে যাচ্ছে।

পনের

অনেক ধরনেরই জঙ্গল আছে পৃথিবীতে, তবে আমাজন রেইনফরেস্টের মত বিচিত্র বনভূমি রানা ছাড়া অভিযাত্রী দলের অন্য কোনও বাঙালি তরুণ-তরুণী দেখেনি কখনও। গাছগাছালির ভিড়ে গড়ে ওঠা পরিবেশটা অত্যন্ত আর্দ্র, ভরদুপুরেও কুয়াশার মত বাষ্পের একটা পর্দা ঝুলে রয়েছে বনের ভিতর। বার্জের তুলনামূলক আরামের পরিবেশ ছেড়ে জঙ্গলে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘামতে শুরু করল সবাই -শরীরের প্রতিটা লোমকূপ থেকে ঝরতে শুরু করেছে, ভিজিয়ে ফেলছে পোশাক। ব্যাপারটা যথেষ্ট অস্বস্তিকর, তার ওপর পালা করে ঝোপঝাড় কেটে কেটে এগোতে হচ্ছে ওদের -শারীরিক পরিশ্রম পরিস্থিতিটাকে অসহ্য করে তুলল খুব শীঘ্রিই। ঝোপগুলোও খুব ঘন, কাটার সময় বাড়তি শক্তি খরচ করতে হচ্ছে।

রাজিব নিজেও বোধহয় ভাবেনি, জায়গাটা এমন হতে পারে। পুরনো অভিজ্ঞতার কারণে একমাত্র রানাই আন্দাজ করেছিল, কী ধরনের পরিবেশ মোকাবেলা করতে হতে পারে। এ-ধরনের বহু জঙ্গল কাটতে হয়েছে ওকে অতীতে, তাই আজও যতক্ষণ সম্ভব সামনে থাকার চেষ্টা করল... যদিও জুলফিকার, তৌহিদ আর অপূর্ব ওকে কষ্ট করতে দিতে রাজি নয়। পুরোটা সময় সবাইকে উৎসাহ জোগানোর দায়িত্বটাও পড়েছে রানার কাঁধে। অবশ্য উৎকণ্ঠিত হবার মত কিছু ঘটেনি এখনও। দলের সবচেয়ে দুর্বল সদস্য রাজিবও কোনও অভিযোগ-অনুযোগ ছাড়া পথ চলছে নীরবে, কাজেই বাকিদের তো মুখ খোলার প্রশ্নই ওঠে না।

দলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পিছনে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দুই ইণ্ডিয়ান গাইড আর মারিয়া গোমেজের -একেবারে সামনে রয়েছে ওরা, বার্জ থেকে আনা একটা প্রমাণ সাইজের মাচেটি দিয়ে ক্রমাগত ঝোপঝাড় কেটে পথ তৈরি

করছে... এই এলাকা ওদের হাতের তালুর মত পরিচিত। বাকিরা যদ্দুর সম্ভব ওদের সাহায্য করে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে পুরো দলের শেষে রয়েছে জুলফিকার, পিছনদিকে নজর রাখছে ও, একই সঙ্গে খাড়া রেখেছে কানদুটো। অবশ্য আশপাশ থেকে যত শব্দ ভেসে আসছে, তার কোনটাকেই স্বাভাবিক বলা চলে না। আমাজনের পাখপাখালি, জীবজন্তু আর পোকামাকড় নিরবচ্ছিন্ন ডাকাডাকিতে ভরিয়ে রেখেছে চারপাশ। কাছেই কোথায় যেন একটা কাকাতুয়া ডেকে উঠছে থেকে থেকে... এই অচিন পরিবেশে ওটাই একমাত্র চেনা শব্দ। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও, খচখচ শব্দ শুনতে পেয়েছে, যেন পা ফেলা হয়েছে শুকনো পাতার ওপর... অথচ ওদের আশপাশে কোনও মরা পাতা নেই।

সামনে থেকে রানাও শুনতে পেয়েছে শব্দটা, হাত তুলে সবাইকে থামাল ও। মারিয়া ফিরে তাকাল কেন সবাই থেমে গেছে দেখার জন্য। নীরবতা বজায় রেখে জুলফিকার, তৌহিদ আর অপূর্বকে ইশারা করল রানা... ছড়িয়ে পড়ার জন্য। ঝটপট পঁচিশ গজের একটা কাল্পনিক বৃত্তের বিভিন্ন জায়গায় চলে গেল ওরা, আড়াল নিল মোটা মোটা কয়েকটা গাছের পিছনে। রওনা হবার কিছুক্ষণ পরেই গাছের ডালপালা কেটে কয়েকটা তীর-ধনুক আর লাঠি তৈরি করা হয়েছিল, এ ছাড়া হোয়াইটের ক্যাম্প থেকে আনা রাইফেলদুটোও রয়েছে -এই সামান্য অস্ত্রভাণ্ডার নিয়েই বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি হলো ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল ঘটনাবিহীনভাবে। কোথাও কিছু ঘটছে না, কারও সাড়াশব্দও নেই। যদি অবাঞ্ছিত কেউ আশপাশে এসেই থাকে, নিশ্চয়ই লুকিয়ে পড়েছে। ভুরু কোঁচকাল রানা, সত্যিই এসেছে কি? কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। সন্ধে নামার আগেই নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে ওদের। সাবধানে চারপাশটায় শেষবারের মত দৃষ্টি ফেলতেই চোখে পড়ল বুনো শূকরটা -ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওটারই

পায়ের শব্দ শুনেছে ওরা। স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলে আবার সবাইকে পথে নামতে ইশারা করল রানা।

পরের দুটো ঘণ্টা ঘটনাবিহীন বয়ে গেল। রাজিবের নির্দেশে নতুন একটা পথে এগোচ্ছে ওরা। মারিয়া আর ইণ্ডিয়ানেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই মাচেটি দিয়ে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করবার দায়িত্বটা রানা আর তৌহিদ স্বেচ্ছায় নিয়েছে -পালা করে সামনে থাকছে ওরা।

শিঙের মত দেখতে শৈলশিরাটার গোড়ায় পৌঁছে গেছে ওরা, হঠাৎ সামনের একটা ঝোপের গায়ে মাচেটির কোপ বসাতেই ঠং করে শব্দ হলো - নিরেট কোনও কিছুর গায়ে বাড়ি খেয়েছে ফলাটা। মাচেটিটা নামিয়ে রেখে ডালপালা সরাল তৌহিদ। একটা বিবর্ণ পাথুরে মূর্তি বেরিয়ে পড়ল তার ফলে।

বেশ বড় মূর্তিটা, লতাপাতায় ছেয়ে রয়েছে। সেগুলো ধীরে ধীরে পরিষ্কার করতেই চোখে পড়ল বিকট একটা কঙ্কালের খুলির আকৃতি -চিৎকার দেয়ার ভঙ্গিতে হা করে আছে। শূন্য অক্ষিকোটর যেন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে অভিযাত্রীদের দিকে -অজানা কোনও অভিশাপের বাণী ছড়াচ্ছে। দৃশ্যটা। ভীতিকর, নিজের অজান্তেই পিছন থেকে আঁতকে উঠল নাদিয়া। ও একাই নয়, ভয় পেয়েছে জিকো আর মাসাপাও -গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়েই ছুটে পালিয়ে গেল ওরা।

'অ্যাই! শোনো!' ওদেরকে ডেকে ফেরানোর চেষ্টা করল অপূর্ব, কিন্তু লাভ হলো না। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে শ্যালক আর বোনজামাই, জঙ্গলে ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল একসময়।

এসব দিকে নজর নেই রাজিব আবরারের, মূর্তিটা দেখেই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে ও। বাকিদের সরিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। *'চাপাতে!'* খুলিটার শরীর স্পর্শ করে ঘোর লাগা কণ্ঠে বলল ও *'চাপাতে!'*

নামটা একেবারে অপরিচিত নয় রানার কাছে, জানে -প্রাচীন এক ইনকা নেতার নাম ওটা। এটা তারই মূর্তি। তবে ব্যাপারটা জানা নেই বাকিদের। কৌতূহলী হয়ে তৌহিদ জিজ্ঞেস করল, '*চাপাতে* মানে কী?'

জবাবটা দিল নাদিয়া। '*চাপাতে* হচ্ছে ইনকাদের এক দেবতা, লস ডেল রিয়োর রক্ষাকর্তা। গল্পগাথায় বলে, এই দেবতাই নাকি জাদু দিয়ে লুকিয়ে ফেলেছিলেন শহরটাকে, যাতে আগ্রাসী বিদেশিরা ওটা কোনদিন দখল করতে না পারে।'

ঘোর কেটে গেছে রাজিবের। সোজা হয়ে ও বলল, 'ঠিক। তবে জাদুটা শুধু বিদেশিদের জন্য নয়, ইনকা সাম্রাজ্যের লোভী আর পাপী লোকদেরও সরিয়ে রাখার জন্য করা হয়েছিল। শহরটাকে পবিত্র তীর্থপীঠ বলে মানত ওরা, এখানে অপবিত্র মানুষদের পা রাখবার অধিকার ছিল না।'

ঘুরে ঘুরে মূর্তিটা চারদিক থেকে দেখল জুলফিকার। ব্যাপারটা কেন যেন মিলছে না। যদি লস ডেল রিয়োকে রক্ষা করার জন্যই এটা বানানো হয়ে থাকে, তা হলে কোথায় শহরটা? আশপাশে তো এক টুকরো ইটও দেখতে পাচ্ছি না।'

প্রশ্নটা অমূলক নয়, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সবাই তাকাল রাজিবের দিকে। একটু অস্বস্তি ফুটল রাজিবের চেহারায়। বলল, 'ইয়ে... ব্যাপারটা একটু ধাঁধার মতই বটে। আমি যে -জার্নালটা পেয়েছি, তাতে বলা হয়েছে -চাপাতেকে যে-লোক তার আসন থেকে হটাতে পারবে, একমাত্র তার কাছেই লস ডেল রিয়োর রহস্য ফাঁস করবে সে।'

একসঙ্গে কুঁচকে গেল সবার ভুরু। বিভ্রান্ত অপূর্ব জিজ্ঞেস করল, 'মানে কী এর?'

কাঁধ ঝাঁকাল রাজিব, 'জবাবটা জানা নেই ওর।'

‘তার মানে কি খামোকা একটা অলীক স্বপ্নের পিছু ধাওয়া করে এতদূর এলাম?’ অপূর্বর গলায় হতাশা।

‘আমার তা মনে হয় না,’ বলল রানা। ‘প্রতিটা মিথের মধ্যেই কিছু না কিছু সত্যি লুকিয়ে থাকে।’

মারিয়া বিস্মিত। ‘তাই বলে একজন দেবতাকে তার আসন থেকে কীভাবে হটানো সম্ভব?’

‘এসো, লজিক্যালি চিন্তা করা যাক।’ রানা হাল ছাড়তে রাজি নয়। ‘ইনকারা পুরনো ধ্যান-ধারণার মানুষ ছিল। বুদ্ধিমত্তা বা কৌশলে নয়, শক্তিতে বিশ্বাস করত ওরা। রাজ্য শাসন করত গায়ের জোরে।’ একটু এগিয়ে মূর্তিটা ভাল করে দেখল ও –দু’ফুট উঁচু বর্গাকার একটা ভিত্তির উপর বসানো হয়েছে ওটাকে। ‘হয়তো আসন থেকে হটানোর কথাটা আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে।’

‘যুক্তি আছে আপনার কথায়,’ স্বীকার করল রাজিব। ‘সে-আমলে ওরা শক্তির বিচারেই রাজা নির্বাচন করত বটে!’

‘হাত লাগাও সবাই,’ বলল রানা। ‘দেখি, দেবতা মশায়কে সিংহাসনচ্যুত করতে পারি কি না।’

কদাকার প্রস্তরমূর্তিটার ওজন অন্তত আধটন হবে, শুরুতে খালি হাতে চারপাশ থেকে ওটাকে ধরে নড়াবার চেষ্টা পুরোপুরি বিফলে গেল। শেষে কিছুটা কৌশল ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নিল রানা। খুলিটাকে ভাল করে দড়ি দিয়ে বাঁধল ওরা, দড়ির অপরপ্রান্ত কাছের একটা গাছের শক্ত ডালের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কপিকলের কায়দায়। আরেকটা গাছের ডাল দিয়ে লম্বা একটা লাঠি বানানো হলো, ওটা দিয়ে মারিয়া আর নাদিয়া চাড় দেবে।

আধঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল ব্যবস্থাটা। সবাইকে দশ মিনিট বিশ্রাম দিয়ে আবার কাজে নামাল রানা। পুরুষেরা দড়ি হাতে, আর মেয়েদুজন লাঠি নিয়ে তৈরি।

নিখাদ বাংলা ভাষায় *হেঁইও হেঁইও* বলে দড়ি টানতে শুরু করল ওরা, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে। দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকল সবার, ফুলে দ্বিগুণ হয়ে উঠল হাতের পেশি... তারপরেও নড়তে চাইছে না *চাপাতে*। হাল ছাড়ল না ওরা, ক্রমাগত টেনেই চলল রশিটা, একই সঙ্গে নাদিয়া আর মারিয়াও গোড়াটায় চাড় দিয়ে যাচ্ছে তালে তালে।

সম্মিলিত প্রচেষ্টার কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হলো দেবতা, ভোঁতা একটা শব্দ করে মুক্ত হলো ভিত্তি থেকে -কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠে গেছে। লাঠি দিয়ে ঠেলে ওটাকে একপাশে সরিয়ে দিল নাদিয়া আর মারিয়া। এবার দড়িটা ছেড়ে দিল পুরুষেরা, ঝোপঝাড় ভেঙে ধুপ করে মাটিতে পড়ল প্রাচীন মূর্তি... কাত হয়ে গেল একপাশে।

সাফল্যের আনন্দটা সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করতে পারল না ওরা, প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁপিয়ে গেছে, মাটিতে শুয়ে পড়ল। হাপরের মত ওঠানামা করছে ওদের বুক। কিছুক্ষণ পর শ্বাস-প্রশ্বাস একটু স্বাভাবিক হতেই উঠে দাঁড়াল রানা, সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেল ভিত্তিটার দিকে।

কাছাকাছি পৌছে উকি দিয়েই একটা উল্লাসধ্বনি করে উঠল রাজিব। মূর্তিটা সরে যাওয়ায় ভিত্তিপ্রস্তরের মাঝখানটায় ছোট্ট একটা খোপ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। ওখানে একটা লিভার দেখা যাচ্ছে।

'হুঁ, অনুমানটা তা হলে ভুল করেননি আপনি,' প্রশংসার সুরে বলল মারিয়া। 'সত্যি সত্যি মূর্তিটা সরানোর কথাই বলা হয়েছিল!'

'টানো লিভারটা, রাজিব,' রানা বলল। 'সম্মানটা তোমারই প্রাপ্য।'

'না। আপনার,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল রাজিব। 'আমি তো ওদের হাতে বন্দি হয়ে মরতেই বসেছিলাম। আপনার সাহায্য ছাড়া কিছুতেই এতদূর পৌঁছুতে পারতাম না। বিশেষ করে মূর্তিটা সরানো তো অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে।'

'সত্যি,' ওর কথায় সায় দিল নাদিয়া।

‘তারপরেও... এটা তোমার অভিযান। তোমার স্বপ্ন।’ বলল রানা। ‘টানো লিভার-সত্যি করো তোমার স্বপ্নকে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল রাজিব, কাঁপা কাঁপা হাতে আঁকড়ে ধরল পাথুরে দণ্ডটা। চোখ বন্ধ করে কী যেন বিড়বিড় করল, তারপর ধীরে ধীরে টানল লিভারটা, খাঁজ ধরে একপাশ থেকে অন্যপাশে গিয়ে থামল ওটা।

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। প্রথমে সবকিছু আগের মতই মনে হলো, তবে কয়েক সেকেণ্ড পরেই গুনগুন শব্দে ভরে উঠল চারপাশ। সবাই একসঙ্গে পিছন ফিরল অভিযাত্রীরা। শৈলশিরার গোড়ার একটা অংশ থেকে লতাপাতা-ঝোপঝাড় খসে পড়তে শুরু করেছে, ধুলোর একটা মেঘও উড়ল। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল ওরা, ওখানকার পাথর সরে যাচ্ছে দু'পাশে-একটা প্রবেশপথ উম্মুক্ত হচ্ছে চোখের সামনে!

‘ইয়াল্লা!' বলে উঠল নাদিয়া।

চওড়া হাসি ফুটেছে রানার মুখে। ‘বাহ, চমৎকার ব্যবস্থা!’ বলল ও। ‘ইনকারা যে মেকানিক্যাল দরজা বানাতে পারত -এটা জানতাম না।’

‘বানিয়েছেও কত সুন্দর করে, দেখেছেন?’ বলল তৌহিদ। ‘কাছ থেকেও বোঝার উপায় নেই।’

চোয়াল ঝুলে গেছে রাজিবের, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে প্রবেশপথটার দিকে। রানার ডাকে সংবিৎ ফিরল ওর।

‘কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে আছ কেন? লস ডেল রিয়োতে কি তোমার আগে আমাদেরকেই ঢুকতে দিতে চাও?’

‘না, না,’ সজোরে মাথা নাড়ল, রাজিব, তারপর ছুট লাগাল ঝোপঝাড় ভেঙে। ওর উচ্ছ্বাস স্পর্শ করেছে নাদিয়াকেও, সে-ও দৌড়াল ওর পিছু পিছু।

মুচকি হাসল রানা, দুই আর্কিয়োলজিস্টের শিশুসুলভ আচরণ দেখে হাসছে বিসিআই টিমের বাকি তিন সদস্য আর মারিয়া-ও। সবাই হাঁটতে শুরু করল হারানো শহরের দিকে।

পিছনে আগের মতই হিংস্র ভঙ্গিতে মুখ ব্যাদান করে কাত হয়ে পড়ে রইল *চাপাতে*-র মূর্তিটা।

ষোলো

প্রবেশপথের ওপাশে একটা টানেল -কালের প্রবাহে নানা ধরনের আগাছা আর মাকড়সার জালে ভরে আছে। সবকিছু ভেদ করে পাগলের মত দৌড়াচ্ছে রাজিব, ভিতরে যে নানা রকম বিপদ থাকতে পারে, সেটা ভুলেই গেছে। সৌভাগ্যক্রমে তেমন কিছু ঘটল না, কয়েক মিনিটের মধ্যে টানেলের অপরপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গেল ও, সামনের দৃশ্যটা দেখে থেমে দাঁড়াল।

জায়গাটা বিশাল একটা বক্স ক্যানিয়নের মত -পাহাড়ের কয়েকশো ফুট খাড়া ঢাল দিয়ে চারপাশ আবদ্ধ, টানেল ছাড়া এখানে ঢোকা বা বেরুনোর কোনও উপায় নেই। এর মাঝে কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে হারানো শহরের ধ্বংসাবশেষ: লতাপাতা, শ্যাওলা আর আগাছায় ঢাকা অবস্থায়। একটা দালানও আস্ত নেই, দেখে মনে হলো ভূমিকম্পে ধসে পড়েছিল কোনও এক কালে, হয়তো সে-কারণেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যায় না, এখানে কখনও কিছু ছিল। সম্ভবত এজন্যেই এতকাল এটার খোঁজ পায়নি কেউ। প্রবেশপথটা ছাড়া একে তো ঢোকা সম্ভব নয়, আবার আকাশ থেকেও সবুজে ছাওয়া এক চিলতে জমির মত দেখায় জায়গাটাকে।

তবে ওভাবে ভাবছে না রাজিব, সত্যিকার একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে মানসচোখে লস ডেল রিয়োকে দেখছে ও। মাথা-উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা বিখ্যাত এক শহরকে কল্পনা করছে, প্রাচীনকালে যেটা মহান এক সভ্যতার প্রতীক বহন করছিল। টানেল থেকে বেরিয়ে রাজিবকে উত্তেজনায় কাঁপতে দেখল ওর সহযাত্রীরা। নাদিয়ারও কমবেশি একই অবস্থা, রাজিবকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল ও, চোখ দিয়ে খুশির বন্যা হয়ে অশ্রু ঝরছে। সময়কে ভুলে গিয়ে লস ডেল রিয়োর ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওরা, যেন চোখ ফেরালেই ভেঙে যাবে স্বপ্নটা। দীর্ঘ সাধনার ফসল যে সত্যি হয়ে ধরা দিয়েছে, সেটা বিশ্বাসই হতে চাইছে না রাজিবের।

রানাসহ বাকিরাও কম অভিভূত হয়নি। হোক ধ্বংসাবশেষ, তারপরেও হারানো শহরের দৃশ্য শিহরণ তুলল ওদের মধ্যে। মনে হলো, ভাঙাচোরা দালানকোঠার আনাচে-কানাচে লুকিয়ে রয়েছে রহস্য... অজানা সব ব্যাপার! ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করল ওরা। এককালের গর্বিত, মহান ইনকা সভ্যতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হিসেবে এখানে একটা মন্দির ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটাকে চিনতে পারল ওরা। ছাদ-টাদ সব ধসে গেছে, কয়েকটা স্তম্ভ শুধু কোনক্রমে দাড়িয়ে আছে ওখানে -সারা শরীর নানা রকম পিকটোগ্রাফ আর হাইরোগ্লিফিক প্রতিলিপিতে ভরা। চওড়া সিঁড়িটায় ফাটল ধরেছে, ওখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে আগাছার দঙ্গল, সারফেসও শ্যাওলা পড়তে পড়তে কালো হয়ে গেছে। ভাবতে কষ্ট হয় -এখান দিয়ে একসময় রাজ্যের উঁচু পদের ধর্মীয় নেতারা মন্দিরে ঢুকতেন, এখানে দাঁড়িয়ে শীর্ষ-পুরোহিত প্রার্থনা পরিচালনা করতেন... এখানেই শহরের আমজনতা তাদের অর্ঘ্য নিবেদন করত!

মন্দিরের ঠিক সামনেই একটা ফোয়ারা ছিল, এখন শুধু গোড়াটুকু ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। ওখানে অচেনা একজাতের জংলি ফুল ফুটেছে -এককালের ফোয়ারা তাই পরিণত হয়েছে প্রাকৃতিক ফ্লাওয়ার-বেডে। দেখতেও

খুব ভাল লাগছে, নিষ্প্রাণ পরিবেশটায় রঙিন আভা ছড়িয়ে খুশির বন্যা বইয়ে দিয়েছে যেন ফুলগুলো।

মন্দিরের ঠিক পাশে আরেকটা বিশাল ভবনের চিহ্ন দেখা গেল -ছাতঅলা একটা ওয়াকওয়ের মাধ্যমে দুটো ভবনই সংযুক্ত ছিল। রাজিব বলল -ওটা সম্ভবত এখানকার সরকারি প্রশাসনিক ভবন ছিল। সে-আমলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করত, এ-কারণে দু'পক্ষের দপ্তরও থাকত কাছাকাছি। আরও কিছু প্রাসাদোপম বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপ দেখা গেল; ওরা অনুমান করল-ওগুলোতে উপরমহলের লোকজন ও শাসকগোষ্ঠী থাকত। প্রচুর মূর্তি বানানো হয়েছিল লস ডেল রিয়োর সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য, প্রায় সবই এখন ভেঙেচুরে পড়ে রয়েছে এখানে-সেখানে।

যতই দেখছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছে অভিযাত্রীরা। আজ থেকে হাজার বছর আগে এমন একটা শহর তৈরি করা যা তা ব্যাপার ছিল না। প্রচুর ধন-সম্পদ এবং লোকবল প্রয়োজন হয়েছিল নিঃসন্দেহে, এই ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়েও সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রাচীন ইনকাদের রুচি এবং শিল্পবোধ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে আবিষ্কারটা থেকে। ভাঙাচোরা মূর্তি আর ধসে পড়া দালানগুলোর প্রতিটির শৈল্পিক সৌন্দর্য অতুলনীয়।

টানেল পেরিয়ে লস ডেল রিয়োতে ঢোকার পড় থেকে কথা বছে না কেউ। নীরবে ধ্বংসাবশেষের এখানে-ওখানে ঢুঁ মারছে শহরটা দেখতে এবং আর্টিফ্যাক্টের খোঁজে। তামা আর ব্রোঞ্জের কিছু কিছু জিনিস পাওয়া গেল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই, পাথর-খোদাই করা নানা ধরনের ভাস্কর্য তো আছেই... তবে অবাক ব্যাপার হলো, যে-ধাতুর বহুল ব্যবহারের জন্য ইনকারা বিখ্যাত, সেই সোনার তৈরি কোনও কিছু খোঁজ পাওয়া গেল না। তবে ব্যাপারটায় বিশেষ অবাক হলো না রানা। ও জানে, স্প্যানিশ আগ্রাসনকারীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ইনকারা তাদের সমস্ত সোনাদানা লুকিয়ে ফেলেছিল ষোড়শ

শতকের শুরুতে, রানা নিজেই কয়েক বছর আগে এ-ধরনের ট্রেজারের বিশাল একটা সংগ্রহ উদ্ধার করেছিল। মনে হচ্ছে, লস ডেল রিয়ো থেকেও একইভাবে সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলেছিল ইনকারা। অবশ্য সোনাদানা বাদ দিলেও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হিসেবে লস ডেল রিয়োর গুরুত্ব কম নয়। তাই খুবই আনন্দিত দেখা যাচ্ছে রাজিব আর নাদিয়াকে। গুপ্তধনের আশায় এখানে আসেনি ওরা, লুকানো ধনসম্পদের প্রতি ওদের লোভ ছিল না কখনোই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাথমিক উচ্ছাস কেটে গেল দুই আর্কিয়োলজিস্টের। রানাকে জানাল, শহরের একটা ডায়াগ্রাম, সেইসঙ্গে আর্টিফ্যাক্টের একটা তালিকা করতে চায়।

'এসব তো সময়সাপেক্ষ কাজ,' রানা বলল। 'পরে করলে চলে না? শহরটার লোকেশন তো জেনে গেছি আমরা, এক্সপিডিশনের পুরো টিম নিয়ে এসেই না হয় করা যাবে ওসব।'

'কবে আসব... আদৌ আসতে পারব কি না... সেটাই তাে ঠিক নেই, মাসুদ ভাই,' রাজিব বলল। 'এ-মুহূর্তে অন্তত কিছুটা কাজ তো করে রাখি, নইলে খালি হাতে ফিরতে হবে।'

'খালি হাতে ফিরতে কে বলছে?' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'বেছে বেছে কিছু আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে যাব আমরা। ক্যামেরা আছে সঙ্গে, এখানকার ছবিও তুলে নিতে পারব।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়, তারপরেও ইতস্তত করতে থাকল রাজিব। রানা জোর দিয়ে বলল, 'দেখো, ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো। অনির্দিষ্টকাল এখানে বসে থাকা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে, যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। তারচেয়ে ফিরে যাই, সমস্ত ইকুইপমেন্ট আর নিরাপত্তার ষোলো আনা ব্যবস্থা করে যত দ্রুত সম্ভব তোমাকে নিয়ে আসব এখানে, ঠিক আছে?'

'কথাটা মাসুদ ভাই ঠিকই বলেছেন,' নাদিয়া একমত হলো।

কী আর করা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাজি হলো রাজিব। বলল, 'ছবি তুলতে আর অ্যার্টিফ্যাক্ট বাছতে সময় দেবেন তো?'

'সূর্য ডুবতে আর দু'ঘণ্টা বাকি আছে,' বলল রানা। 'এর মধ্যে যতটুক জোগাড় করতে পারো, ততটুকু নিয়েই রওনা হব আমরা।'

মুখে শয়তানি হাসি, দুই ইনফর্মারের দিকে তাকিয়ে আছে মিস্টার হোয়াইট। সংবাদদাতারা আর কেউ নয়, রাজিব আবরারের দুই ইণ্ডিয়ান গাইড -জিকো এবং মাসাপা। এইমাত্র এসে পৌঁছেছে ওরা, বাংলাদেশি আর্কিয়োলজিস্টের আবিষ্কারের কথা জানিয়েছে। চাপাতের মূর্তি দেখে ভয় পাওয়াটা স্রেফ অভিনয় ছিল, আসলে ওই ঘটনাটা কাজে লাগিয়েছে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য। আড়াল থেকে এরপর ওরা নজর রেখেছে অভিযাত্রীদের উপর, ওরা লস ডেল রিয়োতে ঢোকার পর ছুটে এসেছে খবর দিতে।

চমৎকারভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে হোয়াইটের নীল নকশা। রাজিব আবরার অত্যাচারের মুখেও লস ডেল রিয়োর সন্ধান না দেয়ায় পরিকল্পনাটা আঁটে সে। আর্কিয়োলজিস্টের প্রেমিকা ও বন্ধুদের ওর সঙ্গে খাঁচায় বন্দি করে সরে আসে ক্যাম্প থেকে, পালাবার সুযোগ করে দেয়, কৌশলে সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয় দুই ইণ্ডিয়ানকে -ওরা শুরু থেকেই হোয়াইটের হয়ে কাজ করছিল। মুচকি হাসল হোয়াইট, ওর কৌশল ধরতেই পারেনি বাঙালি লোকগুলো!

মার্কোস আর ওর সঙ্গীও ভাল অভিনয় করেছে। ওদের অংশটুকুই সবচেয়ে জটিল ছিল -এমনভাবে বন্দিদের পালাতে দিতে হবে, যাতে ব্যাপারটাকে নিজেদের কৃতিত্ব মনে করে রাজিব আবরারের দল... ভুলেও যেন সন্দেহ করতে না পারে যে, আসলে ইচ্ছে করেই ওদের পালাতে দেয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য: পলাতকদের পিছু নিয়ে হারানো শহরটার খোঁজ পাওয়া। দুই গার্ডকে সেজন্য একটু মার খেতে হয়েছে অবশ্য, তবে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়নি

কেউই... সামান্য শুশ্রূষা, এবং ভাল অভিনয়ের জন্য যথেষ্ট টাকা পেয়ে সমস্ত কষ্ট ভুলে গেছে ওরা।

পুরো প্ল্যানই দাঁড়ি-কমা পর্যন্ত ঠিকমত এগিয়েছে, তবে মারিয়া গোমেজের আচমকা উদয় হওয়াটাই একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল। মেয়েটা যে বাঙালিগুলোকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, সেটা জানা ছিল না হোয়াইটের। এক দিক থেকে সেটাও অবশ্য ভাল হয়েছে -বার্জটা পাওয়ায় দ্রুত লস ডেল রিয়োর পথে রওনা হতে পেরেছে রাজিব আবরার ও তার সঙ্গীরা, নিজের লঞ্চ নিয়ে দুর থেকে সতর্কভাবে ওদেরকে অনুসরণ করেছে হোয়াইট। তারপরেও ল্যাটিন মেয়েটার বিশ্বাসঘাতকতা তার মাথায় আগুন জ্বেলে দিয়েছে... মেয়েটাকে খুন করে ফেলবার পুরনো সিদ্ধান্তটা যে ভুল ছিল না, সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে পরিস্কার।

জিকো আর মাসাপা ফিরে আসার পর থেকে মুখে হাসি লেগে রয়েছে। হোয়াইটের, সাফল্যের অনিন্দটা কিছুতেই মলিন হচ্ছে না। লস ডেল রিয়ো... কিংবদন্তির শহর... গুপ্তধনের শহর... এখন তার হতে যাচ্ছে। অঢেল টাকা-পয়সা এসে যাবে হাতে, আর অন্যের গোলাম হয়ে জীবন কাটাতে হবে না, নিজেই নিজের ভাগ্য গড়তে পারবে। সুন্দর ভবিষ্যৎ আর লস ডেল রিয়োর মাঝে কাঁটা হয়ে রয়েছে এখন মাত্র ছ'জন বাঙালি –ওদেরকে পিষে ফেলবে সে।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মার্কোসের দিকে তাকাল হোয়াইট। 'সবাইকে তৈরি হতে বলো। আমরা এখুনি রওনা হব।'

'ইয়েস বস,' অনুগত সৈনিকের মত মাথা ঝাঁকাল মার্কোস। তারপর মনে করিয়ে দিল। 'লোকগুলো কিন্তু খুব চালু, বস। গোমেজেরও সাহায্য পাব না আমরা এবার। ব্যাটাদেরকে ধরতে হলে তাই খুব সাবধানে এগোতে হবে।'

‘ধরব কেন?’ ভুরু কোঁচকাল হোয়াইট। ওদেরকে তো আর প্রয়োজন নেই আমার, জায়গামত পৌঁছে স্রেফ গুলি চালাব।’ নিষ্ঠুরতা ফুটল তার চেহারায়। ‘আর হ্যাঁ, পালের গোদাটাকে এবার তুমি নিতে পারো।’

মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠল মার্কোসের। ‘থ্যাঙ্ক ইউ, বস!’

‘গেট রেডি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হতে চাই আমি।’

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মার্কোস।

এবার হোয়াইটের দিকে এগিয়ে এল জিকো। ‘আমরাও চলে যাই, হুজুর। পুরস্কারের টাকা দিন।’

‘চলে যাবে মানে?’ খেঁকিয়ে উঠল হোয়াইট। তা হলে লস ডেল রিয়ো পর্যন্ত পথ দেখাবে কে?’

‘ম্যাপ একে দেব, হুজুর। রাস্তা চিনতে অসুবিধে হবে না।’

‘চোপ!’ ধমকে উঠলা হোয়াইট। ‘চালাকি পেয়েছিস? চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব, হারামজাদা! কীসের ম্যাপ! লস ডেল রিয়োতে তোর শালা আর তুই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি আমাদের, বুঝেছিস?’

মুখ শুকিয়ে গেছে জিকো আর মাসাপার, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। শেষ চেষ্টা হিসেবে অনুনয় করল জিকো, ‘কিন্তু হুজুর, ওটা তো ভূত-প্রেত আর অশুভ আত্মাদের ডেরা! ওখানে গেলে আর কোনওদিন ফিরতে পারব না আমরা! সেজন্যেই তো শহরে ঢোকার আগেই পালিয়ে এলাম। আপনার জন্য অনেক তো করলাম, এবার দয়া করে ছেড়ে দিন আমাদের!’

‘লাথি মেরে কোমর ভেঙে দেব, হারামজাদা।’ হুমকি দিল হোয়াইট। ‘আবার মুখে মুখে কথা! যেতেই হবে তোদের। নইলে এখুনি তোর বউ একইসঙ্গে স্বামী আর ভাইকে হারাবে।’

জিকো বুঝতে পারল, তর্ক করে লাভ নেই। মাথাগরম লোকটা খেপে গেলে সত্যি সত্যি ওদের দুজনকে খুন করে ফেলতে পারে। তাই মিনমিনে স্বরে

বলল, 'আপনার যা ইচ্ছে, হুজুর। আমার বউ এতবড় আঘাত সইতে পারবে না।'

'গুড,' মাথা ঝাঁকাল হোয়াইট । 'যাও, রওনা হবার জন্য তৈরি হও।' দুই গাইডকে হার মেনে উল্টো ঘুরতে দেখে আপনমনেই হেসে উঠল সে। 'লস ডেল রিয়ো... তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য এবার আমার।'

'হ্যাঁ,' মাসাপার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল জিকো। 'ঐশ্বর্য তো বটেই, সঙ্গে অভিশাপগুলো।'

সতেরো

শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লস ডেল রিয়োর ধ্বংসাবশেষে তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা। পুরো জায়গাটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে দিয়েছে রানা, প্রত্যেকে বেছে নিয়েছে একটা করে অংশ। সূর্যের তেজ কমে গেছে বটে, তারপরেও ভ্যাপসা ভাবটা কাটেনি। চামড়ার উপর লবণের একটা আস্তর পড়ে গেছে সবার, নতুন করে ঘাম হচ্ছে না সে-কারণে, তবে অস্বস্তি বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। তারপরেও শারীরিক অসুবিধে অগ্রাহ্য করে কাজ করে যাচ্ছে সবাই।

বাকিদের সঙ্গে যোগ দেয়নি শুধু তৌহিদ, প্রবেশপথের বাইরে একটা ঝোপের আড়ালে চুপচাপ বসে চারদিকটা পাহারা দিচ্ছে। নিরাপত্তা-ব্যবস্থা বিন্দুমাত্র খুঁত রাখতে চায় না রানা, তাই একজনকে সারাক্ষণ পাহারায় রেখেছে। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে তৌহিদ, জঙ্গল থেকে ভেসে আসা বিভিন্ন শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনছে, বোঝার চেষ্টা করছে -কোনও বিপদ দেখা দেয় কি না।

পিছনে খসখস আওয়াজ হলো, চোখ ফেরাতেই আঁতকে উঠল তৌহিদ। বিকট মুখোশ... সারা গায়ে লতাপাতা জড়ানো অদ্ভুত একটা অবয়ব উদয়

হয়েছে, নাচছে তিড়িং বিড়িং করে! আরেকটু হলেই হাত থেকে রাইফেলটা পড়ে যাচ্ছিল, কোনওমতে নিজেকে সামলাল তৌহিদ, পরমুহূর্তেই হাসি ভেসে এল মুখোশের আড়াল থেকে। সঙ্গে পরিচিত একটা কণ্ঠ।

'হাঃ হাঃ হাঃ। কী, দিলাম তো ভয় পাইয়ে!'

অপূর্ব।

'ফাজলামি হচ্ছে?' কপট রাগের সুরে বলল তৌহিদ। 'এসবের মানে কী?'

'দেখতে এলাম, ঠিকমত ডিউটি করছিস কি না,' মুখোশ খুলে বলল অপূর্ব। 'একটা পরীক্ষা নিলাম তোর সতর্কতার। রেজাল্ট? শোচনীয়ভাবে ফেল করেছিস।'

'গুলি করে যদি মাথাটা উড়িয়ে দিতাম, তা হলেই বোধহয় হায়েস্ট মার্ক নিয়ে পাশ করতাম, তাই না? সেটাই চাইছিলি?'

'এভাবে তো ভাবিনি,' মুখ কালো হয়ে গেল অপূর্বের। 'থ্যাঙ্ক ইউ, দোস্ত... ফেল করেছিস বলে!'

'হয়েছে, আর ঢং দেখাতে হবে না। গুলি যে করিনি, সেটা তোর সাত পুরুষের ভাগ্য। যা একখানা জিনিস পরে এসেছিস...'

'রিচুয়াল মাস্ক,' মুখোশটা তৌহিদের হাতে দিয়ে বলল অপূর্ব। প্রার্থনার সময় নাকি এটা পরতে হত। আমি নিজে খুঁজে বের করেছি।'

'সুন্দর জিনিস,' মন্তব্য করল তৌহিদ। 'প্রায় অক্ষত দেখছি। কিন্তু তুই কেন বাইরে এসেছিস... সত্যি করে বল। মাসুদ ভাই আমার উপর খবরদারি করবার জন্য তোকে পাঠিয়েছে বলে বিশ্বাস করি না।'

শরীর থেকে লতাপাতা সব ফেলে দিল অপূর্ব। বন্ধুর পাশে বসে বলল, 'তল্লাশি বন্ধ করে দিয়েছেন মাসুদ ভাই। জিনিসপত্র যা পাওয়া গেছে, সেগুলো এখন গোছগাছ চলছে। আমাকে না হলেও চলে, তাই মাসুদ ভাই বললেন বাইরে গিয়ে তোর সঙ্গে যোগ দিতে।'

‘ভাল, তুই তা হলে বোস্ এখানে। আমি আউটার পেরিমিটারে একটা চক্কর দিয়ে আসছি।’

‘তাড়াতাড়ি ফিরিস।’

‘কেন দেরি করলে ভয় পাবি?’ টিটকিরি মারল তৌহিদ।

‘গাঁট্টা খাবি কিন্তু!’ চোখ পাকাল অপূর্ব।

হেসে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে গেল তৌহিদ।

মন্দিরের এক কোণের একটা ঘরে জড়ো করা হয়েছে সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট - রুমটার ছাদ-টাদ কিছু নেই। দেয়ালও প্রায় অদৃশ্য, আঁকাবাঁকা একটা আকৃতি নিয়ে দেড়-দু’ফুটের মত টিকে আছে শুধু। শ্যাওলা পড়া মেঝেটা পিচ্ছিল, হাত ধরাধরি করে হেঁটে মাঝখন পর্যন্ত এল রাজিব আর নাদিয়া, শেষবারের মত কিছু আইটেম নিয়ে এসেছে।

রুমটার মাঝখানে এখন স্তূপ হয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকারের একগাদা আর্টিফ্যাক্ট -বিশাল এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের প্রথম উদ্ধারকৃত সামগ্রী হিসেবে। বেশিরভাগই পোড়া মাটি, পাথর আর কাঠের তৈরি ধর্মীয় বস্তু কিংবা গৃহস্থালির সামগ্রী -সাধারণ বিচারে দামি কিছু নয়। তারপরেও এগুলো অমূল্য সম্পদ, কারণ প্রাচীন এক সভ্যতার চিহ্ন বহন করছে আর্টিফ্যাক্টগুলো। বেশিরভাগই নাদিয়া আর রাজিবের আবিষ্কার -ধ্বংসাবশেষের আনাচে-কানাচে ঢুঁ মেরে, সযত্নে মাটি খুঁড়ে বা লতাপাতা সরিয়ে এসব বের করেছে ওরা।

লটটাতে ছবি আঁকা কয়েকটা বাটি আছে; আছে পানপাত্র এবং কয়েক ধরনের চামচ-খন্তিও। পুরনো আমলের কিছু টুলস পাওয়া গেছে -সম্ভবত বাগান করার কাজে ব্যবহার করা হতো। রিচুয়াল মাস্ক এবং কয়েক ধরনের ধর্মীয় মালাও পেয়েছে ওরা।

জুলফিকার আর মারিয়া উদয় হলো এ-সময়, বেশ কিছু জিনিস পেয়েছে ওরা, সব এনে নামিয়ে রাখল ঘরের মাঝখানে। কাঠের একটা চারকোনা জিনিস বের করে দেখাল জুলফিকার, মাঝখানটা গর্তের মত করা। ছোট্ট একটা বাটির মত অনেকটা, কিন্তু ঠিক বাটি নয়।

'কী এটা?' দুই বিশেষজ্ঞের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ও। 'অ্যাশট্রে নাকি? ইনকারা সিগারেট খেত?'

আগ্রহ নিয়ে জিনিসটা দেখছিল আর্কিয়োলজিস্ট জুটি, কথাটা শুনে হেসে ফেলল। নাদিয়া বলল, 'কী যে বলেন না, জুলফিকার ভাই!'

চারকোনা জিনিসটা হাতে নিল রাজিব, তারপর চ্যাপ্টা করে বুকে ঠেকিয়ে বলল, অ্যাশট্রে না, এটা হলো যোদ্ধার হৃৎপিণ্ড।'

'কী!' ভুরু কুঁচকে ফেলল জুলফিকার।

'এক ধরনের অলংকার বলতে পারেন,' রাজিব ব্যাখ্যা করল। 'বড় বড় যোদ্ধারা এটা বুকে ঝোলাত। এর মানে হচ্ছে -বিশাল একটা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে ওই যোদ্ধা... জয়ী হয়ে; শত্রুপক্ষের নিহত যোদ্ধাদের হৃৎপিণ্ডের প্রতীক হিসেবে এটাকে দেখাত ওরা।'

'কাঠের হৃৎপিণ্ড দেখিয়ে লাভটা কী?'

হাসল রাজিব। 'কাঠের না, আসলে সত্যিকার হৃৎপিণ্ডই কেটে এনে ঝুলিয়ে রাখত। তবে ওই জিনিস আর ক'দিন টেকে, বলুন? তাই সত্যিকার হৃৎপিণ্ড পচে গেলে এই কাঠের প্রতীক ঝোলাত।'

'হায় যিশু!' আঁতকে উঠল মারিয়া। 'কী ভয়ানক কথা... মানুষের হৃৎপিণ্ড কেটে গলায় ঝোলাত?'

'অদ্ভুত রীতিই বটে,' মন্তব্য করল জুলফিকার।

পায়ের শব্দ শুনে মুখ ঘোরাল ওরা -রানা এসেছে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে এত গবেষণা হচ্ছে? যেতে হবে না? রাতের বেলায় এ-জায়গায় আটকা পড়তে চাও?'

'আমার কোনও ইচ্ছে নেই,' মাথা নাড়ল মারিয়া। ড. আবরার কী সব কথা শোনালেন, গা শিরশির করছে।'

'আমি অবশ্য পারলে এখানেই থেকে যাই,' বলল রাজিব।

'সেটি হচ্ছে না, ডক্টর,' রানা হাসল। তোমাকে ছাড়া ফিরে গেলে বিসিআই চিফ আমার চাকরি নট করে দেবেন।'

'চাকরি নিয়ে ভাববেন না, আমার সঙ্গে লস ডেল রিয়োর এক্সপিডিশনে থাকলে আয়-রোজগার নিয়ে আর ভাবতে হবে না আপনাকে। নামডাকও করে ফেলবেন।'

'প্রস্তাবটা আকর্ষণীয়। তবে দুঃখিত, টাকা বা খ্যাতি... কোনোটারই লোভ নেই আমার। সবাইকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই অনেক বেশি খুশি হব।'

'এখানে তো সোনাদানা কিছুই নেই,' জুলফিকার বলল। 'মাটির হাড়িপাতিল আর কাঠের গয়না দিয়ে কী লাভ হবে?'

'বোঝা যাচ্ছে, প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের দামের ব্যাপারে আপনার কোনও আইডিয়া নেই,' হেসে বলল নাদিয়া। 'এটুকু জেনে রাখুন -শুধু হাতে করে যে-কটা জিনিস আমরা নিয়ে যাচ্ছি, সেগুলো বিক্রি করলেই অন্তত তিনটে এক্সপিডিশনের খরচ উঠে আসবে।'

'মাই গড! আপনারা ব্যবসা করার কথা ভাবছেন না তো!'

'কী যে বলেন না!' রাজিব যেন আহত হলো। 'এসব আমরা মিউজিয়ামে জমা দেব।'

‘চমৎকার!’ রানা বলল। ‘তা হলে তাড়াতাড়ি জমা দেবার জন্যে তৈরি হও, এক্ষুনি রওনা দেব...’

কথা শেষ হলো না ওর, দূর থেকে তৌহিদকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল। তরুণ এজেন্টের চেহারায় দুশ্চিন্তা ফুটে রয়েছে।

ও কাছাকাছি পৌঁছুতেই রানা জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে? পোস্ট ছেড়ে চলে এলে কেন?’

‘খারাপ খবর, মাসুদ ভাই,’ বলল তৌহিদ। ‘বার্জে পৌঁছুনো সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। আশপাশে আমাদের উপর হামলা চালাবার জন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে ওরা।’

‘কীভাবে বুঝলে?’

‘আউটার পেরিমিটারে রাউণ্ড নিতে গিয়েছিলাম, চাপাতের মূর্তিটার পঞ্চাশ গজ দূরে গাছের আড়ালে দু’জোড়া পায়ের ছাপ দেখলাম। ছাপগুলো আমাদের দুই ইণ্ডিয়ান গাইড -জিকো আর মাসাপার।’

চোখ বুজে তৌহিদের কথা বিশ্বাস করা যায়, ট্র্যাকিঙে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও, বইয়ের পাতার মত পায়ের ছাপ পড়তে পারে। রানা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ‘ওরা পালায়নি?’

‘উঁহুঁ,’ মাথা নাড়ল তৌহিদ। ‘অভিনয় করেছে। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসেছে, আড়াল থেকে আমাদের ওপর নজর রেখেছে, তারপর আবার পা টিপে চলেও গেছে।’

‘মানে কী এর?’ বোকা বোকা গলায় জিজ্ঞেস করল রাজিব।

‘ওরা হোয়াইটেরই লোক,’ বলল রানা । ‘আমরা কী করছি না-করছি, সেটা দেখার জন্য সঙ্গে এসেছিল। শহরের খোঁজ পেয়ে যেতেই কেটে পড়েছে... বসের কাছে রিপোর্ট দেবার জন্য। ইসস্... বোকামি হয়েছে খুব। আমাদের

বন্দি করার পর হোয়াইট যখন দলবল নিয়ে কেটে পড়ল... মাত্র দুজন লোককে পাহারায় রেখে গেল, তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার।'

'ইয়াল্লা! কী বলছেন!'

'তা হলে এই মেয়েও তো ওর হয়ে কাজ করছে,' সন্দিহান চোখে মারিয়ার দিকে তাকাল জুলফিকার। 'হঠাৎ করে আমাদের সাহায্য করতে উদয় হলো... ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়?'

'না-আ!' প্রতিবাদ করল মারিয়া। আমি হোয়াইটের লোক নই। প্লিজ, বিশ্বাস করুন আমার কথা।'

'বিশ্বাসের মর্যাদা তুমি নিজেই তো গতবার নষ্ট করেছ,' রাগী গলায় বলল জুলফিকার। 'এবারও যে চালাকি করছ না, তার কোনও প্রমাণ আছে?'

মাথা নাড়ল মারিয়া। 'না, নেই। কিন্তু আমি একবিন্দু মিথ্যে বলছি না... সময় এলেই তার প্রমাণ পাবেন।'

তীক্ষ্ণ চোখে তরুণীর মুখভঙ্গি লক্ষ করল রানা, কিন্তু তাতে কোনও খুঁত দেখতে পেল না। যদি অভিনয়ই করে, অস্কার পাবার মত পারফর্মেন্স দেখাচ্ছে মেয়েটা। থমথমে গলায় ও বলল, 'ঠিক আছে, আরেকটা সুযোগ পাবে তুমি। কিন্তু তোমার উপর কড়া নজর থাকবে আমাদের।'

মারিয়া আমাদের নাকি ওদের দলে সেটায় কিছু যায়-আসে না। ও তো এখানে আমাদের সঙ্গেই আছে।' তৌহিদ বলল। 'সমসা গাইডদুটোকে নিয়ে। ওদের মাধ্যমে এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছে হোয়াইট। এখান থেকে বেরুলেই ওর খপ্পরে পড়ব।'

'কী করা যায় এখন, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দলনেতার দিকে তাকাল জুলফিকার।

ঠোঁট কামড়ে চারপাশে তাকাল রানা। কী যেন ভাবল একটু, তারপর বলল, 'এখানেই ওকে মোকাবেলা করি না কেন?'

‘কীভাবে?’ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল নাদিয়া। ‘আমাদের কাছে তো লড়াই করবার মত কিছুই নেই।’

‘সেজন্যেই এখানকার কথা বলছি। শহরটা ভাল করে দেখেছি আমি - পুরনো আমলের এক ধরনের পেরিমিটার ডিফেন্স রয়েছে এখানে। ইনকারা ভাল যুদ্ধকৌশল জানত, ব্যবস্থাটা চমৎকার। ওটা ব্যবহার করে হোয়াইটকে চমকে দিতে পারি আমরা।’

‘কয়েকশ’ বছর আগের জিনিস দিয়ে হোয়াইটের মত আধুনিক খুনিকে হারাবেন?’ চোখ কপালে তুলল নাদিয়া। ‘তা কি সম্ভব?’

‘হবে না কেন? গেরিলা এবং জাঙ্গল ওয়ারফেয়ারের উৎপত্তি প্রাচীনকালেই হয়েছিল, আজও সেই কৌশল ব্যবহার করি আমরা... একটু উন্নতভাবে, এই আর, কী! এখানকার ব্যবস্থাটা নিজেদের সুবিধেমত সাজিয়ে নিলে হোয়াইটকে সহজেই ঠেকানো সম্ভব।’

রানার উপর অগাধ আস্থা জুলফিকারের। বলল, ‘অর্ডার দিন, মাসুদ ভাই। কাজ শুরু করে দিই।’

‘এখানে যুদ্ধ করবেন...’ প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে স্বাভাবিক উদ্বেগ ফুটল রাজিবের চেহারায়। ‘শহরটার বারোটা বাজিয়ে দেবেন না তো।’

‘মিথ্যে আশা দেব না,’ রানা বলল। ‘ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হতেই পারে।’

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল রাজিব। ‘এখানকার অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ নষ্ট করাটা ঠিক হবে না, মাসুদ ভাই। লড়াইটা নাহয় অন্য কোথাও...’

‘এ-মুহূর্তে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আমাদের জীবন,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘কিছু করার নেই, রাজিব। খোলা জঙ্গলে লড়াই করে পেরে উঠব না আমরা, শহরটাই আমাদের ডিফেন্সিভ পজিশন নেয়ার জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা। আমরাই যদি না থাকি, এসব আর্টিফ্যাক্ট আমাদের কোনও কাজে আসবে না।’

যুক্তিটা অকাট্য, তারপরেও পরিকল্পনাটা পছন্দ হচ্ছে না রাজিবের। পাল্টা কিছু বলতে পারল না, লস ডেল রিয়ার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। লস ডেল রিয়ার অবস্থা এমনিতেই করুণ, লড়াই শেষে আদৌ কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি না ভাবতেই বুক শুকিয়ে যাচ্ছে ওর। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ওকে অপূর্বের জায়গায় ওয়াচ পোস্টে পাঠিয়ে দিল রানা, পাহারায় ব্যস্ত থাকলে দুশ্চিন্তা করবার সময় পাবে না। তা ছাড়া প্ল্যানটা সফল করার জন্য বিসিআইয়ের অভিজ্ঞ তিন এজেন্টকেই দরকায় ওর।

পরের এক ঘণ্টা জানপ্রাণ দিয়ে খাটল সবাই, পেরিমিটার ডিফেন্সটা খাড়া করবার জন্য। চারপাশের ক্যানিয়নের দেয়ালে বেশ কিছু তাক বানানো আছে, ওখানে বড় বড় বোল্ডার তুলে ফেলল ওরা -প্রয়োজনে শত্রুদের দিকে গড়িয়ে দেয়ার জন্য। পুরো শহরের এখানে-সেখানে বসানো হলো লতার তৈরি স্প্রিং-ট্যাপ -অসাবধান কেউ পা ফেললেই টান দিয়ে উল্টো করে ঝুলিয়ে ফেলবে। প্রাচীন আমলের ডিজাইনে একটা ক্যাটাপুল্ট-ও বানাল ওরা, ওটা দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারা যায়। শহরে মোট তিনটে শুকনো কুয়ো পেয়েছে ওরা, সেগুলোর মুখও পাতা দিয়ে ঢেকে দিল -কেউ পা ফেললে সোজা নীচে পড়ে যাবে। দড়ির বাণ্ডিল আর লতা দিয়ে দুটো নেটও বানানো হলো, শত্রুদের আটকাবার জন্য। কাজ করার সময় হঠাৎ নিজেদের সঙ্গে প্রাচীন ইনকাদের মিল দেখতে পেল রানা: বর্তমান কংকুইস্টেডরদের হাত থেকে শহরকে বাঁচাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যেন।

সময়টা কীভাবে পেরিয়ে গেল, তা টেরও পেল না কেউ। কাজ যখন শেষ হলো, তখন সূর্য ডুবে গেছে, লাল আলোয় রাঙিয়ে দিয়ে গেছে পশ্চিমের আকাশ। শুরু হলো প্রতীক্ষার পালা, তবে সেটা খুব একটা দীর্ঘ হতে যাচ্ছে না, এই যা সান্ত্বনা।

আঠারো

সন্ধ্যা নেমেছে বটে, তবে চাপাতে-র খুলিসদৃশ মুখটায় সে-কারণে ছায়া পড়েছে। বলে মনে হচ্ছে না। বরং একের পর এক বহিরাগত মানুষ এসে পবিত্র শহরটাকে অপবিত্র করছে বলে মনে হয় রুষ্ট হয়েছে, দেবতা। এমন অনাচার আর দেখতে হয়নি চাপাতে-কে।

এ-মুহূর্তে মূর্তিটার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মিস্টার হোয়াইট ও তার সঙ্গীসাথীরা -মোট বরোজন তারা। বিরক্ত চোখে মূর্তিটাকে একবার দেখল দুর্বৃত্তদের নেতা, তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল জিকোর দিকে। হাত তুলে হারানো শহরের উন্মুক্ত প্রবেশপথটা দেখিয়ে দিল ইণ্ডিয়ান গাইড।

‘ওখানে আছে ওরা।’

হোয়াইটের দলের লোকেরা সবাই ভাড়াটে গুণ্ডা, টাকার জন্যে পারে না এমন কাজ নেই। রক্তের মধ্যে খুনের নেশা রয়েছে সবার, রয়েছে নারীদেহের প্রতি তীব্র লোভ। হোয়াইট একটা আদর্শের অনুসারী, সেই আদর্শের লক্ষ্যেই কাজ করে সে। কি এদের কোনও আদর্শ বা নীতি নেই, শুধুমাত্র ছোটখাট কাজ সারার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে এদের ভাড়া করে আনা হয়েছে। ঘুরে সবার মুখোমুখি হলো হোয়াইট, ভাষণ দেবার আগে তাকাল লড়াইয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা মুখগুলোর দিকে -সব তেল চকচক করছে, চোখে বুনো দৃষ্টি... খুনোখুনির জন্য তর সইছে না যেন কারও। দুজন মেয়ে আছে শত্রুদের মধ্যে, নিশ্চয়ই লড়াই শেষে ওদের ভোগ করবার কথা ভাবছে। ধমক দিয়ে সবাইকে সিধে করল হোয়াইট, অভিজ্ঞ সেনাপতির মত ব্রিফ করল আশু-কর্তব্যের ব্যাপারে। কাকে কী করতে হবে, সেটা পুংখানুপুংখভাবে বুঝিয়ে দিল, তারপর দলবল নিয়ে রওনা হলো লস ডেল রিয়ার দিকে।

সবার পিছনে রয়েছে জিকো আর মাসাপা, দেবতার মূর্তিটা পার হবার সময় সশব্দে ঢোঁক গিলল দুজনে। চিৎকারের ভঙ্গিতে হাঁ করে থাকা চাপাতে যেন শেষবারের মত ওদের সাবধান করে দিচ্ছে নিশ্চিত নরকে না-ঢুকলা জন্য।

চারপাশ অস্বাভাবিক রকমের নীরব। সামান্য খসখস শব্দও অনেক বেশি হয়ে কানে বাজছে। তাই সাবধানে পা চালাচ্ছে হোয়াইট, সামনে থেকে আগাছা আর লতাপাতা সরাচ্ছে সন্তর্পণে। অহেতুক শব্দ করে প্রতিপক্ষকে সাবধান করে দিতে চায় না সে। এই মুহূর্তে মাসুদ রানাকে একটুও ছোট করে দেখছে না হোয়াইট, লোকটা ভয়ঙ্কর, প্রথম সুযোগেই তাকে খতম করতে হবে।

টানেল থেকে বেরুতেই অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারাল সে। চোখের সামনে পড়ে রয়েছে কিংবদন্তির হারানো শহর... দৃশ্যটা শিহরন বইয়ে দিল তার বুকের ভিতরে। লোভী মনটা নেচে উঠল তৎক্ষণাৎ -রাজা-রাজড়ার অঢেল ধন অপেক্ষা করছে এখানে, হোয়াইটের কুক্ষিগত হবার জন্য। কমবেশি একই অবস্থা দলের বাকিদেরও-যুদ্ধ-টুদ্ধের কথা ভুলে গেছে একদম, শুধু ভাবছে ধনী হবার কথা। তবে ওদের জানা নেই-হারানো শহরের যে-রূপ এ-মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে, তার বিভিন্ন জায়গায় আধুনিক অনেক স্থাপত্য রয়েছে... মাসুদ রানার তৈরি প্রাণঘাতী স্থাপত্য।

হোয়াইট আর তার দলের মুগ্ধতার ছন্দপতন ঘটল হঠাৎ, বেরসিকের মত একটা কণ্ঠ ভেসে আসায়। আড়াল থেকে গম্ভীর গলায় কেউ একজন বলে উঠল, 'যেখানে আছ, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, হোয়াইট। আর হ্যাঁ... হাতের অস্ত্রগুলো ফেলে দাও, নইলে তোমাদেরকেই ফেলে দিতে বাধ্য হব আমরা।'

কণ্ঠটা চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না অভিজ্ঞ দুর্বৃত্তের, বোকার মত ইতি-উতি তাকাল, কিন্তু শব্দের উৎসটা ঠাহর করতে পারল না কিছুতেই। প্রায়ান্ধকার এই ভৌতিক পরিবেশে যেন অদৃশ্য কোনও প্রেতাত্মা হুমকি দিচ্ছে ওদের, নিজের অজান্তেই ঘাড়ের পিছনের খাটো চুলগুলো খাড়া হয়ে যাচ্ছে

অশরীরী কণ্ঠটা শুনে। হঠাৎ চেহারায় হিংস্রতা ফুটল হোয়াইটের, খেপাটে গলায় বলল, 'ধাপ্পা দিয়ে লাভ নেই, মাসুদ রানা!' হতচকিত হয়ে গেছে সে, মাথার ভিতর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে অ্যালার্ম বাজাতে শুরু করেছে... তারপরেও গলায় সাহস ফোটানোর চেষ্টা করল। আমি জানি, তোমার কাছে অস্ত্র-শস্ত্র নেই!'

'পরীক্ষা করে দেখতে চাও?' হেসে উঠল রানা। 'আমার কোনও আপত্তি নেই। মোস্ট ওয়েলকাম!'

দুর্বৃত্তদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, নেতার নার্ভাসনেসটা ঠিকই টের পেয়েছে তারা... তার ওপর অদৃশ্য প্রতিপক্ষের হাসি ওদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। যদি অসহায়ভাবে মরণই কপালে থাকে অভিযাত্রীদের, তা হল এভাবে হাসতে পারছে কী করে? অনুসারীদের মনোভাব আঁচ করতে পারল

হোয়াইট, বুঝল, এদের সাহস ফিরিয়ে আনতে হলে যা-করার তাকেই করতে হবে।

এক পা এগোল সে। 'আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো, রান!' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল, 'সাহস থাকে তা আমার মুখোমুখি হও।'

'তা-ই?' সকৌতুকে বলল রানা। 'বিনিময়ে কী পাব?'

'মেয়েদুটোকে ছেড়ে দেব,' লোভ দেখাল হোয়াইট। 'তুমি আত্মসমর্পণ করো।' বেরোও খালি, মনে মনে বলল সে, গুলিতে যদি ঝাঁঝরা না করে না দিয়েছি তো...

'তুমি একটা মিথ্যেবাদী,' হোয়াইট। গম্ভীর গলায় বলল রানা, প্রতিপক্ষের মনের কথা পড়তে পারছে। 'ওসব ফালতু প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না।'

হাতের রাইফেলটা বার বার এদিক-সেদিক ঘোরাচ্ছে হোয়াইট, আরেকবার আশ্বাস দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল। 'সত্যিই ছেড়ে দেব...'

‘ছাড়বে তো বটেই... তবে সেটা প্যাঁদানি খেয়ে। যখন তোমার নাকের জল, চোখের জল এক করে দেব; বাপ-বাপ করে সবাইকে ছাড়বে তুমি।’

নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটল হোয়াইটের ঠোঁটে। ‘দেখা যাচ্ছে, আমাকে চিনতে ভুল হয়নি তোমার... ভুলটা করছ ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে। আমি আমার মতই থাকব, রানা। কিন্তু তোমরা কেউ এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।’

‘চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করছি আমি।’

‘বেশ, এবার সামনে এসো মোকাবেলা করতে।’

কয়েক মুহুর্তের জন্য চুপ করে থাকল রানা, এই সুযোগে সঙ্গীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করার জন্য উল্টো ঘুরল হোয়াইট। মুখ খোলার সময় পেল না, হঠাৎ ডানদিকে একটা শব্দ হলো। পাঁই করে সেদিকে ঘুরল সবাই, পরমুহুর্তে থমকে গেল। আধো-আলো আধো-অন্ধকারে ভাঙা একটা দেয়ালের ওপাশ থেকে লাফিয়ে ওঠা বিকট এক মূর্তি দেখে আত্মা চমকে গেল ওদের। বিদঘুটে মুখোশটা দেখে অমন প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক, আর সেটাই আশা করেছিল অপূর্ব; গলা ছেড়ে হেসে উঠল ও, তারপর পিছনদিকে ফিরে দৌড়াতে শুরু করল।

সবার আগে চমকটা সামলে নিল হোয়াইট, রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়ল... দেখাদেখি বাকিরাও। অপূর্বর চারপাশ দিয়ে ছুটে যেতে থাকল বুলেটগুলো, কয়েকটা গেল একেবারে শরীর ঘেঁযে... কিন্তু আতঙ্কিত হলো না ও জানে - আবছা আলোয় লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না শত্রুরা। তাই ঠাণ্ডা মাথায় এঁকে বেঁকে ফাঁকি দিতে থাকল বুলেটবৃষ্টিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে কয়েকটা স্ল্যাবের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল অপূর্ব। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সেদিকে এগিয়ে এল দুর্বৃত্তরা -কল্পনাও করতে পারেনি, আসলে ওদেরকে ফাঁদের মধ্যে টেনে আনছে চতুর বিসিআই এজেন্ট।

জায়গাটা ক্যানিয়নের দেয়ালের পাশে, ঢালু তাকটার ঠিক নীচে। গুণ্ডারা ওখানে পৌঁছুতেই উপরে পজিশন নেয়া জুলফিকার নড়ে উঠল, শক্তিশালী

দুহাতে, ধাক্কায় ঠেলে দিতে শুরু করল আগে থেকে সাজিয়ে রাখা একটার পর এক বোল্ডার।

চমকে উঠে উপরদিকে তাকাল দুর্বৃত্তরা, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মাটি কাঁপিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে আসছে একটার পর একটা ভারি পাথরের চাঁই। প্রথমে বিস্ময়ে স্থবির হয়ে গেল সবাই, সংবিৎ ফিরতেই লাফিয়ে সরে যেতে চাইল... কিন্তু পুরোপুরি সফল হলো না সবাই।

পলায়নপর এক দুর্বৃত্তের পিছনে এসে ধাক্কা দিল একটা বোল্ডার, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে... পাথরটা ওর উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল, তলায় চ্যাপ্টা করে দিয়ে গেছে লোকটাকে। আরেকজন পড়ল দুটো পাথরের মাঝখানে, শরীরের একটা পাশ থেঁতলে গেল তার... দুনিয়া-ফাটানো আর্তচিৎকার বেরুল লোকটার গলা দিয়ে -না মরলেও চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে গেছে।

সবার পিছনে ছিল হোয়াইট, এ-কারণে বেঁচে গেছে সে, কিন্তু বিমূঢ় হয়ে গেল অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করে। যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে, একের পর এক ভারি পাথর নেমে আসছে মাটিতে, ধুলোয় আচ্ছন্ন চারপাশ। আহতদের চিৎকারে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। চিৎকার-চেঁচামেচি আর পাথর গড়িয়ে পড়ার মুহুর্মুহু আওয়াজে আশপাশের গাছপালায় জেগে উঠেছে দিনশেষে নীড়ে ফেরা সব পাখি, তীব্র স্বরে কিচিরমিচির করে পালিয়ে যাচ্ছে এলাকা ছেড়ে। গোঙাতে গোঙাতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি করছে ভাড়াটে গুণ্ডারা, ধুলোর মেঘ আর আলোকস্বল্পতার কারণে হোয়াইট বুঝতেও পারছে না, কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে সে।

একটু পরেই অবশ্য থেমে গেল আক্রমণটা, ধুলো সরে যেতেই রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত সঙ্গীসাথীদের দেখে খাবি খাওয়ার দশা হলো হোয়াইটের। তাড়াতাড়ি নজর ফেরাল জীবিতদের অবস্থা দেখার জন্য।

কেউই ভাল নেই, ভারি পাথরের হামলা ঠেকাতে পারলেও এবার নতুন ধরনের আরেকটা পাথরবৃষ্টির মুখোমুখি হতে হচ্ছে জীবিতদের। রানার নির্দেশে ক্যাটাপুল্টটা অপারেট করছে রাজিব আর নাদিয়া, বিহ্বল হয়ে যাওয়া শত্রুদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাথর নিক্ষেপ করছে ওরা। ছোট... তবে কম ক্ষতিকর নয়, একেকটা পাথর অন্তত একটা মুঠির সমান, ছুটে আসছে তীব্র বেগে। পুরনো আমলে মাথার উপর ঢাল ধরে এ-ধরনের হামলায় আত্মরক্ষা করত সৈনিকেরা, হোয়াইট-বাহিনীর কাছে ঢাল বা তলোয়ার নেই। একটার পর একটা পাথর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এসে আঘাত করতে লাগল ওদের। মাথার চাঁদি ফেটে গেল কয়েকজনের, কারও বা নাক-মুখ থেঁতলে গেল, মাটিতে ছিটকে পড়ল ভাঙা দাঁত, অপেক্ষাকৃত বড় আকারের একটা পাথরের আঘাতে শোল্ডার জয়েন্ট ঘুটে গেল একজনের। হুড়োহুড়ি করে পালাতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে গেল দুজন।

পুরোপুরি দিশেহারা হয়ে গেছে লোকগুলো, ঘটনার আকস্মিকতায় মাথাই কাজ করছে না। আক্রমণের জবাবে একটাও পাল্টা গুলি ছুঁড়ল না। হোয়াইট অবশ্য চেঁচামেচি করে দলকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা চালাল, কিন্তু কে শোনে কার কথা! জান বাঁচাতেই ব্যস্ত সবাই, পিঠটান দিচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে হোয়াইটও ওদের পিছু নিল।

এবার সক্রিয় হয়ে উঠল রানা ও তৌহিদ। হোয়াইটের ক্যাম্প থেকে আনা রাইফেলদুটো ওদের হাতে রয়েছে, পরস্পরের মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় করে গুলি শুরু করল। পিঠে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল আরও দুই দুর্বৃত্ত, বাকিরা দিক পাল্টাল বুলেট থেকে বাঁচতে। এই সময় লতাফাঁদে পা দিয়ে ঘায়েল হলো তৃতীয় একজন।

থেমে থেমে গুলি করছে রানা আর তৌহিদ, তাড়াহুড়ো করছে না একটুও। শত্রুদের যমের বাড়ি পাঠানোই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়... তাদেরকে গরু খেদানোর মত নির্দিষ্ট একটা দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে একইসঙ্গে। জায়গামত

যখন হোয়াইট আর তার দল পৌছুল, তখন বাহিনীটার মাত্র তিনজন বেঁচে আছে, আর বেঁচে আছে দুই ইণ্ডিয়ান গাইড। পাঁচজনে বড় একটা গাছের সামনে পৌঁছুতেই উপর থেকে বিশাল জালটা ফেলল মারিয়া অপূর্বর সাহায্য নিয়ে। হোয়াইটের বাহিনীকে জায়গামত পৌঁছে দিয়েই এক ছুটে এখানে চলে এসেছে অপূর্ব, চড়ে বসেছে গাছে।

বিশাল একটা মাকড়সার জালের মত উপর থেকে নেমে এসে পাঁচ শিকারকে আটকে ফেলল জালটা, হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকগুলো। আতঙ্কে চেঁচামেচি করছে, চেষ্টা করছে বেরিয়ে আসার... কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। আহত-নিহত শত্রুদের অস্ত্রগুলো ধীরেসুস্থে সংগ্রহ করল রানা, বিতরণ করল নিজেদের মধ্যে, তারপর কর্ডন করার ভঙ্গিতে ঘিরে ফেলল জালে পড়া লোকগুলোকে।

হোয়াইটের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে -হার হয়েছে তার। স্রোত পাল্টে গেছে, যে-বিজয় তার হবার কথা ছিল, সেটা এখন চলে গেছে। শত্রুদের কব্জায়... প্রাচীন যুদ্ধকৌশলের বদৌলতে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, এমন হবার কথা ছিল না।

কাছে পৌঁছে গেছে রানা। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'অস্ত্র ফেলে দাও সবাই, তা হলে প্রাণে মারব না।'

জালের ভিতর হোয়াইটের সঙ্গে মার্কোসও আছে। পাগলা কুকুরের মত। আচরণ করছে সে, রানার কথা শুনে ক্রোধ ফুটল তার চেহারায়। খেপাটে গলায় বলল,'কুত্তার বাচ্চা! আমাকে অস্ত্র ফেলতে বলিস? আজ যদি তোকে...'

'বোকামি কোরো না,' রানা বলল। 'নিরস্ত্র-অসহায় কয়েকজন মানুষকে খুন করতে এসেছিলে... তোমাদের মত লোকদের আমি কোনও দয়া দেখাব না। তেড়িবেড়ি করলে সোজা দোজখে পাঠিয়ে দেব।'

'তার আগে আমিই তোকে পাঠাচ্ছি...' বলতে বলতে হাতের অস্ত্রটা তুলল মার্কোস।

একটু নড়ল না রানা, পলকও ফেলল না, শুধু ওর রাইফেলটা গর্জে উঠল। কপালে একটা তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হলো মার্কোসের, বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে উল্টে পড়ে গেল লাশটা। দেরি না করে অস্ত্র ফেলে দিল সবাই।

গাছ থেকে নেমে এসেছে মারিয়া আর অপূর্ব, ইশারায় ওদেরকে জালটা সরিয়ে নিতে বলল রানা। তারপর বন্দিদের হুকুম দিল, 'উঠে দাঁড়াও। আস্তে আস্তে উঠবে, কেউ বেমক্কা কিছু করার চেষ্টা করলে মার্কোসের দশা হবে।'

আদেশটা পালন করতে দ্বিধা করল না কেউ, তবে উঠে দাঁড়াবার পর হোয়াইটের চোখে আগুন জ্বলতে দেখা গেল। হিসিয়ে উঠে বলল, 'বিরাট ভুল করলে তুমি, রানা। কার সঙ্গে লাগতে গেছ, সে-ব্যাপারে কোনও আইডিয়াই নেই তোমার।'

'ঠ্যাং-ভাঙা নেড়ি কুকুরের আচরণ করছ, হোয়াইট,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল রানা। 'আর যদি বাড়াবাড়ি করো, তা হলে এরচেয়েও তলায় নেমে যাবে তুমি, হোয়াইট... শকুনের খাবার হবে।'

'আমাদের মেরে ফেলবে তুমি?'

'সেটাই উচিত নয়? তোমার জায়গায় আমরা থাকলে তুমি কী করতে?'

'কিন্তু আমার আর তোমার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক আছে, রানা,' বলল হোয়াইট। 'তোমাকে দেখে ঠাণ্ডা মাথার খুনি মনে হয় না।'

'ঠিক। তোমার মত অপ্রয়োজনে খুন করি না আমি। পাষণ্ড নই, তবে দয়ার সাগরও নই,' একই ভঙ্গিতে বলল রানা। 'তাই তোমার সব লোককে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে যাব আমি, পুলিশ নিয়ে ফিরে আসব পরে। তার আগে যাদ ছুটতে পারে, আর পায়ে হেঁটে জঙ্গল পাড়ি দিতে পারে... ওরা মুক্ত!'

ঢোঁক গিলল হোয়াইট, খুব ভাল করেই জানে -আমাজনের ভয়াবহ জঙ্গল পায়ে হেঁটে পাড়ি দেয়া অসম্ভব। সরাসরি না হলেও, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছে

আসলে রানা। শত্রুদের জীবন নেয়ার দায়িত্ব নিজে না নিয়ে দিচ্ছে নিষ্ঠুর প্রকৃতি আর বুনো জানোয়ারদের উপর।

‘এত ভয় পাচ্ছ কেন?’ বলল রানা। ‘তোমার ভয় কী? তুমি তো ওদের সঙ্গে থাকছ না।‘

‘থাকছি না?’ কথাটার মানে বুঝতে পারছে না হোয়াইট।

‘না, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে... নদীর আরও উজানে। দেখিয়ে দেবে, ওখানে কী অপারেশন চালাচ্ছ তোমরা। বুঝেছ?’

প্রতিবাদ করল না হোয়াইট, জানে তাতে লাভ নেই। মোঘলের হাতে পড়েছে, খানা না খেয়ে উপায় নেই। পরাজিত সৈনিকের মত কাঁধ ঝাঁকাল সে। গোপন অপারেশন সংক্রান্ত তথ্যটাই এখন তার জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় -সেটা সে খুব ভাল করে জানে। অনেক ঝামেলা করে তাকে জায়গামত আটকেছে মাসুদ রানা, ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই। তবে গোপন একটা আশাও উঁকি দিল হোয়াইটের মনের কোণে। বাঙালি লোকগুলোর ধারণাই নেই, কীসের বিরুদ্ধে নেমেছে ওরা। অপারেশন সাইটে ওদের যাওয়া-না-যাওয়ায় কিছু এসে যায় না, সবকিছু আগের মতই এগোবে। বলা যায় না, অতি-কৌতূহল ওদের বিপদও ডেকে আনতে পারে। জায়গামত পৌছে শুধু সামান্য একটা সুযোগ প্রয়োজন হবে তার। একটামাত্র সঙ্কেত দিতে পারলে হয়, মাসুদ রানা আর তার চ্যালারা জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না ওখান থেকে।

রানা অবশ্য এত কিছু ভাবছে না। ওর মাথায় ঘুরছে একটাই চিন্তা – এবার হয়তো রহস্যটার একটা জবাব পাওয়া যাবে। নদীর উজানে নির্মাণসামগ্রী আর হারানো আদিবাসীদের দিয়ে কী করা হচ্ছে -সেটা জানা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

উনিশ

রাতের বেলা জার্নি করবার কোনও ইচ্ছে নেই মাসুদ রানার, পরাস্ত শত্রুপক্ষের আহত লোকগুলোকে বন্দি করার পর বার্জে ফিরে এল বটে, তবে উজানের দিকে রওনা হলো না। সবার সঙ্গে কথা বলে পরদিন সকালে যাত্রা শুরু করবার সিদ্ধান্ত নিল ও।

হোয়াইটকে নিয়ে আসা হয়েছে বার্জে, রাতে ঘুমাতে যাবার আগে বেশ কিছুক্ষণ তাকে ইন্টারোগেট করল ওরা। তবে তাতে খুব একটা উপকার হলো না। লোকটা অত্যন্ত ধুরন্ধর, কথা বলে ঠিকই, কিন্তু অর্ধেক রহস্য পেটের ভিতর রেখে দেয়। পুরোটা খোলাসা করে না। রেগে গিয়ে ওকে খানিক টর্চারও করল জুলফিকার, কিন্তু তারপরেও লোকটাকে ঝেড়ে কাশানো গেল না।

রাতের খাবার খেতে গিয়েছিল রানা, ফিরে এসে দেখল -ডেকের উপর পড়ে হাঁপাচ্ছে হোয়াইট, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। 'কী, মুখ খুলবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'খামোকা সময় নষ্ট করছ তুমি, রানা,' গোঁয়ারের মত বলল হোয়াইট। 'কিচ্ছু বলব না আমি, কারণ বললেই আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তোমার কাছে। তখন তুমি আমাকে মেরে ফেলবে।'

'সবাইকে নিজের মত ভাবছ তুমি,' রানা বলল। 'কেউ অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলেই তোমার মত তাকে কবর দিই না আমি। নির্ভয়ে মুখ খুলতে পারো।'

কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে রানার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল হোয়াইট, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ঠিক আছে, তোমাদের আমি নদীর উজানে... আমাদের কনস্ট্রাকশন সাইটে নিয়ে যাব। তবে তার বেশি কিছু আমার কাছে আশা কোরো না।'

'আমাদের বলতে কাদের বোঝাতে চাইছ?'

‘সেটা ওখানে গেলেই দেখতে পাবে,’ শারীরিক কষ্ট ছাপিয়ে হালকা একটা হাসি ফুটল হোয়াইটের ঠোঁটে। ‘তবে না-জানাটাই মঙ্গল হবে তোমাদের জন্য। আগেই বলেছি, বিরাট ভুল করছ তোমরা। ভাবছ, আমিই সবকিছুর মূলে? মোটেই না, আমি স্রেফ একটা চুনোপুটি। আসল রাঘব-বোয়ালেরা রয়েছেন ওখানে। ওঁরা তাদের কীর্তি-কাহিনি জানতে পারবেন, দুনিয়ার কোথাও লুকিয়ে বাঁচতে পারবে না।’

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। ‘কারা হয়ে কাজ করছ তুমি? কারা ওরা?’

জবাব না দিয়ে হাসিটা আরও বিস্তৃত করল হোয়াইট। ‘তোমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে, রানা। ভাল চাও তো ওদের ঘাটাতে যেয়ো না। চুপচাপ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, হয়তো মাফ পেয়ে যেতে পারো।’

‘গুণ্ডা-বদমাশদের কাছে মাফ চাইবার অভ্যেস নেই আমার,’ হালকা গলায় বলল রানা। ‘বরং ওদেরকেই মাফ চাইতে বাধ্য করি।’

‘সেক্ষেত্রে মরবে তুমি!’ ভয় দেখানোর সুরে বলল হোয়াইট, একে একে তাকাল সবার দিকে। মরবে তোমরা সবাই।’

‘অ্যাই ব্যাটা!’ ধমক দিয়ে উঠল অপূর্ব। ‘তোকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলেছে কে? জ্যোতিষ সাজছিস? ঠিক জায়গা মত আমাদের নিয়ে যাবি কি না, সেটা বল।’

‘যাব, নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বলল হোয়াইট। ‘নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে তোমাদের খুশিমনেই নিয়ে যাব আমি।’

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই বার্জ নিয়ে রওনা হলো অভিযাত্রীরা, হোয়াইটের লঞ্চটাও পিছনে টো করে নিয়ে আসছে। আবার সেই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর যাত্রা শুরু হলো, তবে সৌভাগ্যক্রমে ভ্রমণটা খুব একটা দীর্ঘ হলো না। তিন ঘণ্টা

পর জুরুয়ার উজানে খরস্রোতা একটা অংশে এসে পৌঁছুতেই মারিয়া জানাল, এখানেই সবসময় মালামাল আনলোড করে ও।

তীক্ষ্ণ চোখে জায়গাটা দেখল রানা, তবে কোনও পাহারাদার চোখে পড়ল না। ডকও নেই ওখানে। মারিয়া বলল, তীরের কাছাকাছি নোঙর করে ও, মালামাল সব নেয়া হয় নৌকার মাধ্যমে।

'তোমাদের কনস্ট্রাকশন সাইট আর কতদূরে?' বন্দিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কাছেই,' শান্তস্বরে জানাল হোয়াইট, আঙুল তুলে বামে একটা খাল দেখাল। 'ওটা ধরে পনেরো মিনিট যেতে হয়।'

'বার্জ ঢুকবে না ওখানে,' খালের মুখটা দেখে বলল মারিয়া।

'লঞ্চটা নিয়ে গেলে কেমন হয়?' পরামর্শ দিল রাজিব।

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'খালটা যেহেতু একমাত্র অ্যাকসেস রুট, ওটার ওপর চোখ রাখবে ওরা। অপরিচিত কাউকে ঢুকতেই দেবে না।'

'তা হলে?'

মারিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'নোঙর করো, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পায়ে হেটে যাব আমরা। হোয়াইট আমাদের গাইড করবে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই পারে নামল সবাই, অস্ত্রের মুখে ওদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল বন্দি দুর্বৃত্ত। কিছুক্ষণ এগোনোর পরেই আবছাভাবে কানে ভেসে এল নানা রকমের শব্দ। যতই ওরা এগোল, শব্দের তীব্রতা ততই বাড়তে থাকল। কান পেতে শব্দগুলো কীসের, তা বোঝার চেষ্টা করল রানা, কিছুটা সফলও হলো। মানুষের হাঁকডাক, হাতুড়ি পেটা, করাত চালানো, কংক্রিট মিক্সারের গুমগুম... একে একে আলাদা করতে পারল ও। নির্মাণকাজ চলবার সময় এসব আওয়াজ অস্বাভাবিক নয় মোটেই।

জলপথে পনেরো মিনিটের রাস্তা, তবে বিকল্প রাস্তায় ঝোপঝাড় ভেঙে এগোনোর কারণে বাড়তি আরও দশ মিনিট খরচ হলো ওদের। ঝোপঝাড় ভেঙে এগোলো দলটা, যতটা সম্ভব কম শব্দ করছে, কথা বলছেই না প্রায়, যদি বলতেই হয় তা হলে ফিসফিস করছে। এলাকাটায় শত্রুদের সেন্ট্রি থাকার কথা, তাদের হাতে ধরা পড়তে চায় না ওরা। পুরো পঁচিশ মিনিট পর গন্তব্যে পৌঁছুল ওরা। হোয়াইটকে পিছনে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এল রানা আর জুলফিকার, ঝোপের আড়াল থেকে সন্তর্পণে উঁকি দিল সামনে।

কনস্ট্রাকশন সাইটটা, বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। আমাজনের চিরহরিৎ পরিবেশ অদৃশ্য এখান থেকে -গাছপালা কেটে ন্যাড়া করে ফেলা হয়েছে পুরো এলাকা, সবখানে মুখ ব্যাদান করে রয়েছে লালচে মাটি। গর্ত খোঁড়ার জন্য একটা বিস্ফোরণ ঘটল কোথাও, বেশ খানিকটা জায়গা ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার ফলে। বেশ কয়েকটা ট্রাক্টর রয়েছে ওখানে, কাজে ব্যস্ত -গর্ত থেকে উঠে আসা মাটি আর পাথরের স্তূপ সরাচ্ছে। বিশাল একটা ক্রেনও চোখে পড়ল -একের পর এক ভারি স্টিলের গার্ডার বসাচ্ছে নির্মাণাধীন একটা কাঠামোতে, ওটা দেখতে অনেকটা সাইলো-র মত।

তবে সবকিছু ছাড়িয়ে রানার নজর আটকে গেল সাইটে কর্মরত মানুষগুলোর উপর। প্রথম দেখাতেই ওদের সেই অপহৃত আদিবাসী বলে চিনতে পারল ও, একেকজনের চেহারা আর গায়ের রং-ই বলে দিচ্ছে পরিচয়টা। দৃশ্যটা অদ্ভুত, দেখে মনে হতে পারে মধ্যযুগে ফিরে গেছে ওরা, যখন দাসপ্রথা চালু ছিল। রাগে মাথার তালু জ্বলে উঠল রানার, হোয়াইটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এভাবেই মানুষকে ব্যবহার করো তোমরা?'

জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাকাল হোয়াইট।

বাদামি চামড়ার আদিবাসীদের সবার হাতে-পায়ে শেকল, ঠিক পুরনো আমলের আফ্রিকান ক্রীতদাসদের মত। পরনেও একটা করে নেংটি ছাড়া আর

কিছু নেই মানুষগুলোর। ওই অবস্থাতেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যাচ্ছে তারা - মাটি কাটছে, পাথর ভাঙছে, রাজমিস্ত্রির কাজ করছে... ফাঁকি দিতে পারছে না কেউ। চাবুক হাতে এদের কাজ করাবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশ কয়েকজন ওভারশিয়ার, রানার চোখের সামনে কয়েকজন শ্রমিককে চাবুকপেটা করা হলো।

দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠল মারিয়া। 'হা যিশু! গ্রামের ছেলেগুলোকে কিনে এনে এভাবে কষ্ট দেয় পাষণ্ডটা! পিরানহা জানে এ-কথা?'

'জানলেই বা কী করবে?' অবহেলার সুরে বলল হোয়াইট। 'প্রতিবাদ করবে? ওর জন্যেও মরণ লিখে রেখেছি আমরা... মরণ অপেক্ষা করছে তোমার আর ওই জংলি দলের জন্যও। কেউ দু'দিন আগে, কেউ দু'দিন পরে মরবে... আর কিছু না। কাউকেই আমাদের গোপন অপারেশনের কথা প্রকাশের সুযোগ দেয়া হবে না, প্রতিবাদ করা বা আমাদের বাধা দেয়া তো অনেক পরের কথা।'

'কী বানাচ্ছ তোমরা?' জানতে চাইল তৌহিদ।

'দেখেও বুঝতে পারছ না?' হাসল হোয়াইট। 'তোমরা তো দেখি একেবারে নিরেট মূর্খ!'

আবার কনস্ট্রাকশন সাইটের দিকে চোখ ফেরাল রানা। প্রথমে দর্শনে মাইনিং অপারেশন বলে মনে হচ্ছে প্রজেক্টটাকে। যদি তা-ই হয়, তা হলে বনভূমির এ-ধ্বংসযজ্ঞ কেবল শুরু, খুব শীঘ্রি দলে দলে আরও হায়েনা ছুটে আসবে খনিজ সম্পদের খোঁজে। পরিবেশ দূষিত করে, মূল্যবান রাবার আর ম্যানগ্রোভ গাছ কেটে পৃথিবীর শেষ অকৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশের সর্বনাশ করে ছাড়বে তারা। প্রারম্ভটা ভীতিকর -প্রজেক্টের লোকেরা এখানকার অসহায় মানুষদের শেকল পরিয়ে জানোয়ারের মত ব্যবহার করতে শুরু করেছে... কাজ শেষে খুন করে ফেলার মতলব এঁটেছে... শুরুটাই যদি এমন হয়, তা হলে ভবিষ্যতে এ-অনাচার আরও কতদূর গিয়ে পৌঁছুবে, কে জানে!

সত্যিই কি এটা মাইনিং অপারেশন? মাইনিঙের জন্য এতগুলো নিরীহ মানুষকে খুন করার প্রয়োজন পড়ে কি? পিছনদিকে তাকাল ও, জিজ্ঞেস করল,

‘বিনকিউলার এনেছ কেউ?’

‘এনেছি তো!’ সচকিত হয়ে বলল মারিয়া, তাড়াতাড়ি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বের করে দিল দূরবীনটা। ‘এই নিন।’

‘থ্যাঙ্কস্,’ বলে জিনিসটা নিল রানা, চোখে তুলে তাকাল সাইটের দিকে।

এক লাফে সবকিছু যেন চলে এল চোখের সামনে, পরিষ্কারভাবে সাইটের খুঁটিনাটি দেখতে পেল ও। প্রথমেই সাইলোর মত কাঠামোটার উপর নজর দিল, ফানেল-জাতীয় আকৃতিটা কেন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে ওর কাছে। ভাবনায় ডুবে গেল ও স্মৃতিটা চাঙ্গা করার জন্য। তারপর... হঠাৎই বুঝতে পারল কীসের দিকে তাকিয়ে আছে ও। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য... অসম্ভব... কিন্তু বাস্তব!!

‘নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর!’ ঘোর লাগা গলায় বলল রানা। ‘ওরা একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বানাচ্ছে!’

কথাটা শুনে চোখ কপালে উঠল দলের সবার। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল ওরা সাইটের দিকে। রানা কোথাও ভুল করছে না তো? আমাজনের দুর্গম জঙ্গলের ভিতরে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বানাবে কেন কেউ?

সঙ্গীদের অবিশ্বাসের কারণটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার, ও নিজেও ধাঁধায় পড়ে গেছে। তারপরেও সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, সত্যিই একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বসানো হচ্ছে এখানে। নির্মাণাধীন ওই অদ্ভুত ডিজাইনের কাঠামো পৃথিবীতে আর কোনও কাজে ব্যবহার হয় না।

এবার হোয়াইটের দিকে ঘুরে গেল সবার চোখ, নীরবে ওদের সন্দেহটার ব্যাপারে সত্যতা যাচাই করতে চাইছে। কিন্তু কথা বলল না ধুরন্ধর লোকটা, মুচকি হাসল শুধু।

'ব্যাপারটা আরেকটু ভাল করে দেখা দরকার,' রানা বলল। 'আমি আর জুলফিকার একটু এগিয়ে যাচ্ছি; তৌহিদ-অপূর্ব, তোমরা বাকিদের নিয়ে এখানেই থাকো।'

গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে ক্রল করে এগোতে শুরু করল দুই বিসিআই এজেন্ট, কিছুদূর যেতেই দুটো ট্রিপ-ওয়ায়্যার পেল দশ গজ পর পর –টান খেলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে। সাবধানে ওগুলোকে টপকাল ওরা, মিনিট দশেকের মধ্যেই সাইটের ত্রিশ গজের ভিতরে পৌঁছে গেল।

সামনেই একটা ফাঁকা জায়গা... ডাম্পিং-গ্রাউণ্ড। কনস্ট্রাকশন ওঅর্কের ফলে তৈরি হওয়া নানান রকম আবর্জনা আর মাটি-পাথর এনে ফেলা হয় ওখানে। এগিয়ে গিয়ে বিশাল একটা স্তূপের আড়ালে আশ্রয় নিল রানা ও জুলফিকার, ভাল করে দেখছে পুরো জায়গাটা।

ডাম্পিং গ্রাউণ্ড থেকে সামান্য দূরে লিভিং এরিয়া -বেশ কিছু তাঁবু খাটানো রয়েছে ওখানে। বেশ কর্মতৎপরতা দেখা গেল তাঁবুগুলোর আশপাশে। শ্রমিকরা যদিও ধারে-কাছে ঘেঁষছে না, কিন্তু কিছুক্ষণ পর পরই ওখানে আসা-যাওয়া করছে ওভারশিয়ার আর সাদা চামড়ার লোকজন। সম্ভবত লিভিং এরিয়া থেকেই পুরো অপারেশনটা পরিচালনা করছে রহস্যময় লোকগুলো। কাছেই একটা হেলিপ্যাড আছে, কিন্তু ওটা খালি। ফ্ল্যাপ তোলা একটা তাঁবুর ভিতরে বেশ কিছু অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট দেখতে পেল ওরা।

যতই দেখছে, ততই চিন্তায় পড়ে যাচ্ছে রানা। বিশাল একটা অপারেশন চলছে এখানে -বেসরকারী পর্যায়ে তো দূরের কথা, এমনকী সরকারী পর্যায়েও একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর স্থাপন করা যা-তা কাজ নয়। তার ওপর প্রচুর গোপনীয়তা পালন করছে এরা। প্রকাশ্যে মারিয়া গোমেজ বালু-সিমেন্ট বয়ে এনেছে বটে, কিন্তু রিঅ্যাক্টরের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, প্লুটোনিয়াম... এসব আনা হয়েছে অন্যভাবে, সম্ভবত এয়ারলিফট্ করে। সেক্ষেত্রে বহু জায়গায় টাকা খাওয়াতে

হয়েছে, অনেকের চোখে ধুলো দিতে হয়েছে -ঝামেলা কম নয়। এল পিরানহা, কিংবা হোয়াইটের মত চুনোপুটির পক্ষে এই ব্যাপক আয়োজন পরিচালনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আরও বড় কোনও ঘুঘু জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে -এই ধরনের একটা প্রজেক্ট সফল করবার মত টাকা ও ক্ষমতা... দুটোই যার আছে। কে সে?

'মাসুদ ভাই।' চাপা গলায় ডেকে উঠল জুলফিকার, 'আঙুল তুলে রেখেছে উপরদিকে। 'দেখুন!'

চোখ ঘোরাতেই আকাশের গায়ে একটা কালো বিন্দু চোখে পড়ল, একটু পরেই ভেসে এল রোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। বিন্দুটা বড় হতে হতে ঝকঝকে একটা বেল হেলিকপ্টারে পরিণত হলো, ওটার পাখার বাতাসে চারপাশে ধুলোবালির ঝড় উঠল। সাইটের উপরে পৌঁছে একটু হোভার করল কপ্টারটা, তারপর নেমে এল হেলিপ্যাডে। কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে তৈরি ছিল সাইটের ফোরম্যান, কপ্টারটার চাকা মাটি স্পর্শ করতেই ছুটে গেল ওরা।

কাঠের তৈরি মাঝারি আকৃতির কয়েকটা ক্রেট নামানো হলো কপ্টারের পিছন থেকে। মাথায় আর ঘাড়ে তুলে শ্রমিকেরা ওগুলো নিয়ে গেল বড় একটা তাঁবুর সামনে। একটু পরেই লম্বা-চওড়া এক লোক বেরিয়ে এল তাবু থেকে – পিছন ফিরে রয়েছে বলে তার চেহারা দেখা গেল না, তবে হাঁটাচলায় সামরিক ভঙ্গি এবং একরোখা একটা ভাব পরিস্কার টের পাওয়া গেল। খাকি রঙের এক ধরনের ইউনিফর্মও রয়েছে লোকটার পরনে, এগিয়ে গিয়ে ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

একটা ক্রেটের ঢাকনা খুলে ফেলা হয়েছে ততক্ষণে, সেখান থেকে ধাতব একটা বস্তু বেরুল -আকারটা চোঙার মত, শরীরটা রূপালি। হাতে ধরা একটা ব্লু-প্রিন্টের সঙ্গে জিনিসটা মেলাতে শুরু করল তাঁবুর লোকটা। কিছু একটা গড়বড় বোধহয় হয়েছে ডিজাইনের সঙ্গে, আচমকা খেপে উঠতে দেখা গেল

তাকে। হাত নেড়ে শাসাতে শুরু করল ফোরম্যানকে, আর তাতে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল ফোরম্যান। আনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা -তা হলে এই লোকই নাটের গুরু।

চোঙার মত জিনিসটার উপর আবার নজর দিল ও, বোঝার চেষ্টা করছে-জিনিসটা কী। আচমকা শিরদাঁড়া দিয়ে, একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল ওর, পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

'জুলফিকার, ওটা একটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেডের খোলস!'

'খোলস।' বিস্মিত হলো জুলফিকার। 'আমার কাছে তো ওঅরহেডই মনে। হচ্ছে।'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। আস্ত ওঅরহেড হলে ওজন অনেক বেশি হত, একজন মাত্র লোক কাঁধে তুলতে পারত না।'

'কিন্তু শুধু খোলস দিয়ে কী করবে?'

সঙ্গীর দিকে তাকাল রানা। 'এখনও বুঝতে পারছ না? ওরা আসলে নিউক্লিয়ার ওয়েপনের একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বানাচ্ছে। এ-ধরনের কারখানায় প্রচুর এনার্জির প্রয়োজন হয় -ইকুইপমেন্ট চালু রাখার জন্য। রিঅ্যাক্টরটা দরকার হচ্ছে সেজন্যেই।'

'অ্যাঁ!'

বিশ

'কী বলছেন, মাসুদ ভাই।' হতচকিত কণ্ঠে বলল জুলফিকার। 'এখানে নিউক্লিয়ার ওয়েপন বানাবে কে? কেন?'

কথা শেষ হয়েছে প্রজেক্ট-লিডারের, উল্টো ঘুরে তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে সে... এবার তার চেহারাটা দেখতে পেল ওরা। লোকটাকে চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না জুলফিকারের। অবাক হয়ে ও বলল, 'ইয়াল্লা! এ দেখছি আলবার্তো পেরেইরা!'

'কে?' নামটা অপরিচিত রানার কাছে।

'নামকরা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা আর পেরুতে কমপক্ষে আটটা বড় বড় ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি আছে এই লোকের।'

'হুম, ব্যবসা বাড়াচ্ছে বেটা... নিউক্লিয়ার ওয়েপন ম্যানুফ্যাকচারিঙে নাম লেখাচ্ছে।'

'আমার তা মনে হয় না, মাসুদ ভাই। ব্যবসা নয়, আরও বড় কোনও মতলব আছে এর।'

'একথা ভাবছ কেন?'

'আপনাকে বলা হয়নি, এই লোকই উপরমহলে দেন-দরবার করছিল রাজিব আবরারকে এক্সপিডিশনের অনুমতি না-দেবার জন্যে। তাই লোকটার ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করেছি আমি। যা বেরিয়ে এসেছে সেটা মোটেই সুবিধের নয়।'

'কী জানতে পেরেছ?'

'ওর ঠিকুজি-কোষ্ঠী দারুণ গোলমেলে, মাসুদ ভাই। রেকর্ডে বলে, ওর বাপ চল্লিশের দশকে পেরু থেকে ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে এ-দেশে এসেছিল, কিন্তু সেটা ডাহা মিথ্যে। ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর ধারণা, লোকটা আসলে এসেছিল জার্মানি থেকে। পেরেইরার বাপ হিটলারের দোসর ছিল।'

'হিটলারের দোসর!'

‘হ্যাঁ, মাসুদ ভাই। সন্দেহটা জোরালো হয়েছে নাৎসিবাদী কিছু সংগঠনের সঙ্গে পেরইরার সংশ্লিষ্টতার গুজব ছড়িয়ে পড়ায়। এটা মোটামুটি নিশ্চিত, ওদেরকে নিয়মিত চাঁদা দেয় লোকটা; তবে তার প্রমাণ নেই কোনও।’

‘কোনও তদন্ত হয়নি?’

‘হবে কী করে? দক্ষিণ আমেরিকায় যত মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তা আছে, তার অন্তত অর্ধেক লোক পেরেইরার পকেটে।’

কথাটার সত্যতা টের পেল রানা হেলিকপ্টার থেকে সুটপরা এক লোককে নামতে দেখে। চেহারাটা অতি-চেনা... প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তা আর্মান্দো গার্সিয়া -ব্রাসিলিয়ার এয়ারপোর্টে এই লোকই ওদেরকে আমাজনে আসতে নিষেধ করছিল, ভয় দেখাচ্ছিল... নিশ্চয়ই পেরেইরার নির্দেশে। গম্ভীর গলায় ও বলল, ‘তোমার কথাই যদি ঠিক হয়ে থাকে, জুলফিকার, তা হলে এটা নিয়ো-নাৎসিদের অপারেশন... ওরা নিউক্লিয়ার-পাওয়ার কব্জা করার চেষ্টা করছে!’

‘আমারও তা-ই ধারণা, মাসুদ ভাই। ব্যবসা করার জন্য কোনও ফ্যাক্টরি বানাচ্ছে না পেরেইরা।’

সন্দেহটা যে ভুল নয়, সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল ফোরম্যানের কাছাকাছি এসে একজন ওভারশিয়ারকে স্যালুট দিতে দেখে -ঠিক পুরনো আমলের নাৎসিদের কায়দায় সামনের দিকে ডান হাত তুলে সম্মান জানাল সে, মুখে হাইল হিটলার-টুকুই বলল না শুধু। ব্যাপারটা লক্ষ করে বিবমিষা অনুভব করল রানা -হিটলার মরে গেছে ঠিকই, কিন্তু তার প্রেতাত্মা আজও সুন্দর পৃথিবীটাকে দূষিত করে চলেছে। নিয়ো-নাৎসিদের সঙ্গে অতীতে একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছে ওর, প্রতিবারই প্রমাণিত হয়েছে -এরা স্রেফ টেরোরিস্ট ছাড়া আর কিছু নয়। হিটলারের স্বপ্নের আর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য গোটা মানবজাতির বিরুদ্ধে এরা ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। মাফিয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই সংগঠনটা, একটা মাথা কাটলে দশটা মাথা গজায়। কয়েক মাস আগে গ্রিনল্যান্ডে এদের একটা

অপারেশন ব্যর্থ করে দিয়েছিল রানা, খতম করে দিয়েছিল ফ্রেডারিখ কার্ন নামে এদের এক নেতাকে। কিন্তু তারপরেও মুখ থুবড়ে পড়েনি সংগঠনটা, আলবার্তো পেরেইরার নেতৃত্বে নতুন মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে –পারমাণবিক শক্তির মালিক হতে চাইছে এরা এবার... আর একদল সন্ত্রাসবাদীর হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকার পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা অকল্পনীয়।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা -যে করে হোক, ঠেকাতে হবে এদের।

ক্রল করে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল রানা আর জুলফিকার। দলের বাকিদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে জানাল কী দেখে এসেছে।

দুই বিসিআই এজেন্টের কথা শুনে হেসে উঠল হোয়াইট।

'মাথায় ঘিলু আছে তা হলে! সব বুঝে ফেলেছ দেখছি।'

এগিয়ে গিয়ে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল রানা। 'একটা জিনিস শুধু পরিষ্কার নয় আমার কাছে -তোমরা কীভাবে এ-ধরনের একটা প্রজেক্ট বাকি দুনিয়ার কাছে গোপন করবার প্ল্যান করেছ? শুধু নদীতে অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকিয়ে, কিংবা চাক্ষুষ সাক্ষীদের খুন করে ধামাচাপা দেয়া সম্ভব নয় ব্যাপারটা। পারমাণবিক চুল্লী ডিটেক্ট করবার আরও অনেক কায়দা আছে।'

'স্যাটেলাইটের কথা বলছ তো?' গর্ব ফুটল হোয়াইটের কণ্ঠে। 'তাতে কিছুই ধরা পড়বে না। কারণ আমরা অনেক গবেষণা করে বের করেছি, আমাজনের এই অংশটা দুনিয়ার সমস্ত স্পাই স্যাটেলাইটের ব্লাইণ্ড আর্কের মধ্যে পড়েছে। ফ্যাক্টরির সাইট হিসেবে সেজন্যেই বেছে নেয়া হয়েছে এ-জায়গা। স্বীকার করি, একটা সময়ে এদিকে নজর দেয়া হতে পারে, কিন্তু ততদিনে যথেষ্ট পরিমাণ নিউক্লিয়ার মিসাইলের স্টক তৈরি হয়ে যাবে, ফ্যাক্টরিটার লোকেশন তখন ফাঁস হয়ে গেলেও আমাদের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।'

কোনও কথা ফুটল না কারও মুখে -বুঝতে পারছে, মিথ্যে বড়াই করছে না হোয়াইট। নাৎসিদের প্ল্যানটা সত্যিই নিখুঁত। একবার যদি এরা মিসাইলগুলো বানিয়ে ফেলতে পারে, তা হলে কারও পক্ষেই কিছু করা সম্ভব হবে না। যেখানে-সেখানে হামলা চালিয়ে পুরো পৃথিবীকে জিম্মি করে ফেলতে পারবে এরা তখন।

'কিচ্ছু করার নেই তোমাদের, বাছারা,' উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল হোয়াইট। 'আগেই সাবধান করেছিলাম, বলেছিলাম কেটে পড়তে, তোমরা সে সুযোগ নাওনি। উল্টো এখানে এসে আমাদের সমস্ত গোপন কথা জেনে ফেলেছ। এ খবর কোনও অবস্থাতেই আমরা ফাঁস হতে দিতে পারি না। এখন আর তোমাদের কিছুতেই বাঁচতে দেয়া হবে না। নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়েছ তোমরা।'

'তুমি বাঁচবে ভেবেছ?' রাগী গলায় বলল রাজিব। 'যখন তোমার দোস্তরা জানতে পারবে যে, আসল ডিউটি বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত লাভের জন্য তুমি হারানো শহরের গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলে... তখন ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে মনে করেছ?'

'আমি বলব, নিজের লাভের জন্য লস ডেল রিয়োতে যাইনি আমি,' ভাবলেশহীন গলায় বলল হোয়াইট। 'সমস্ত গুপ্তধন আমি আমাদের আদর্শের জন্য উৎসর্গ করতাম। আমি ফ্যাসিবাদের একজন সত্যিকার অনুসারী, মোহ বলে কোনও জিনিস আমার মধ্যে নেই। আমার এসব কথা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করবে আমাদের নেতা।'

'কিন্তু আমরা জানি, তুমি ব্যক্তিগত মুনাফা লুটতে চেয়েছিলে!'

'যা খুশি বলতে পারো,' অহংকারী ভঙ্গিতে বলল হোয়াইট। 'আমি সব টাকা এখানেই খাটাতাম ভাল একটা পজিশনের বিনিময়ে। জেনে রাখো, খুব শীঘ্রিই ফ্যাসিবাদের বিজয়নিশান উড়তে চলেছে।'

‘যদি আমরা তার আগেই তোমাদের এই সাধের প্রজেক্ট গুঁড়িয়ে দিতে না পারি।’

‘কে? তোমরা?’ হেসে উঠল হোয়াইট। মাত্র সাতজন মানুষ... যার মধ্যে তিনজন হচ্ছে একেবারেই আনাড়ি; তোমরা আমাদের অপারেশন বন্ধ করে দেবে? নাহ্, দিবাস্বপ্নের যে কোনও সীমা-পরিসীমা থাকে না, সেটা প্রমাণ করে দিলে তোমরা!’

‘দিবাস্বপ্ন, নাকি বাস্তবতা, সেটা শীঘ্রিই টের পাবে তুমি,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘রাজিব, ব্যাটা বড্ড বকবক করছে। ওর মুখটা বেঁধে ফেলো তো।’

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা বড় রুমাল বের করে এগিয়ে গেল রাজিব, কিন্তু ও কাছাকাছি পৌঁছুতেই আচমকা নড়ে উঠল হোয়াইট... মাথাটা নিচু করে কপাল দিয়ে সজোরে আঘাত করল অপ্রস্তুত আর্কিয়োলজিস্টের মাথার এক পাশে। আচমকা আক্রমণে চিত হয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে।

ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গেছে সবাই, আর এই সুযোগটাই কাজে লাগাল হোয়াইট, ঘুরেই দৌড় দিল। হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা তার, ঠিকমত ছুটতে পারছে না, তারপরেও থামছে না... ঝোপঝাড় ভেঙে পালাবার চেষ্টা করছে।

প্রমাদ গুনল রানা, গুলি করা যাবে না, আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসবে নিয়ো-নাৎসিরা। লোকটা চেঁচালেও সর্বনাশ! ইতিকর্তব্য ঠিক করার চেষ্টা করছে ও, এমন সময় নড়ে উঠল মারিয়া। ওর হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল নিত্যসঙ্গী ছুরিটা, দক্ষ নাইফ-থ্রোয়ারের ভঙ্গিতে বিদ্যুতের বেগে ছুঁড়ল ও।

উড়ে গিয়ে পলায়নপর হোয়াইটের পিঠে আমূল বিঁধে গেল ছুরিটা। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল নয়া-নাৎসিদের অনুসারী লোকটার, একেবারে হৃৎপিণ্ড বরাবর ঢুকেছে ওটা, শব্দ করতে পারল না চেষ্টা করেও, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। নড়ছে না অর।

'নাইস থ্রো!' প্রশংসার দৃষ্টিতে মারিয়ার দিকে তাকাল রানা।

'আগেই বলেছিলাম, ব্যবহার জানলে একটা ছুরিই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র হতে পারে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল ও। একজন মানুষ খুন করে ফেলেছে, অথচ কোনও বিকার নেই। আসলে হোয়াইটকে মানুষই মনে করেনি ও কখনও, মনে করেছে নরকের একটা বিষাক্ত কীট।

বাকিদেরও মোটামুটি একই মনোভাব। এইমাত্র ঘটে যাওয়া ব্যাপারটায় কাউকেই বিচলিত মনে হলো না। রানা শান্তভাবে অপূর্ব আর তৌহিদকে বলল লাশটা লুকিয়ে ফেলতে। মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল দুই বিসিআই এজেন্ট।

'কী করতে চান এখন, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল জুলফিকার। 'ব্রাসিলিয়ায় ফিরে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে খবর দেব?'

'তাতে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না, মাথা নাড়ল রানা। ব্রাজিলিয়ান সরকারের বেশিরভাগ লোক যেহেতু পেরেইরার কাছ থেকে মাসোহারা পায়, ওরা কিছুই করবে না ওর বিরুদ্ধে। তা ছাড়া আমরা কোনও প্রমাণও দেখাতে পারব না। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলেই আমাদের পিছনে খুনি লেলিয়ে দেয়া হবে, দেশ থেকেই হয়তো বেরুতে দেয়া হবে না।'

'তা হলে?'

'যা করবার আমাদেরই করতে হবে। নাৎসিদের অপারেশনের বারোটা বাজিয়ে দেব আমরা।'

ভুরু কুঁচকে মারিয়া বলল, 'এসব ঝামেলায় না জড়িয়ে চুপচাপ কেটে পড়াটাই কি ভাল নয়? কাউকে কিছু না বললেই আপনারা নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে পারবেন।'

'তা হয় না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'চোখের সামনে এরকম ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ড দেখেও মুখ বুজে থাকা বা আলগোছে কেটে পড়া সম্ভব নয় আমাদের

পক্ষে। অন্তত ওই আদিবাসী মানুষগুলোকে মুক্ত করতে না পারলে বিবেকের কাছে চিরকাল দোষী হয়ে থাকব আমি।'

ওর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল মারিয়া। বলে কী এই লোক? অজানা-অচেনা একদল মানুষের জন্য জীবনের ঝুঁকি নেবে ও? এর জন্য কোনও প্রতিদানও তো পাবে না, বরং বেঘোরে মারা যেতে পারে। হঠাৎ এই অকুতোভয় বাঙালি যুবকের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথাটা নুয়ে এল মারিয়ার। বুঝতে পারল, সেদিন রাতে রান যা বলেছিল, সেটা বাগাড়ম্বর নয়; সত্যিই ওরকম মানুষ আছে! এই তো, ওর সামনেই! সত্যিই মানুষটা নিঃস্বার্থ, প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই, অপরের জন্য অসীম মায়া-মমতা রয়েছে ওর ভিতরে... হোক না সে অপরিচিত, কিংবা অশিক্ষিত আদিবাসী! তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন। এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে, জানা ছিল না ওর।

'কাজটা সহজ হবে না, মাসুদ ভাই,' রানার সিদ্ধান্ত শুনে বলল জুলফিকার। 'অন্তত বিশ থেকে পঁচিশজন নাৎসি বদমাশ আছে ওখানে - আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রসহ। আমাদের লোকবল অনেক কম।'

'আরও লোক থাকলে ভাল হত,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু নেই যখন, কী আর করা? আমাদেরকেই চেষ্টা করে দেখতে হবে...'

'অস্ত্রের জন্যে ভাববেন না, লোক ক'জন লাগবে আপনাদের?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল মারিয়া। মহৎহৃদয় এই বাঙালিদের দেখে ওর ভিতর আমূল একটা পরিবর্তন এসেছে, একটা জেদও সৃষ্টি হয়েছে -ওরই স্বদেশী বন্দিদের জন্য বিদেশ-বিভুঁই থেকে আসা এই যুবকেরা যদি জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে, তা হলে ও পারবে না কেন? কেন পারবে না দেশের মাটি থেকে নাৎসিদের উৎখাত করতে? মাসুদ রানা আর সঙ্গীরা ওর ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা বিবেককে জাগিয়ে দিয়েছে, তাই যেভাবে হোক ওদের সাহায্য করবে বলে ঠিক করেছে ও।

অবাক হয়ে তাকাল রানা ওর দিকে। ‘প্রথমে বলো, অস্ত্রের জন্যে ভাবব না কেন?’

ব্যাগ থেকে খুলে নেয়া ফায়ারিং পিনগুলো বের করে এগিয়ে দিল মারিয়া। ‘এগুলো দিয়ে তো গুলি...’

‘অস্ত্রগুলো আছে আমার হোল্ডে,’ রানার মুখের দিকে চেয়ে হাসল। ‘এগুলো লাগিয়ে নিলেই ব্যবহার করতে পারবেন।’

‘আচ্ছা!’ প্রশংসা ঝরল বিদেশির মায়াময় দু-চোখ থেকে। ‘গুড। ভেরি গুড! এবার বলো, আর কজন লাগবে মানে?’

‘লোকের ব্যবস্থা আমি করে দেব, কতজন দরকার?’

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা ও জুলফিকার, কথাটার অর্থ বুঝতে পারছে না।

‘কী হলো, বলছেন না কেন?’ তাড়া দিল মারিয়া।

‘ওরাও কি তোমার বার্জের হোল্ডে...’ অপূর্বকে কথা শেষ করতে দিল না রানা। চট করে বলল:

‘দশজন হলেই চলবে... সম্ভবত। কিন্তু তুমি লোক দেবে কোত্থেকে?’

‘আমি দেব না, আমার বাবা দেবে,’ মারিয়ার কণ্ঠে রহস্য।

‘তোমার বাবা!’ বিস্ময়টা আরেক ধাপ বাড়ল রানার। ‘কোথায় তোমার বাবা?’

কথা না বলে একটু হাসল মারিয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে জবাবটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। পুরো আমাজনে একজনের হাতেই শুধু দেবার মত সশস্ত্র লোকজন আছে... সে যদি মারিয়ার পিতা হয়ে থাকে, তা হলেই কেবল মেলানো যায় এ-পর্যন্ত দেখা অসঙ্গতিগুলো। হোয়াইট যে মারিয়াকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে, সেটা জানার কথা নয় ওর... জানতে পারে শুধু ওই লোক বলে দিলে। মারিয়া যে বিনা বাধায় সবাইকে মন্টে অ্যালেগ্রায় পৌঁছে দিতে পারবে বলে

গ্যারান্টি দিচ্ছিল, সেটাও নিশ্চয়ই ওই লোক ওর বাবা বলেই। বিস্মিত রানা কোনোমতে বলল, 'ওহ নো! তুমি কি বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ, সেনিয়র রানা,' সায় দিল রহস্যময়ী মেয়েটা। 'এল পিরানহা আমার জন্মদাতা পিতা।

একুশ

বাইরে পোকামাকড় ডাকছে, দুপুরের কড়া রোদ ঝলসে দিচ্ছে ছোট্ট উঠানটা। গ্রামের পাহারায় যাদের থাকার কথা, তারা এখন যুদ্ধ করছে ঝিমুনির বিরুদ্ধে, যদিও তেমন সুবিধে করতে পারছে না। পিরানহার ডুবে যাওয়া বোটটা টেনে আনা হয়েছে, তবে এখনও ডুবে আছে ওটার পঁচাত্তর ভাগ। তন্দ্রাচ্ছন্ন দুজন ছাড়া জলদস্যুদের গোটা গ্রামেই কোনও প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, সবাই যার যার কুঁড়েতে শুয়ে দিবানিদ্রায় মগ্ন, এক ঘুমে দুপুরের উত্তপ্ত সময়টা পার করে দিচ্ছে বরাবরের মত।

এল পিরানহাও ব্যতিক্রম নয়। ভারি মধ্যাহ্নভোজের পর ক্লান্তি ভর করেছে তার স্থূল দেহে, নিজের "প্রাসাদে"-র বেডরুমে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে সে-ও। ঘুমটা বেশ গাঢ় হয়েছে, এ-কারণে তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি থাকা সত্ত্বেও ঘরে কারও ঢোকার আওয়াজ শুনতে পেল না। তবে এটুকু ব্যর্থতা সাময়িক, কয়েক সেকেণ্ড পরই সচেতন হয়ে উঠল ধুরন্ধর দস্যুসর্দার, চোখ না খুলেই সন্তর্পণে ডান হাতটা চুলকানোর ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল নকল পায়ের ট্রিগারের দিকে।

'হাতটা সরিয়ে নিলেই ভাল করবে, পিরানহা।' কামরার ভিতর গমগম করে উঠল মাসুদ রানার কণ্ঠ।

চোখ মেলল জলদস্যু, দেখল -একটা রাইফেল নিষ্কম্পভাবে ধরে রাখা হয়েছে তার দিকে। একটুও বিচলিত হলো না সে, মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'সেনিয়র মাসুদ রানা! আপনার দেখি বেড়ালের মত ন'টা প্রাণ!'

'তোমার ক'টা?' ভুরু নাচাল রানা। 'একটার বেশি যদি না থাকে তো চুপচাপ উঠে বসো। চালাকি করতে যেয়ো না, হাতদুটো এমনভাবে রাখো, যেন দেখতে পাই আমি।'

আদেশটা মেনে নিল পিরানহা, বিছানা থেকে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, 'আপনি মানুষকে চমকে দেয়ায় ওস্তাদ। পেরিমিটার গার্ড আর অ্যালার্ম সিস্টেম ফাঁকি দিয়েছেন কীভাবে?'

'তোমার মেয়ে দেখিয়ে দিয়েছে,' নির্লিপ্ত সুরে বলল রানা, দরজা ছেড়ে সরে মারিয়াকে ঢুকতে জায়গা করে দিল। পিছু পিছু ঢুকল রানার আর সব সঙ্গীও।

'না!' মেয়েকে দেখে অবিশ্বাস ফুটল পিরানহার চোখে। 'কী করে জানলেন আপনি? দুনিয়ার কেউ জানে না, ও আমার মেয়ে!'

'আমিই বলে দিয়েছি, বাবা,' জানাল মারিয়া। 'আসলে... বলে দিতে বাধ্য হয়েছি।'

উঠে দাড়িয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল পিরানহা। 'বাধ্য হয়েছিস মানে? তোর গায়ে হাত তোলেনি তো কেউ?'

'না, বাবা। এরা আমার বন্ধু, কোনও ক্ষতি করেনি।'

সন্দেহ ফুটল দস্যুসর্দারের চোখে। 'যদি বন্ধুই হবে তো অস্ত্র হাতে ঢুকেছে কেন?'

'কারণ অস্ত্র ছাড়া তোমার ঘরে বন্ধুরা ঢোকে না,' বিরক্ত গলায় বলল রানা।

হেসে উঠল পিরানহা। ‘এটা অবশ্য ঠিকই বলেছেন। কিন্তু হঠাৎ এই অধমের প্রাসাদে পদধূলি দিতে এসেছেন কেন, বলুন তো? রাজিব আবরারকে উদ্ধার করেছেন দেখতেই পাচ্ছি... আপনাদের তো এখন সোজা বাড়ির পথে ছোটার কথা।’

‘বিশ্বাস করবে কি না জানি না, তোমার সাহায্য খুব দরকার আমাদের।’

পিরানহার কপালে ভাঁজ পড়ল। ‘ঠাট্টা করছেন?’

‘না, আমি সিরিয়াস।’

‘কী এমন ঘটেছে যে, আপনি হঠাৎ আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন?’

‘হোয়াইটের লোকজনকে ঠেকাতে চাই আমরা। নদীর উজানে একটা কারখানা বানাচ্ছে ওরা...’

‘বানালে বানাক, আমার কী।’ বাধা দিয়ে বলল পিরানহা।

‘পুরোটা আগে শোনো, বাবা,’ অনুরোধ করল মারিয়া। ‘তারপর সিদ্ধান্ত নাও।’

রানার দিকে তাকাল দস্যুসর্দার। ‘ঠিক আছে, বলুন।’

‘ওটা যেন-তেন কোনও কারখানা নয়, নিউক্লিয়ার মিসাইল বানানোর কারখানা,’ বলল রানা।

ভেবেছিল চমকে দেবে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াহীন রইল পিরানহা। নীরস গলায় বলল, ‘আর?’

‘ফ্যাক্টরিটা চালু হলে এই এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের দফারফা হয়ে যাবে। তা ছাড়া ফ্যাক্টরিটা ধ্বংস করার জন্যে এ-দেশের ওপর পারমাণবিক হামলা চালাবে আমেরিকাসহ আর সব সুপারপাওয়ারগুলো।’

‘আর?’ রোবটের মত উচ্চারণ করল পিরানহা, এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই তার ভিতর।

‘গ্রাম থেকে ধরে এনে যাদের তুমি বিক্রি করেছ, তাদের ওখানে শিকল দিয়ে বেঁধে ক্রীতদাসের মত খাটানো হচ্ছে। ফ্যাক্টরিটা চালু হলে ওদের মেরে ফেলা হবে।’

‘আর?’ আবারও বলল পিরানহা।

বিরক্ত হলো রানা। ‘ওরা তোমাকে আর তোমার মেয়েকেও মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে। তোমার মোটা মাথায় কি এখনও ঢোকেনি কিছু? আরও জানতে চাও?’

চেয়ার টেনে বসে পড়ল পিরানহা। ‘সবই বুঝেছি আমি, সেনিয়র রানা। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি -আমাকে খতম করা অত সোজা না। আর বাকি যে-সব হাবিজাবি শোনালেন, সেগুলো আমার মাথাব্যথা হতে যাবে কেন, বলতে পারেন?’

‘গড়ল নাকি তুমি?’ রাগী গলায় বলল অপূর্ব। ‘বিদেশি সন্ত্রাসীরা তোমার দেশি লোকজনকে ক্রীতদাস করে ফেলছে, দেশটাকে সন্ত্রাসের আখড়া বানাচ্ছে... এটা তোমার মাথাব্যথা নয়? দুদিন পর সন্ত্রাস দূর করার নামে অ্যামেরিকানরা এসে যখন গোটা দেশটাকে ইরাক আর আফগানিস্তানের মত দখল করে নেবে তখনও কি এ-কথাই বলবে তুমি?’

চুপ করে রইল পিরানহা।

‘বাবা, তুমি-আমি দুজনেই ওদেরকে সাহায্য করেছি,’ যোগ করল মারিয়া। ‘হোক না-জেনে... তবু ব্যাপারটার দায়ভার কিছুটা হলেও আমাদের উপর এসে পড়ে।’

‘আমাকে বোকা বানানোর জন্য শুধু হোয়াইটকে শাস্তি দিতে রাজি আছি আমি,’ বলল পিরানহা। ‘কোথায় ও?’

‘ওই কাজটা আমিই সেরে দিয়েছি।’

‘তা হলে তো আমার আর কিছু করার নেই।’

‘...দেশটা ধ্বংস হয়ে গেলেও?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

মুখ বাঁকা করল পিরানহা। ‘হাহ, দেশপ্রেম... মানবতা... ন্যায়বোধ... এসব হচ্ছে স্রেফ ফাঁপা বুলি, সেনিয়র রানা। ওসবের মিথ্যে মায়ায় জীবনে বহু ঝুঁকি নিয়েছি আমি, নিজের পা-টা পর্যন্ত হারিয়েছি। সেনিয়র রানা, দেশকে যতটুকু দেয়া উচিত, তার চেয়ে বহু-বহু গুণ বেশি দিয়ে ফেলেছি আমি। আর কিছু দেয়ার ইচ্ছে বা দায়... কোনটাই আমার নেই।’

‘তোমার দুঃখটা কীসের, পিরানহা?’ নরম গলায় জানতে চাইল রানা। ‘মারিয়া আমাদের বলেছে, তুমি আসলে খারাপ মানুষ ছিলে না। সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে ডাকাতির পেশা বেছে নিয়েছ। কিন্তু কেন এই বিতৃষ্ণা? কী ঘটেছিল?’

‘সত্যি জানতে চান?’ চোখ পাকিয়ে বলল পিরানহা, রানার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে ও কতটা আন্তরিক।

‘অবশ্যই!’ রানা গম্ভীর।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল দস্যুসর্দার। ‘তা হলে এ পিরানহা নয়, ব্রাজিলিয়ান পুলিশের প্রাক্তন সাব-ইন্সপেক্টর রডরিগো গোমেজের গল্প শুনতে হবে আপনাদের। দরিদ্র পরিবারে জন্ম হয়েছিল ওর, কিন্তু মনটা দরিদ্র ছিল না। দেশের জন্য অপরিসীম ভালবাসা আর দায়িত্ববোধ নিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল ও। লেখাপড়া তেমন করতে পারেনি, এইটথ্ গ্রেড। অল্প বয়সেই জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। কী করেনি ও? জুতা পালিশ, কুলিগিরি, কাগজ কুড়ানো... সব করতে হয়েছে ওকে পেটের দায়ে। সমাজের সমস্ত নোংরা চেহারা দেখেছে ও, তারপরেও কখনও হতাশ হয়নি। যা-হোক... এক সময় সাধারণ কনস্টেবল হিসেবে যোগ দিল রডরিগো পুলিশে, দুই বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পদোন্নতিও পেল। চাকরি ছোট... বেতন অল্প, কিন্তু তাতে কোনও

খেদ ছিল না ওর মনে, বরং সরাসরি দেশের সেবা করার এত বড় একটা সুযোগ পেয়েছে বলে গর্বে বুকটা ফুলে উঠেছিল।

‘মোহটা কাটতে বেশি সময় লাগেনি রডরিগোর। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুর্নীতিবাজ আর দুষ্কৃতকারীরা পুলিশের বড়কর্তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে দেশটাকে কীভাবে চুষে ছিবড়ে করে ফেলছে -অসহায়ভাবে তা দেখতে হয় ওকে, প্রতিবাদ করতে গেলে উল্টো ওর সঙ্গেই ক্রিমিনালের মত আচরণ করা হয়। অবশ্য এতকিছুর পরও হতোদ্যম হয়নি ও, একাই সমাজে একটা ভাল উদাহরণ তৈরি করবার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু সবই যে পণ্ডশ্রম, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। সবার কাছে চিহ্নিত হয়ে গেছে সে আপোসহীন, বোকা পলিশ হিসেবে। একবার একদল ড্রাগ-চোরাচালানিকে গ্রেফতার করতে গিয়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে রডরিগো, ওদেরকে ধরতেও সমর্থ হয়... কিন্তু ওদের ফাটানো বোমায় ওর একটা পা উড়ে যায়। এই যে সাহসিকতা দেখাল রডরিগো, বিনিময়ে কী পেল ও, জানেন? চাকরিচ্যুতি... মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে! সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে ওকে স্রেফ একটা মেডেল দেয়া হলো, আর কিচ্ছু না।

‘এরপর আর কোনদিন ওর খোঁজখবর নেয়নি কেউ। দেশের সেবা করতে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়া লোকটা বাঁচল কি মরল -সেটা জানারও ইচ্ছে হয়নি কারও। ওদিকে বিনা বিচারে ছাড়া পেয়ে গেল চোরাচালানির দল, মানবিক কারণে। লেখাপড়া জানত না, একটা পা না-থাকায় শারীরিক পরিশ্রমও করতে পারত না, উপার্জনহীন হয়ে পড়েছিল রডরিগো। ওর বউ বিনা-চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মারা গেল, বাচ্চা মেয়েটাও অনাহারে-অপুষ্টিতে মরতে বসেছিল, কেউ একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করেনি। ন্যায় আর আদর্শের পূজারী হওয়ায় এই-ই হয়েছিল রডরিগোর পরিণতি।

‘তাই ওর মৃত্যু হলো একদিন, কবর থেকে বেরিয়ে এল সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ -এল পিরানহা... আমি! এখন আর অভাব নেই আমার। ভাল হোক, খারাপ হোক... মানুষের মাঝখানে একটা স্থান তৈরি হয়েছে আমার, অভাব দূর হয়েছে, নিজের সন্তানকে না-খেয়ে মরতে দেখতে হচ্ছে না। আপনিই বলুন, সেনিয়র রানা, আবারও রডরিগো গোমেজ হতে চাওয়াটা কি উচিত হবে আমার?’

পিরানহার গল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের ভাগ্যাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কাহিনির মিল পাচ্ছে রানা। মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর -দুনিয়ার দু’প্রান্তে দুটো দেশ, অথচ দু’জায়গাতেই কী অবিচার করা হয়েছে বীরযোদ্ধাদের প্রতি! দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মানেই কি বিনিময়ে অবহেলা আর গঞ্জনা পাওয়া? পিঠে রাজাকারদের লাথি খাওয়া? এটাই কি তবে দুনিয়ার নিয়ম!

‘আপনার জন্য সহানুভূতি রয়েছে আমার,’ বলল ও, দস্যুসর্দারের সত্যিকার পিরচয় জানতে পেরে সম্বোধনটা পাল্টে ফেলেছে। ‘কিন্তু তারপরেও বলব, এ-পেশা বেছে নেয়া উচিত হয়নি আপনার। দুনিয়া কী ভাবল না-ভাবল, তারচেয়ে বড় হচ্ছে আপনার নিজের মর্যাদাবোধ। বুকে হাত দিয়ে বলুন, নিজের সন্তান আর ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে কোন পরিচয়ে বাঁচতে চান আপনি – দেশপ্রেমিক রডরিগো গোমেজ, নাকি খুনে জলদস্যু এল পিরানহা হয়ে?’

জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে ফেলল পঙ্গু মানুষটা।

রানা বলল, ‘আপনার কষ্টটা বুঝতে পারছি আমি -দেশের জন্য অনেক ত্যাগ করবার পরও প্রতিদানে কিছুই পাননি। কিন্তু একজন দেশপ্রেমিক কখনও প্রতিদানের আশায় দেশের সেবা করে না, মিস্টার গোমেজ। যদি তা-ই করত, স্বার্থান্বেষী আর দশটা মানুষের সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য থাকত না।’

ঝট্ করে মাথা তুলল রডরিগো, রানার কথাটা তীরের মত বিঁধেছে তার বুকে। প্রতিবাদের সুরে বলল, ‘আমিও কখনও প্রতিদান চাইনি, সেনিয়র রানা!’

‘তা হলে আজ কেন চাইছেন? স্বীকৃতি বা প্রতিদানের চেয়ে বিবেক, মানবতা... এসব বড় নয়? সত্যিই এগুলোকে ফাঁপা বুলি ভাবেন আপনি? এই দেশ নিয়ো-নাৎসিদের আখড়া, কিংবা বিদেশি কোনও শক্তির পায়ের তলায় পিষ্ট হলে কি ওসব ভেবে মনকে প্রবোধ দিতে পারবেন?’

‘না, পারব না,’ মাথা নাড়ল রডরিগো। এই আশ্চর্য ছেলেটা তার দিব্যদৃষ্টি খুলে দিয়েছে, বহুদিন পর জাগিয়ে তুলেছে মনের গভীরে হারিয়ে যাওয়া আদর্শবান যুবকটিকে। উঠে দাঁড়াল সে, চেহারায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। ‘আপনার কথাই ঠিক, সেনিয়র। কে কী ভাবল, কে আমার জন্য কী করল না, তারচেয়ে বড় হচ্ছে নিজের বিবেক কী ভাবে, কী করতে বলে। বেশ, আমি আছি আপনার সঙ্গে। বিদেশি হয়ে আপনি যদি এই দেশের মঙ্গল চিন্তা করেন, আমিও করব।’

একজন সত্যিকার নেতার যে কী ক্ষমতা, তার প্রমাণ পরের আধঘণ্টায় হাতে-কলমে দেখতে পেল অভিযাত্রীরা। নিজের দলের সবাইকে ডেকে এনে উঠানে জড়ো করল পিরানহা ওরফে রডরিগো, সংক্ষেপে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল। সেটা এতই জোরালো ও হৃদয়গ্রাহী হলো যে, জলদস্যুদের মত নীতিহীন, বুনো মানুষগুলোও দেশকে বাঁচানোর দৃঢ় প্রত্যয়ে গর্জে উঠল। রডরিগোর নেতৃত্বে নিয়ো-নাৎসিদের ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার শপথ নিল ওরা।

যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজ শুরু হলো এরপর। গতকালকেই শত্রু ছিল ওরা পরস্পরের, কিন্তু এখন বাংলাদেশ থেকে আসা দুঃসাহসী ক’জন আর জলদস্যুদের মধ্যে সে-বৈরিতার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে এবার সবাই।

মারিয়ার বার্জটা আকারে বড়, ছোটে খুব আস্তে; হোয়াইটের লঞ্চটা দ্রুতগতির হলেও আকারে ছোট। ভেবে-চিন্তে বার্জটাকেই ট্রান্সপোর্ট শিপ

হিসেবে বেছে নিল রানা। রানাদের নিজস্ব অস্ত্র-শস্ত্রের পাশাপাশি জলদস্যুদের অস্ত্রও লোড করা হলো ওতে। ফরোয়ার্ড ডেকে একটা মাউন্টিং তৈরি করে তাতে এলএমজি বসানো হলো।

তৌহিদ পুরো সময়টা ব্যস্ত রইল বার্জের ইঞ্জিন নিয়ে। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটল ও, পরদিন দুপুর নাগাদ প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলল বার্জের গতিবেগ। রানা এসে ওটার পারফর্মেন্স পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো।

'চমৎকার' ওর কণ্ঠে প্রশংসা। 'দারুণ! ভাল জাদু দেখিয়েছে, তৌহিদ।'

'থ্যাঙ্কস, মাসুদ ভাই।' বিনয় করল তৌহিদ। 'একা করিনি, সবার সাহায্য পেয়েছি। সবাইকেই ধন্যবাদ দিতে হয়।'

'সেটা নাহয় একটু পরে দাও,' বলল রানা। 'কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

'কী বলছেন! ইঞ্জিন পুরোপুরি রেডি।'

'ইঞ্জিন নয়, কাজটা করতে হবে বোটের হাল নিয়ে। আমি চাই না কাজ সেরে মারিয়ার জন্যে ভাঙাচোরা একটা বার্জ রেখে যাই। আমরা চারজনেই ডুবিয়ে দিয়েছিলাম পিরানহার বোট, ভুলে গেছ? নাৎসিরা আমাদের চেয়ে কয়েক গুণ শক্তিশালী, ওদের জন্য তো এটাকে শতচ্ছিদ্র করে ডুবিয়ে দেয়া আরও সহজ হবে।'

'সেটা আগেই ভাবা উচিত ছিল না?' বলে উঠল রডরিগো, ইঞ্জিন রুমে এসে ঢুকেছে সে।

'ভেবেছি তো!' হেঁয়ালি করল রানা। 'ভেবে-চিন্তেই তো এটাকে অ্যাসল্ট শিপ হিসেবে নির্বাচন করেছি।'

বিভ্রান্ত দেখাল রডরিগোকে। 'এর গতি...'

'এখন দ্বিগুণ।'

'কিন্তু এটা ছাড়া মারিয়ার আর কিছুই নেই। এটাকে যদি ওরা ডুবিয়ে দেয়...'

‘পারবে না। সামান্য একটু কাজ করে এটাকে একটা আর্মার বার্জে রূপান্তরিত করব আমরা।’

‘আর্মারড্ বার্জ!’ রডরিগোর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো। ‘কীভাবে?’

‘সিভিল ওঅরের সময় আমেরিকানরা কী-ধরনের জাহাজ ব্যবহার করত, ছবি দেখেননি? অনেকটা সেরকম।’

মাথা নাড়ল রডরিগো।

‘আমি দেখেছি, মাসুদ ভাই,’ বলল তৌহিদ। ওগুলো ভারি লোহার পাতে ঢাকা থাকত, দেখাত অনেকটা ভাসমান ট্যাঙ্কের মত। এই বোটটাকেও ওরকম করে ফেলতে চান?’

‘ঠিক ধরেছ।’ রানা হাসল। ‘কিন্তু এই জঙ্গলের ভিতরে আমরা আমার প্লেট পাব কোথায়?’

‘একেবারে লোহার পাতই হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই,’ রানা, বলল। ‘একটু কাত করে বসালে টিন দিয়েও সাধারণ বুলেট চমৎকার ঠেকানো যায়।’

‘কিন্তু টিনই বা পাচ্ছেন কোথায়?’

হাসল রানা। ‘দেখছ না, পিরানহার গ্রামের সমস্ত কুঁড়ে টিন দিয়েই তো তৈরি।

‘হায় খোদা।’ আঁতকে উঠল রডরিগো।

হোক ভাঙাচোরা... নিম্নমানের... তা-ও নিজের ঘর তো। কুঁড়েগুলোকে ধ্বংস করে টিন খুলে আনার নির্দেশে খুশি হলো না জলদস্যুদের কেউই। তবে একটু ধমক, আর কিছুটা উৎসাহ দিয়ে সবাইকে রাজি করিয়ে ফেলল দস্যুসর্দার; দ্রুত শুরু করে দিল মারিয়ারা বার্জটাকে আর্মারড্ বার্জে রূপান্তরের কাজ।

কয়েকটা ব্লো-টর্চ ব্যবহার করা হলো এ-কাজের জন্য। ওগুলোর সাহায্যে ঘরগুলোর ছাতি আর দেয়াল কেটে একটার পর একটা টিনের পাত আলাদা করা হতে থাকল, আর দ্রুত সেগুলো নিয়ে যাওয়া হতে থাকল মারিয়ার বার্জে। বোটে বিসিআই টিম রয়েছে, তৌহিদের নির্দেশে আরও দুটো ব্লো-টর্চের মাধ্যমে পাতগুলো জুড়ে দেয়া হতে থাকল প্রাচীন বার্জটার গায়ে।

ক্লান্তিকর, একঘেয়ে কাজ... তার উপর প্রচণ্ড গরম। নদীর ধারে বাতাস বইলেও তাতে শরীর জুড়োচ্ছে না। ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে সবাই, তারপরেও ছাড় দিল না রানা। ছোট ছোট বিরতিতে বিশ্রাম নিয়ে সবাইকে একটানা কাজ করতে বাধ্য করল ও; নিজে খাটল সবচেয়ে বেশি, যাতে কেউ অভিযোগ করতে না পারে। অবশ্য এই নির্দয়তার ফলও মিলল -রাত নামার আগেই পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল ওদের যুদ্ধজাহাজ। ইতিমধ্যে আর্মস্-অ্যামিউনিশন এবং সব ধরনের সাপ্লাইও. তুলে ফেলা হয়েছে বোটটাতে।

নাদিয়াকে নিয়ে রাজিবও বোটে উঠতে যাচ্ছে দেখে থামাল ওদেরকে রানা। 'তোমরা এখানেই পিরানহার প্রাসাদে বিশ্রাম নাও, রাজিব। আমরা ফেরার পথে তুলে নেব তোমাদের।'

'কেন? আমাদের সঙ্গে নিতে চাইছেন না কেন?'

'আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি,' বলল রানা সংক্ষেপে।

'আমরাও' জবাব দিল নাদিয়া আরও সংক্ষেপে।

'কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে...'

'প্লিজ, মাসুদ ভাই,' এবার অনুনয়ের সুরে বলল রাজিব। 'আমরা দুজনেই রাইফেল চালাতে জানি। দেখবেন, আমরা থাকলে সুবিধেই হবে। অন্তত লোকবল তো বাড়বে। আপনি আমাদের যে-কাজ দেবেন, যা করতে বলবেন...'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। উঠে পড়ো। 'নাদিয়া, সোজা গিয়ে ঢোকো রান্নাঘরে। তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর রাজিব । কাল সকালে অস্ত্র পাবে, আজ সবাইকে পেট ভরে খাওয়াও দেখি দুটো ডাল-ভাত আর আলুভর্তা।'

হাসিমুখে চলে গেল ওরা বার্জের কিচেনের উদ্দেশে।

রওনা হবার আগে শেষবারের মত গ্রামটার দিকে তাকাল রডরিগো -ঘর বলতে একটাই আস্ত আছে, ওরটা। এ ছাড়া আর দু'একটার কাঠামো যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে, তা দেখে মনে হতে পারে -প্রলয়ঙ্করী কোনও টর্নেডো বয়ে গেছে ওখান দিয়ে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল দস্যুসর্দারের -অনেক বছর থেকে এটাই তার একমাত্র ঠিকানা ছিল।

'চিন্তা করবেন না,' পাশে এসে বলল রানা। 'যদি ফিরে আসতে পারি, তা হলে এরচেয়ে কয়েক গুণ সুন্দর আরেকটা বসতি তৈরি করে দেব আপনাকে। জলদস্যুদের উপযোগী করে নয়, সত্যিকার একজন বীরের যে-ধরনের পরিবেশে থাকা উচিত -সে-ধরনের।'

কথাটা শুনে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রডরিগো। কেন যেন মনে হচ্ছে -আর কখনও ফেরা হবে না তার।

একটু পরেই চালু করা হলো বার্জের ইঞ্জিন, হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন মারিয়া। বিকট শব্দে হর্ন বাজিয়ে রওনা হলো বোটটা উজানের উদ্দেশে।

বাইশ

'এখনও কোনও খবর নেই ক্রুগারের?' হোয়াইটের আসল নাম ক্রুগার... অস্থির ভঙ্গিতে তার ব্যাপারেই জানতে চাইল আলবার্তো পেরেইরা। মেজাজ খিঁচড়ে রয়েছে নাৎসি-নেতার, গলার স্বরে রাগটা চাপা থাকছে না।

'জী না, সার,' ভয়ে ভয়ে জবাব দিল ফোরম্যান। 'আমরা বার বার রেডিওতে ডাকাডাকি করেছি, কিন্তু ও বা ওর কোনও লোক সাড়া দিচ্ছে না।'

'হারামজাদা গেল কোথায়?' খেপাটে ভঙ্গিতে বলল পেরেইরা। হাতের কাছে পেয়ে নিই খালি, চাবকে পাছার চামড়া তুলে ফেলব শয়তানটার।'

সাইট ঘুরে ঘুরে দেখছে নব্য নাৎসি নেতা। অর্ধেক-ঢালাই হওয়া নিউক্লিয়ার-প্লান্টের টাওয়ারটার সামনে এসে দাঁড়াল। ওটার সাদা সিমেন্টে প্রতিফলিত হচ্ছে আমাজনের তীব্র রোদ, চোখ ধাঁধিয়ে যেতে চায়। বিরক্ত ভঙ্গিতে লাথি কষে মাটি থেকে ধুলো ওড়াল পেরেইরা, হতাশা চাপা দিতে পারছে।

'মালামাল যা আছে, তা দিয়ে আরও দুদিন কাজ চালানো যাবে,' বসকে শান্ত করার চেষ্টা করল ফোরম্যান, যদিও তাতে আদৌ লাভ হবে কি না, সে-ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ রয়েছে তার মনে। আলবার্তো পেরেইরা কাজ দেখতে চায়, অজুহাত শুনতে নয়। 'আশা করি, এর মধ্যে বাকি সাপ্লাই নিয়ে আসবে গোমেজ মেয়েটা।'

'বার বার ওকে দিয়েই বা সমস্ত মালামাল আনানো হচ্ছে কেন?' রাগী গলায় জানতে চাইল পেরেইরা। 'একবারে কয়েকটা বার্জ ভাড়া করে সব নিয়ে আসা যেত না? ওই মেয়ে যতবার মন্টে অ্যালেগ্রায় আসা-যাওয়া করছে, আমাদের অপারেশনের খবর ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কা ততই বাড়ছে।'

'আইডিয়াটা ক্রুগারের,' জানাল ফোরম্যান। ও-ই বলতে পারবে, কেন আরও দু-চারটে বার্জ ভাড়া করেনি।'

'আসুক ও,' সিদ্ধান্ত নেয়ার সুরে বলল পেরেইরা। 'সমস্ত কিছুর ব্যাপারেই জবাবদিহি করতে হবে ওকে...'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল নাৎসি-লিডার, কিন্তু থেমে গেল একটা শব্দ শুনে। কনস্ট্রাকশন সাইটের নানা রকম হই-হল্লা আর কংক্রিট-মিক্সারের

আওয়াজ ছাপিয়ে ভেসে আসছে পুরনো আমলের একটা ইঞ্জিনের ভটভটি - খালের দুরপ্রান্ত থেকে বাতাসে ভেসে আসছে শব্দটা। শরীরটা শক্ত হয়ে গেল পেরেইরার, কাজে ব্যস্ত গার্ড আর শ্রমিকদের পিছনে ফেলে পানির দিকে এগোতে শুরু করল সে।' চারপাশ থেকে গার্ড আর ওভারশিয়াররা স্যালুট দিচ্ছে, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নেই তার। তাল মেলানোর জন্য ফোরম্যানও পিছু পিছু ছুটে এল। পেরেইরার আচরণটা প্রভাব ফেলল সবার মধ্যে, কাজ থামিয়ে সবাই তাকিয়ে রইল কী ঘটে দেখার জন্য।

থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে এখন পুরো সাইটে, সবার দৃষ্টি নাৎসি-নেতার উপর সেঁটে রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিনের শব্দটা আরও প্রকট হয়ে উঠল। খালের পানি থেকে প্রতিফলিত রোদের ঝলসানি থেকে বাঁচতে একটা হাত চোখের সামনে তুলে রেখেছে পেরেইরা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছে -অপরিচিত শব্দটা কোন বোট থেকে আসছে। একটু পরেই মনের আশা পূর্ণ হলো তার, খালের বাঁকে গজিয়ে ওঠা গাছপালার প্রাচীরের আড়াল থেকে উদয় হলো অদ্ভুতদর্শন বার্জটা।

চমকে উঠল আলবার্তো পেরেইরা, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। চকিতের জন্য ফোরম্যানের দিকে তাকাল সে, একই অবস্থা তারও। দৃশ্যটা বিচিত্র... অদ্ভুত... জীবনে কখনও এমন আজব চেহারার জলযান দেখেনি ওরা। নিজের অজান্তেই কয়েকজন গার্ড এগিয়ে এসেছে ব্যাপারটা ভাল করে দেখবার জন্য ...একজনের গলায় ঝুলছে একটা বিনকিউলার -সেটা নিয়ে নিল নাৎসি-লিডার। চোখে ঠেকিয়ে তাকাল বোটটার দিকে।

অবয়বটা পরিচিত -ভাড়া করার পর ওটার কয়েকটা ছবি তুলে এনে দেখিয়েছিল হোয়াইট ওরফে ক্রুগার... তাই চিনতে পারল পেরেইরা -ওটা মারিয়া গোমেজের সেই মালটানা বার্জ। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে ওটার! প্রাগৈতিহাসিক একটা ডায়নোসরের মত লাগছে দেখতে; মনে হচ্ছে, মিউজিয়াম

থেকে বেরিয়ে এসেছে। পানির উপরে যতখানি অংশ ভেসে আছে, তার পুরোটাই এক ধরনের আর্মারে ঢাকা। পুরো সারফেসটাই কালচে, ঢেউ খেলানো -যেন আগুনে পুড়ে গেছে, চেহারাটা করে তুলেছে ভীতিকর।

ভয়ঙ্করদর্শন বার্জটার ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন মানুষ, সশস্ত্র অবস্থায়। মনে হচ্ছে পিরানহার লোকজন ওরা। বো'র কাছে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সুদর্শন এক যুবক এসএমজি হাতে আদেশ-নির্দেশের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিচ্ছে ওদের, বাকিরা সুশৃঙ্খলভাবে পজিশন নিয়েছে কিনারের আর্মারের পিছে... সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষিত প্লাটুনের মত। ব্যাপার কী বোঝা যাচ্ছে না একটুও।

বার্জটার পাইলটের দিকে বিনকিউলার ঘোরাল পেরেইরা। চেহারা দেখা যাচ্ছে না, চওড়া কার্নিশের একটা ক্যাপের কারণে মুখটা ঢাকা পড়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে শুধু লম্বা কালো চুল -ক্যাপের তলা থেকে ঘাড়ের উপর নেমে এসেছে। মারিয়া গোমেজ নাকি? নাহ্, তা কী করে হয়? তার বার্জে, পিরানহার জলদস্যুররা থাকবে কেন?

বোটের সামনে দাঁড়ানো যুবককে পাইলটের দিকে ফিরে কিছু বলতে দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরে গেল বাজটার, কনস্ট্রাকশন সাইটের তীরের দিকে ছুটে আসছে। আঁতকে উঠল পেরেইরা, এরা ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে নাকি। ভাবভঙ্গিতে হামলা চালানোর পরিষ্কার ইঙ্গিত।

প্যারালাইসিসে আক্রান্ত রোগীর মত স্থবির হয়ে গেছে পেরেইরা আর তার নাৎসি দোসরেরা, বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে খালের অভূতপূর্ব দৃশ্যটার দিকে। দু'একজন নার্ভাস ভঙ্গিতে হাতের অস্ত্র চেপে ধরল, দলনেতার কাছ থেকে আদেশ আশা করছে, কিন্তু কিছুই বলল না নাৎসি-লিডার; নির্নিমেষ চোখে সে তাকিয়ে রয়েছে বার্জের দিকে, যেন এভাবে তাকালেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে ওটা।

খালের পারে এসে নাৎসিদের এভাবে থমকে যাওয়াটা বিরাট একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে মাসুদ রানা ও তার সঙ্গীদের জন্য -ব্যাটারা এখন ওদের জন্য শুটিং রেঞ্জের স্থির নিশানা। মুচকি হাসল রানা, এলিমেন্ট অভ সারপ্রাইযের ষোলো আনা সুবিধে পেতে চলেছে ওরা। মুখের কাছে হাত এনে চেঁচিয়ে উঠল ও, ইঞ্জিনের ভটভটানি ছাপিয়ে পানির উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওর ভরাট কণ্ঠ।

'*হের পেরেইরা!* ইউ, বাস্টার্ড! এখানে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বসানোর জন্য অনুমতি নিতে ভুলে গেছ তুমি। তাই প্রজেক্টটা সিল করে দিতে এসেছি আমরা।'

এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আজ পর্যন্ত কেউ কথা বলার সাহস পায়নি পেরেইরার সঙ্গে। তাই চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠল তার, রাগী গলায় জানতে চাইল, 'কে তুমি?'

বুকের কাছে সাবমেশিনগানটা তুলে আনল রানা। 'আমি মাসুদ রানা - নাৎসিদের যম!' পরমুহূর্তে গুলি করল ও।

সঙ্কেতটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল পুরো দলটা, একসঙ্গে গর্জে উঠল বার্জের ডেকের বাকি সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র। গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল আকাশবাতাস। আক্রমণটা অপ্রত্যাশিত, পেরেইরা ভেবেছিল অন্তত কিছুক্ষণ বাতচিত চালাবে প্রতিপক্ষ... সেটাই হয়ে থাকে সাধারণত। কিন্তু এই দুঃসাহসী লোকেরা যে ওর মত মানুষের সঙ্গে শুধু অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে, সেটা জানা ছিল না। চোখের পলকে পাঁচ-ছ'জন নাৎসি ঘায়েল হলো, গুলি লেগেছে পেরেইরার হাতেও। ডাইভ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল নাৎসি লিডার, ক্রল করে সরে যেতে শুরু করল।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে এবার নাৎসি গার্ডরা পাল্টা ফায়ার করতে শুরু করল, তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল শ্রমিকদের পাহারায় রত অন্যান্য গার্ড আর ওভারশিয়াররা। কিন্তু বেচারাদের জন্য আরও চমক অপেক্ষা করছিল

-বোটের দিকে এগোতেই পারল না ওরা, সাইটের তিনদিকের জঙ্গল থেকে নতুন করে গুলির ধারা ছুটে এল তাদের দিকে। খালে ঢোকার আগেই অপূর্ব আর জুলফিকারের নেতৃত্বে একটা গ্রুপকে জঙ্গলে নামিয়ে দিয়েছে রানা, সাইটের তিনদিকে পজিশন নিয়েছে ওরা, গুলি করছে নাৎসিদের পিছনের দলটার দিকে।

অটোমেটিক ওয়েপনের মুহুর্মূহু গর্জনে থরথর করে কাঁপছে আমাজনের জঙ্গল। বাতাস কেটে বৃষ্টির মত ছুটে যাচ্ছে বুলেট কনস্ট্রাকশন সাইটের দিকে –মহা প্রতাপশালী নিয়ো-নাৎসিদের খতম করছে, আহত করছে, ধুলো ওড়াচ্ছে মাটি থেকে। ক্রল করতে থাকা পেরেইরার মুখ থেকে রক্ত সরে গেল, তার সাধের প্রোজেক্ট চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শত্রুপক্ষের ভয়াবহ ফায়ারপাওয়ারের সামনে অসহায় হয়ে পড়েছে তার গোটা বাহিনী -না পারছে নিজেদের বাঁচাতে, না পারছে মহামূলবান ইকুইপমেন্টগুলোকে রক্ষা করতে। কেউ কেউ অবশ্য কাভার খুঁজে নিয়ে পাল্টা গুলি করছে, কিন্তু তাদের বুলেট নিষ্ফলভাবে মাথা কুটে মরছে বার্জের আর্মারে। একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না পেরেইরার -অশিক্ষিত জলদস্যুরা এতসব অস্ত্র আর গোলাবারুদ পেল কোত্থেকে! বিস্ময়টা স্বাভাবিক; তার জানা নেই, দুটো ক্রেটে ভরে এসব আর্মস্ আর অ্যামিউনিশন বিসিআই টিম নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে।

নাৎসিদের ঠুনকো প্রতিরোধ থেকে গা বাঁচিয়ে ফরোয়ার্ড ডেকের এলএমজি-টা অপারেট করছে তৌহিদ। রিঅ্যাক্টর টাওয়ারটা ওর মূল টার্গেট, ঝাঁকে ঝাঁকে ভারি শেল ছুটে যাচ্ছে ওদিকে। চারপাশের ক্যাটওয়াকগুলো দেখতে দেখতে খসে পড়ল, কাঠের তক্তাগুলো এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যেন অতিকায় একটা করাত চালানো হচ্ছে ওগুলোর উপর দিয়ে। একটা গার্ড-টাওয়ার আছে সাইটে, ওটার দিকেও শেল-বৃষ্টি ঝরাল ও। উপরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন নাৎসি প্রহরী উড়ে গেল গুলির আঘাতে, কিনার টপকে নীচে পড়ে

গেল দ্বিতীয়জন, পুরো কাঠামোটাই একটু পরে ধসে পড়ে গেল। এরপর উইঞ্চ-লাইনের দিকে মনোযোগ দিল তৌহিদ । কেইবল্ ছিঁড়ে বিশাল বিশাল ক্রেনগুলো থেকে ঝোলানো রড আর অন্যান্য নির্মাণসামগ্রীর বোঝা নীচে আছড়ে পড়তে শুরু করল। বিশাল একটা স্তূপ পড়ল সিমেন্টের বস্তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা দুজন ওভারশিয়ারের ঘাড়ে... মুহূর্তেই চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেল তারা, ফেটে যাওয়া বস্তার ছড়ানো সিমেন্টে ঢাকা পড়ে গেল অনেকখানি জায়গা।

বুঝে-শুনে গুলি করছে রানার দল, খেয়াল রাখছে যাতে বন্দি শ্রমিকরা আহত না হয়। সতর্কতাটা বেশিক্ষণ পালন করতে হলো না, গোলাগুলি শুরু হতে দেখেই হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে পালাতে শুরু করেছে ওরা, কিছুক্ষণের মধ্যেই খালি হয়ে গেল পুরো সাইট, নিয়ো-নাৎসিদের জনাকয়েক অস্ত্রধারী ছাড়া আর কেউ রইল না ময়দানে। শান্ত চোখে জায়গাটা দেখল রানা, যখন সন্তুষ্ট হলো, মারিয়ার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ছোট্ট করে ইশারা করল ও। মাথা ঝাঁকিয়ে ভেঁপু বাজাল ক্যাপ্টেন, বিশেষ একটা ছন্দে... সাইটের তিনদিকের কর্ডন টিমকে সঙ্কেত দিচ্ছে আসলে।

কয়েক সেকেণ্ড পরই শুরু হয়ে গেল নতুন তাণ্ডব -এবার গ্রেনেড চার্জ শুরু করেছে জুলফিকার-অপূর্বর গ্রুপ। এতক্ষণ গুমগুম করে চলছিল সাইটের ইলেকট্রিক জেনারেটরটা, জুলফিকারের নিখুঁত থ্রো-তে বদলে গেল পরিস্থিতি -বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো ওটা, মাটি এমনভাবে কেঁপে উঠল যেন ছোটখাট একটা ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। আগুনের গোলাটার পিছু পিছু ছিটকে উঠল বালি, লোহা, সিমেন্ট আর পাথরের টুকরো... ভারি বর্ষণের মত নেমে এল গোটা সাইটের উপর। জুলফিকারের দেখাদেখি অপূর্ব আর দলের জলদস্যুরাও গ্রেনেড ছুঁড়ছে, নাৎসিদের তাঁবু, ইকুইপমেন্ট আর সাপ্লাই শেড... সব উড়ে যেতে শুরু করল একের পর এক বিস্ফোরণে, একই সঙ্গে অক্কা পেতে শুরু করেছে আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে থাকা নাৎসি-বদমাশরাও। এখানে-সেখানে

জ্বলতে থাকা আগুন থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল... পেরেইরা আর তার লোকজনকে এমনভাবে ঢেকে ফেলছে যে, দৃষ্টিসীমা শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে আনছে। টার্গেট দেখাই এবার মুশকিল হয়ে পড়েছে তাদের জন্যে, গুলি করবে কী।

তারপরেও অস্ত্রবিরতির কথা ভাবছে না ফ্যানাটিক নাৎসিরা, নিশানা-টিশানা ঠিক করার ঝামেলায় যাচ্ছে না... অনবরত গুলি করছে খালের দিকে। বার্জের ইমপ্রোভাইজড় আর্মারে ঠ্যাক্ ঠ্যাক্ করে বিঁধছে সেগুলো, কিছু ছিটকে যাচ্ছে ঘষা খেয়ে। পেরেইরার হাঁকডাক শোনা গেল ধোঁয়ার ভিতর থেকে, ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া দলকে একত্র করে নিয়ন্ত্রিত আঘাত হানতে চাইছে। কিন্তু নাৎসি নেতার এই রণকৌশল ড্রয়িংবোর্ডেই রয়ে গেল, চারপাশ থেকে বিরতিহীন বুলেট আর গ্রেনেড বর্ষণের শিকার হওয়ায় তার সৈন্যেরা এখন দিশেহারা... ঠাণ্ডা মাথায় অর্ডার ফলো করবার অবস্থায় নেই কেউই।

আলবার্তো পেরেইরা দাম্ভিক মানুষ, এতকিছুর পরেও সারেণ্ডার করল না। কয়েকটা জিপ রয়েছে তার সঙ্গে, সেগুলো ব্যবহার করে পিছু হটবে বলে ঠিক করল, পরে সুযোগ বুঝে পাল্টা-হামলা চালানো যাবে। হট্টগোলের মাঝে চেঁচিয়ে নিজের অবশিষ্ট সৈন্যদের জিপগুলোয় উঠে পড়তে আদেশ দিল সে। সবাই ঠিকমত শুনতে পায়নি অর্ডারটা, তবে যারা শুনেছে, তাদের দেখাদেখি নাৎসিদের পুরো গ্রুপটাই ছুটতে শুরু করল পার্ক করে রাখা বাহনগুলোর উদ্দেশে।

স্টিমারের ডেক থেকে শত্রুপক্ষের নতুন স্ট্র্যাটেজিটা টের পেল রানা, তবে এত সহজে ব্যাটাদের পার পেতে দিতে রাজি নয় ও। ব্যাপারটার দিকে রডরিগোর দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা, তারপর পাইলট-হাউসের দিকে ফিরে চেঁচাল, 'বোটটা পারে ঠেকাও, মারিয়া!'

জলদস্যুরা মাথা ঝাঁকাল রডরিগোর আদেশ পেয়ে, সবক'টা অস্ত্রের মুখ ঘুরে গেল এবার জিপগুলোর দিকে। রানাও তৌহিদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল মেশিনগানটা ওদিকে ঘোরাতে। এবার সম্মিলিত আঘাত হানা হলো পলায়নরত নাৎসিদের উপর। জিপগুলো ঠিকমত স্টার্টই দিতে পারেনি তারা, কয়েকজন বুলেটের আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়ল... টায়ার ফুটো হয়ে গেল দুটো জিপের। তারপরেও হাল ছাড়ল না লোকগুলো, গুলিবৃষ্টি ভেদ করে এগোনোর চেষ্টা করল সামনে। প্রচেষ্টাটাকে নস্যাৎ করে দিল এলএমজি-র ভারী শেল। চোখের পলকে বিরাট বিরাট গর্ত সৃষ্টি হতে শুরু করল জিপগুলোর গায়ে, ওগুলোর ভিতরে অনায়াসে হাতের মুঠি ঢুকে যাবে। জুলফিকার-অপূর্বর গ্রুপও গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করেছে ওদিকে, ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একের পর এক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যেতে থাকল বাহনগুলো, নাৎসিদের শেষ গ্রুপটাও জীবন দিতে শুরু করেছে। অকাতরে।

হঠাৎ ধোঁয়া আর ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা অক্ষত জিপ -তরুণ এক নাৎসি চালাচ্ছে সেটা, চেঁচাতে চেঁচাতে সুইসাইড বম্বারের মত ওটা ছুটিয়ে আনছে বিচ করে থাকা বার্জের দিকে। রানা ধারণা করল, বোমা আছে সম্ভবত জিপটাতে, বোটের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে সেটাকে ফাটাতে চাইছে উন্মাদ নাৎসি। গুলি করতে শুরু করল ক্রু-রা, জিপটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলছে... কিন্তু থামাতে পারল না। ফরোয়ার্ড মোমেন্টামের কারণে ওটা ছুটছেই। আতঙ্কিত ভঙ্গিতে চেঁচামেচি শুরু করল বোটের আরোহীরা, কয়েকজন লাফিয়ে পড়ল নীচে।

অমোঘ নিয়তি যেন ওই জিপটা, ছুটে আসছে অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের মত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেবে গোটা বার্জ। হুইলহাউসের ভিতরে, লড়াইয়ের নীরব দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে রাজিব

আর নাদিয়া। দৃশ্যটা বুকে আতঙ্ক জাগাল ওদের, ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল দুজনেই।

তেইশ

মাথা ঠাণ্ডা রাখল রানা, অবচেতনভাবেই ওর মগজ বলে দিয়েছে কী করতে হবে। একটুও উত্তেজিত হলো না ও, হাতে একটা গ্রেনেড ধরে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকল সঠিক মুহূর্তের জন্য। জিপটা রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছুতেই পিন খুলে গ্রেনেডটা ছুঁড়ল রানা নিখুঁত দক্ষতায়। ছুটন্ত বাহনটার সামনে পড়ল গ্রেনেড, ফাটল জিপটা ঠিক মাথার উপর পৌঁছে যাবার পর -শকওয়েভের ধাক্কাটা ডেক থেকেও অনুভব করল সবাই। বাতাসে পাক খেয়ে কয়েক গজ দূরে উল্টে পড়ল হামলাকারী বাহনটা, আগুন ধরে গেছে, ফ্যানাটিক নাৎসি-অনুসারী পটল তুলেছে মুহূর্তেই।

ইশারায় এবার সবাইকে গুলি থামাতে বলল রানা। সেটা বুঝতে পেরে রডরিগো চেঁচিয়ে উঠল, 'সিজ ফায়ার! সিজ ফায়ার!!'

থেমে গেল সব গোলাগুলি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে দেখে কর্ডন টিমও গ্রেনেড বর্ষণ বন্ধ করে দিয়েছে। তীক্ষ্ণ চোখে পুরো সাইট দেখল রানা- শত্রুদের কেউ এখনও টিকে রয়েছে কি না বোঝার জন্য। তবে সেরকম কোনও আলামত লক্ষ করা গেল না। পুরো ময়দান জুড়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে নিয়ো-নাৎসিদের লাশ... দু'একজন বেঁচেও আছে অবশ্য, তাদের গোঙানিতে ভারি হয়ে আছে বাতাস। জায়গায় জায়গায় উদ্বাহু নৃত্য জুড়েছে আগুনের শিখা, কালো ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। রিঅ্যাক্টরের টাওয়ারটা ক্ষত-বিক্ষত, অন্যান্য স্ট্রাকচারও ধসে পড়ার উপক্রম করছে। পুরো

জায়গাটায় অক্ষত রয়েছে শুধু নিয়ো-নাৎসিদের হেলিকপ্টারটা, কীভাবে যেন বেঁচে গেছে ওটা -হেলিপ্যাডটা সাইটের একপ্রান্তে... আর কেউ ওটায় চড়ে পালাবার চেষ্টা করেনি বলেই হয়তো।

'চলুন, নামা যাক,' রডরিগোর দিকে তাকিয়ে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল দস্যুসর্দার, পাশ ফিরে ইশারা করল দলের লোকজনকে। বার্জ থেকে মাটিতে নেমে এল ক্রু-রা। গলায় ঝোলানো একটা বাঁশি মুখে তুলে বাজাল তৌহিদ, সঙ্কেতটা শুনে কর্ডন টিমও বেরিয়ে এল গাছপালার আড়াল থেকে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দ্রুত একটা তল্লাশি চালানো হলো সাইটে, আহত নাৎসি লোকগুলোকে সরিয়ে নেয়া হলো একপাশে... পরে চিকিৎসা দেয়া হবে। ওদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করল রানা, সে জানাল -শ্রমিক বাদে ফোরম্যান, গার্ড এবং ওভারশিয়ার মিলে মোট আটাশজন নিয়ো-নাৎসি ছিল এখানে।

'চেক করো, হিসেবটা মিলছে কি না,' জুলফিকারকে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে। বলল, 'সাতাশ জনের হিসেব পেয়েছি আমি, মাসুদ ভাই। উনিশটা লাশ... অর আহত আটজন।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'একজন কম?'

মাথা ঝাঁকাল জুলফিকার। 'নাটের গুরুটাকেই তো দেখছি না কোথাও।'

'কী বলছ! পেরেইরা পালিয়েছে?'

'অসম্ভব, মাসুদ ভাই!' প্রতিবাদ করল অপূর্ব। 'আমাদের কর্ডন ভেদ করে একটা মাছিও যেতে পারেনি। শুধু শ্রমিকদের যেতে দিয়েছি আমরা... তাও চেক করে।'

'তা হলে এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে,' বলল রানা। সব জায়গা সার্চ করেছ তোমরা?'

‘তাঁবুগুলো বাদে,’ বলল জুলফিকার। ‘ওগুলোর ভিতরে ঢোকার সময় পাইনি আমরা, মিস্টার রডরিগো গেছেন ওদিকে।’

হাতের সাবমেশিনগানটা তুলল রানা। ‘চলো, আমরাও যাই। ইঁদুরটাকে গর্ত থেকে বের করে আনতে হবে...’

কথা শেষ হলো না ওর, লিভিং এরিয়ার দিক থেকে ভেসে এল উত্তেজিত চেঁচামেচি... সেই সঙ্গে একটা গুলির শব্দ!

চমকে উঠল রানা, পড়িমরি করে ছুট লাগাল জায়গাটার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছেই থমকে গেল ও -মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে পিরানহার দলের এক জলদস্যু, বুকে গুলি করা হয়েছে, ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি। লাশ থেকে সামান্য দূরেই দেখা গেল পেরেইরাকে, পিছন থেকে জাপটে ধরে রেখেছে রডরিগোর গলা, কপালের পাশে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে... টেনে নিয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টারের দিকে। নাৎসি নেতার পাশে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তা আর্মান্দো গার্সিয়াও রয়েছে -নাৎসিদের আটাশজনের কেউ নয় সে, নিশ্চয়ই তাঁবুতে বসে ওদের হয়ে অন্য কোনও কাজ করছিল, লড়াই শুরু হওয়ায় ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল ওখানে। সবাই কুপোকাত হওয়ায় এই মুহূর্তে তাকেই নাৎসি-লিডারের দেহরক্ষী হতে হয়েছে, হাতে একটা রাইফেল নিয়ে পায়ে পায়ে পিছাচ্ছে লোকটা পেরেইরার সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

‘থামো!’ গর্জে উঠল রানা।

থামল না পেরেইরা, হিংস্র গলায় বলল, ‘আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না, রানা। পিরানহার খুলি উড়ে যাবে তা হলে।’

‘আমাকে নিয়ে ভাববেন না,’ গলায় চাপ পড়ায় কাশছে রডরিগো। ‘দেখুন, ও যেন পালাতে না পারে। তাঁবুর ভিতর একটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস সেট করতে দেখেছি আমি, হারামজাদার কাছে ওটার রিমোট কন্ট্রোল আছে। টেকঅফ করতে পারলেই দূরে গিয়ে ফাটিয়ে দেবে।’

ভিতর ভিতর চমকে গেল রানা কথাটা শুনে।

ব্যাপারটা লক্ষ করে শয়তানি হাসি ফুটল পেরেইরার ঠোঁটে। 'আমাকে ঠেকাবার চেষ্টা করলেও ফাটাব ওটা, রানা। আমাজনের দশ বর্গমাইল এলাকা নিমেষে ধুলো হয়ে যাবে তাতে।'

'তুমি মরবে না?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'ধরা পড়ার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল... তাও আবার তোমাদের সবক'টাকে সঙ্গে নিয়ে।'

'তা হলে সেভাবেই মরো। নিউক্লিয়ার বোমায় আমরা মরব, আর তুমি পালিয়ে যাবে... সেটা হয় কখনও?'

'আমি তোমাদের একটা সুযোগ দিচ্ছি, রানা,' যুক্তি দেখাল পেরেইরা। 'ব্লাস্ট জোন থেকে নিরাপদ দূরত্বে যেতে কিছুটা সময় লাগবে আমার। ততক্ষণে তোমরা যদি বোমাটা ডিফিউয করে ফেলতে পারো, তা হলে কাউকেই মরতে হয় না।'

শয়তানটার কথা একটুও বিশ্বাস করল না রানা -নিউক্লিয়ার ডিভাইসটা নিশ্চয়ই সহজে ডিফিউয করা যাবে না। ওকে স্রেফ প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক, পেরেইরার কথা না শুনলে এখুনি রিমোটটা টিপে দিতে পারে সে -ওর মত চরমপন্থী নাৎসির পক্ষে কাজটা সম্ভব। বোমা ফাটলে ওরা সবাই মারা যাবে -এটাই একমাত্র সমস্যা নয়; আমাজনের একটা বড় অংশ গায়েব হয়ে যাবে, রেডিয়েশনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে দূর-দূরান্তে... আর সেটার প্রভাবে এই এলাকা ভুগবে বহু বছর।

ওর চিন্তিত চেহারা দেখে হেসে উঠল আর্মান্দো গার্সিয়া। 'আপনার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই, মি. রানা। কথা শুনুন, সেটাই সবার জন্যে মঙ্গল হবে।'

কিছু বলল না রানা, কী করবে বুঝতে পারছে না।

‘ড্রপ আর্মস!’ হুকুম দিল পেরেইরা। ‘তারপর সবাই পিছিয়ে যান। আমাদের। ত্রিসীমানায় কাউকে দেখতে চাই না আমি।’

নীরবে সঙ্গীদের ইশারা করল রানা। মাটিতে ধুপধাপ করে সমস্ত আর্মস-অ্যামিউনিশন ফেলে দিল ওরা। তারপর পিছিয়ে যেতে শুরু করল ধীরে ধীরে। বিজয়ীর হাসি হাসল পেরেইরা, সে-ও পিছাতে শুরু করেছে হেলিকপ্টারের দিকে। দরজা খুলে ককপিটে উঠে পড়ল নাৎসি-লিডার, পিরানহাকে এখন কাভার দিচ্ছে গার্সিয়া।

অস্ত্রের মুখে প্যাসেঞ্জারস্ ডোর খুলল দস্যুসর্দার, ভিতরে ঢুকতে গিয়ে। আচমকা পাঁই করে ঘুরল, তারপর ধপাস করে গার্সিয়ার মুখোমুখি হয়ে বসে পড়ল মাটিতে, নকল পা-টা তুলে এনেছে অস্ত্রধারীর বুকের দিকে। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক যে হকচকিয়ে গেল গার্সিয়া, প্রতিক্রিয়ার সময় পেল না। সুযোগ হাতছাড়া করল না রডরিগো, বিদ্যুৎ বেগে হাত বাড়িয়ে দিল প্যান্টের নীচে লুকানো ট্রিগার বাটনটার দিকে, ফায়ার করল।

বিশাল একটা গর্ত তৈরি হলো গার্সিয়ার বুকে, শটগানোর ভারি বুলেটের আঘাতে পিছনদিকে ছিটকে গেল, মাটিতে আছড়ে পড়ল গার্সিয়ার প্রাণহীন দেহটা। সেদিকে নজর নেই রডরিগোর, গুলিটা ছুঁড়েই আবার ঘুরতে শুরু করেছে ককপিটের দিকে, লুকানো শটগানটা দিয়ে পেরেইরাকেও ঘায়েল করতে চায়। তবে সে-চেষ্ট ওর সফল হলো না।

গুলির শব্দ শুনেই চমকে গিয়েছিল পাইলটের সিটে বসা নাৎসি-লিডার, জানালা দিয়ে তাকাতেই পঙ্গু জলদস্যুকে ঘুরে যেতে দেখল। নিশানা ঠিক করার সময় পেল না রডরিগো, তার আগেই হাতের পিস্তল তাক করে ফেলল সে, টিপে দিল ট্রিগার। ট্রিগার পর্যন্ত পৌছুল না রডরিগোর হাত, দূর থেকে তাকে মাটিতে এলিয়ে পড়তে দেখল রানা ও তার সঙ্গীরা।

‘বাবা-আ-আ!’ চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া।

চিৎকারটার জবাবেই যেন ঘুরে গেল পেরেইরার পিস্তলের নল, অভিযাত্রী আর জলদস্যুদের দলটাকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করল সে। ডাইভ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল সবাই। মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া বুলেটের শব্দ ছাপিয়ে কপ্টারের রোটরকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে শোনা গেল।

প্রমাদ গুনলও রানা -ব্যাটা পালিয়ে গেলে সর্বনাশ! নিরাপদ রেঞ্জে পৌঁছুলেই নির্দ্বিধায় ফাটিয়ে দেবে বোমাটা! টেকঅফ করার জন্য পেরেইরা গুলি থামাতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ছুটতে শুরু করল কপ্টারটার দিকে। পড়ে থাকা গার্সিয়া আর রডরিগোর দেহদুটো টপকে যখন ও হেলিপ্যাডে পৌঁছুল, ততক্ষণে মাটি ছেড়েছে যান্ত্রিক ফড়িং... মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে আরও অন্তত দেড় ফুট।

ছুটন্ত অবস্থাতেই হাই-জাম্পারের ভঙ্গিতে লাফ দিল রানা, দু'হাতে খপ করে আঁকড়ে ধরল কপ্টারের বাঁ-দিকের ল্যাণ্ডিং স্কিড। ভীষণভাবে দুলে উঠল কপ্টারটা, জানালা দিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখতে পেয়ে বিচ্ছিরি ভাষায় গাল দিল পেরেইরা, পিস্তলটা বের করে গুলি করার চেষ্টা করল।

খটাস করে খালি চেম্বারে পড়ল হ্যামার, অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে গেছে। বোধহয় নিজেকেই শাপ-শাপান্ত করল পেরেইরা, তাড়াতাড়ি রিলোড করতে শুরু করল... যদিও কাজটা সহজ হলো না। ডান হাতে সাইক্লিক-পিচ-স্টিক আঁকড়ে ধরে রাখতে হচ্ছে তাকে, অবশিষ্ট একটামাত্র হাতে ম্যাগাজিন ভরা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। রীতিমত কসরত শুরু করে দিল সে। এই সুযোগে জিমন্যাস্টের কৌশলে ল্যান্ডিং স্কিডে উঠে এল রানা, ব্যালান্স সামলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ককপিটের দিকে; হাতলটা নাগালের মধ্যে আসতেই একটানে খুলে ফেলল দরজা।

চমকে উঠে মাথা ঘোরাল পেরেইরা, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল অনাহূত অতিথিকে, কিন্তু পারল না। দুহাতে তাকে জাপটে ধরল রানা, টান

দিয়ে বের করে আনার চেষ্টা করছে। কন্ট্রোল থেকে হাত ছুটে গেল পেরেইরার, খামচি মেরে রানার বজ্রমুষ্টি ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাতালের মত ঘুরতে শুরু করল কপ্টারটা, ল্যাণ্ডিং স্কিড থেকে পা ছুটে গেল রানার, নাৎসি-লিডারকে আঁকড়ে ধরে খোলা দরজা দিয়ে ঝুলছে এখন ও।

সিটবেল্ট বাঁধা থাকায় সুবিধাজনক অবস্থায় আছে পেরেইরা, টান খেয়েও পড়ে যাচ্ছে না। সময় নিয়ে নিজেকে সামলাল সে, তারপর কনুই চালাল রানার মুখ বরাবর। চোখে অন্ধকার দেখল রানা, নাকটা থেঁতলে গেছে... কোনওমতে দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথাটা সহ্য করল ও, হাতের বাঁধন ছাড়ল না।

আবার আঘাত করল পেরেইরা... আবার! মাথার ভিতর দপ করে উঠল কী যেন, চেষ্টা করেও হাতদুটোকে বাধ্য রাখতে পারল না রানা, নিজের অজান্তেই আলগা হয়ে গেল ওগুলো, দরজা থেকে পড়ে গেল ও। নীচের জমিনেই আছড়ে পড়ত, কিন্তু শেষ মুহূর্তে চোখের সামনে দেখতে পেল ল্যাণ্ডিং স্কিডটাকে। হাত ছুঁড়ল রানা, ডানদিকেরটা ছুটে গেল... তবে বাম তালুতে ঠেকল লোহার দণ্ড, খপ করে আঁকড়ে ধরে ফেলল ও। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল কাঁধ, রানার মনে হলো-শোল্ডার জয়েন্ট খুলে পড়ে যাবে ও এখুনি।

উপর থেকে আবার গাল ভেসে এল, শত্রু এখনও টিকে আছে দেখে খিস্তি বেরুচ্ছে পেরেইরার মুখ দিয়ে। তাড়াতাড়ি পিস্তলে ম্যাগাজিন ভরল সে, একহাতে স্টিক ধরে সিধে করল কপ্টারটাকে, তারপর খোলা দরজা দিয়ে বের করে ফেলল অন্যহাতটা -পিস্তলটা তাক করেছে রানার মাথার দিকে।

শয়তানি একটা হাসি ফুটে উঠেছে নাৎসি-লিডারের ঠোঁটে। বলল, 'গো টু হেল, রানা!'

মুক্ত ডানহাত দিয়ে কোমরের বেল্ট থেকে একটা গ্রেনেড নিল রানা, রিঙে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে খুলে ফেলল পিনটা। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি না, তুমিই যাও বরং!'

পরমুহূর্তে সবুজ ডিমটা ছুঁড়ল ও... খোলা দরজা দিয়ে ককপিটের ভিতরে! পেরেইরার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, গুলি করার কথা ভুলে গিয়ে সিটের পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, গ্রেনেডটা কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিতে চায়। দৃষ্টিসীমাতেই রয়েছে বিস্ফোরকটা, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও হাত পৌছুতে পারছে না ওখানে -আতঙ্কে স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়েছে লোকটা, শরীরটা যে সিটবেল্টে আটকানো, সেটাই মনে পড়ছে না।

রানা অবশ্য এতকিছু দেখল না, গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিয়েই ল্যাণ্ডিং স্কিড ছেড়ে দিয়েছে ও, নীচে পড়ছে এখন। খালের উপর এসে পড়েছিল হেলিকপ্টার, দেখেছে আগেই, সোজা পানিতে গিয়ে পড়ল ও, তলিয়ে গেল বেশ কিছুটা। কয়েক সেকেন্ড পর মাথার উপর বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড... একইসঙ্গে কপ্টারটাও। কমলা রঙের একটা আগুনের পিণ্ডে পরিণত হলো যান্ত্রিক ফড়িংটা, ভিতরে বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মহাপ্রতাপশালী আলবার্তো পেরেইরা, সঙ্গে তার রিমোট কন্ট্রোলও। আগুনের গোলা আর পিছনে ফেলে যাওয়া ধোঁয়ার ধারা মিলে ধূমকেতুর মত মনে হলো ধ্বংসাবশেষটাকে, ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল পানিতে।

সাঁতার কেটে রান যখন পারে উঠল, তখন পড়ে থাকা রডরিগো গোমেজ ওরফে পিরানহার চারপাশে ভিড় করেছে দস্যুদল আর রানার সঙ্গীরা সবাই। তৌহিদ আর অপূর্ব এসেছে রানাকে পানি থেকে উঠতে সাহায্য করবার জন্য, ওদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে পঙ্গু সাব-ইন্সপেক্টরের ব্যাপারে জানতে চাইল ও, জবাবে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দুই বিসিআই এজেন্ট।

ভিড় ঠেলে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। পিতার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে মারিয়া, গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে অঝোর ধারায়। চোখ ভেজা দস্যুদলের সবার... এমনকী রাজিব আর নাদিয়ারও।

‘সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা এখুনি তোমার বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব...’ মারিয়াকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল রানা, তবে নিজের কানেই কথাটা অবিশ্বাস্য ঠেকল। বুকে গুলি খেয়েছে রডরিগো, ক্রমাগত রক্ত ঝরছে, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে, জীবনীশক্তি শেষ হয়ে এসেছে তার। এই মুহূর্তে অত্যাধুনিক একটা হাসপাতালে নিতে পারলেও বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ, অথচ তেমন কোথাও নেবার মত যানবাহন বা সময়—কোনোটাই নেই ওদের হাতে।

‘মিথ্যে বলার দরকার নেই, সেনিয়র রানা,’ দুর্বল গলায় বলল রডরিগো। ‘আমি জানি, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। যাবার আগে শুধু এটুকু বলুন, পেরেইরা শয়তানটা পালাতে পারেনি তো?’

‘ও এখন মাছের খাবার।’

‘বোমাটা?’

‘ফাটবে না। আমাজন এখন নিরাপদ।’

স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলল রডরিগো। ‘তা হলে আমি শান্তিতে মরতে পারি।’

‘অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি,’ বলল রানা।

‘জীবনের মায়া পিরানহাকে সাজে, রডরিগোকে নয়। শয়তানদের বিরুদ্ধে রডরিগোর পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব ছিল না... মরণ নিশ্চিত হলেও।’

‘কিন্তু এমন একটা কাজ করার আগে মারিয়ার কথা একটুও ভাবলেন না -একদম একা হয়ে যাবে তো ও...’

‘ওকে নিয়ে ভাববেন না, সেনিয়র। দুনিয়ার এমন কোনও কষ্ট নেই, যা ও সইতে পারে না -ওভাবেই আমি বড় করেছি ওকে। তারপরও যদি কখনও কোনও বিপদ হয়, আপনি ওকে দেখবেন না?’

‘নিশ্চয়ই,’ রডরিগোর হাত ধরে বলল রানা। ‘কথা দিচ্ছি।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ, সেনিয়র,’ শক্ত করে রানার হাতটা চেপে ধরল পঙ্গু সাব-ইন্সপেক্টর। ‘আমার সৌভাগ্য, আপনার মত একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল’।

‘না, মি. গোমেজ,’ মাথা নাড়ল রানা, ‘সৌভাগ্য আসলে আমার... আপনার দেখা পেয়েছি বলে।’

শক্তি ফুরিয়ে গেছে রডরিগোর, কথা বলল না আর, রানার বক্তব্যটা ভাল লেগেছে ওর। মুখে স্মিত হাসি নিয়ে চোখ মুদল দস্যু। ঘুমিয়ে পড়ল... চিরতরে।

হু হু কর কেঁদে উঠল মারিয়া।

হঠাৎ করেই পরিবেশটা বড্ড নিস্তব্ধ মনে হলো রানার কাছে, একটা পাখিও ডাকছে না কোথাও। যেন প্রকৃতিও নীরবতা পালন করছে এক বীর – দেশপ্রেমিকের চিরবিদায়ে।

শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল রানার।

***